কী আছে বেদে



শ্রী সুকেশকুমার চক্রবর্তী

কী আছে বেদে

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

সাগ্নিক
ফ্ল্যাট ৩, ৪৩/৭ মুরারী পুকুর রোড
কলিকাতা-৭০০০৬৭

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ
গ্রন্থিক
১এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক
শ্রীমতী শুভ্রা ভট্টাচার্য
ফ্ল্যাট নং-৩
৪৩/৭ মুরারী পুকুর রোড
কলিকাতা-৭০০০৬৭

প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা, ১৯৮৯

প্রচ্ছদ ঃ
শ্রীমতী মীরা ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর
শ্রীঅবনীমোহন রায়
তারকনাথ প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্স
১২, বিনোদ সাহা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

দাম ঃ ২৫·০০ টাকা

গ্রন্থপঞ্জী

১। রমেশচন্দ্র দত্ত—ঋগ্বেদ সংহিতা (৬ খণ্ড)

২। দুর্গাদাস লাহিড়ী—ঋগ্বেদ সংহিতা (৮ খণ্ড), সামবেদ (৯ খণ্ড), কৃষ্ণ যজুর্বেদ (৭ খণ্ড), শুক্ল যজুর্বেদ (২ খণ্ড), অথর্ববেদ সংহিতা (৫ খণ্ড)।

৩। হরফ প্রকাশনী—ঋগ্বেদ সংহিতা (২ খণ্ড), সামবেদ সংহিতা, যজুর্বেদ সংহিতা, অথর্ববেদ সংহিতা।

৪। পরিতোষ ঠাকুর—বেদ গ্রন্থমালা

৫। সত্যব্রত সামশ্রমী—সামবেদ ও যজুর্বেদ

৬। নলিনীকান্ত গুপ্ত—বেদমন্ত্র

৭। অনির্বাণ—বেদ মীমাংসা (৩ খণ্ড)

৮। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ—ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ

৯। মৈত্রেয়ী দেবী—ঋগ্বেদের দেবতা ও মানুষ

১০। বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য—বৈদিকদেবতা (বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ গ্রন্থমালা)

১১। উমাকান্ত হাজারী—বৈদিক গবেষণা

১২। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়—বেদবাণী

১৩। মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী—বেদ পরিচয়

১৪। মতিলাল দাস—ঋগ্বেদ

১৫। সত্যব্রত ভট্টাচার্য—ত্রয়ী-পরিচয়

১৬। ভোলানাথ গিরি—শুক্ল যজুর্বেদ

১৭। সত্যচরণ রায়—সামবেদ সংহিতা

১৮। জীবানন্দ ভট্টাচার্য—সামবেদ সংহিতা

১৯। দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী—সামবেদ, ঋগ্বেদ সংহিতা, বেদামৃত

২০। নৃসিংহ প্রসাদ শাস্ত্রী - বেদ পরিচয়

২১। সত্যবান—বেদ পরিচয়

২২। যোগীরাজ বসু—বেদের পরিচয়

২৩। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—বেদবাণী

২৪। মাখনলাল সরকার—বেদবাণী

২৫। রামঠাকুর—বেদবাণী

২৬। যোগেশচন্দ্র রায়—বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল

২৭। হরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য—ঋগ্বেদ

২৮। স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ—বেদ ও বিজ্ঞান

২৯। নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য—অথর্ববেদে জাতীয় সংস্কৃতি

৩০। যোগেন্দ্রনাথ বাগচী—বেদের মন্ত্রভাগে অধ্যাত্মবিদ্যা

৩১। গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়—বৈদিক সাহিত্য সংকলন

৩২। উমেশচন্দ্র বটব্যাল—বেদ প্রবেশিকা

সূচীপত্র

সাঙ্কেতিক চিহ্ন : ঋগ্বেদের উদ্ধৃতিতে ৫।১২।১৫-র অর্থ ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ১২ সূক্তের ১৫ ঋক্। ঋগ্বেদ দশটি মণ্ডলে বিভক্ত, সম্পূর্ণ কবিতাকে সূক্ত ও এক একটি শ্লোককে ঋক বা মন্ত্র বলে। এই সূত্র জানা থাকলে মূল গ্রন্থে যে কোন ঋক খুঁজে পেতে কোন অসুবিধা হবে না। অন্য বেদেরও উপযুক্ত সাঙ্কেতিক চিহ্ন আছে।

মুখপত্র

একটা কথা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। বেদ ভারতের নিজস্ব সম্পদ, কিন্তু কিছুদিন পূর্বে ভারতবাসীর কাছে কতটা সমাদৃত ছিল তা জানা যায় না। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এই অমূল্য গ্রন্থ রক্ষার কী ব্যবস্থা ছিল তা পণ্ডিত ব্যক্তিরাই হয়তো জানেন। আমরা শুনেছি যে জর্মন ভাষায় সামবেদের প্রথম অনুবাদ হয় ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে, তার চার বৎসর পর শুক্ল যজুর্বেদ। এই সময়ের মধ্যেই অর্থাৎ ১৮৪৮ থেকে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয় Rigveda on livre de Hymnes। ম্যাক্সমূলার সাহেব ইংরেজী ভাষায় সায়ন ভাষ্য সহ সমগ্র ঋগ্বেদ সংহিতা ছয় খণ্ডে প্রকাশ করেন ১৮৪৯ থেকে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। রমেশচন্দ্র দত্ত বাঙলায় এই গ্রন্থের টীকা সহ অনুবাদ প্রকাশ করেন ১৮৮৫ থেকে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। এই গ্রন্থও ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হয় এবং এই গ্রন্থ পাঠ করেই আমরা ঋগ্বেদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছি। দুর্গাদাস লাহিড়ী ১৯২৫ থেকে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চার বেদের উপরে একুত্রিশটি খণ্ড প্রকাশ করে গেছেন। বেদের অনুবাদ ও বেদ বিষয়ে আলোচনা গ্রন্থের কিছু নাম এই গ্রন্থের শেষে গ্রন্থপঞ্জীতে দেওয়া হল।

বেদ হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ বলে পরিচিত। কিন্তু গীতা বা চণ্ডীপাঠের মতো বেদ পাঠের কোন বিধান আমাদের প্রচলিত শাস্ত্রে নেই। অনেক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার কোন ব্যবস্থা আজও হয় নি। তাই আমরা এই মহাগ্রন্থের বিষয় বস্তুর সঙ্গে আজও পরিচিত হতে পারি নি এবং বেদকে ধর্মগ্রন্থ রূপে মেনে নিয়ে তার কাছ থেকে দূরে থাকতেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

সত্যিই কি বেদ হিন্দুর ধর্ম গ্রন্থ? যদি তাই হয় তবে এই গ্রন্থে ধর্মের কী বিধান আছে? কোন্ ধর্ম কার্যে এই গ্রন্থের প্রয়োজন হয়? এই প্রশ্নের উত্তর কে দেবেন জানা নেই। তবে বেদ পাঠের পর সাধারণ পাঠকের যে কথা মনে আসতে পারে তা বলি।

ঋগ্বেদের ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে অছে ঋষিদের 'দেহি দেহি' রব— আমাদের ধন দাও, গোধন দাও, আর বধ কর আমাদের শত্রুদের। চাই ছাড়া দেবতাদের কাছে আর আমাদের বলবার যেন কিছু নেই। পাঠকের মন খারাপ হয়ে যাবে, মনে হবে যেন এক ভিখারীর জাতের প্রতিনিধিদের লেখা পড়ছি। ঋগ্বেদের প্রথম দিকের এই সমস্ত রচনা পড়ে বুঝতে কষ্ট হবে না যে আর্য নামের একটি জাতি স্বদেশ থেকে এই দেশে এসে প্রচণ্ড অভাবের মধ্যে জীবন যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন। স্বদেশেও হয়তো

তাঁদের অবস্থা এই রকমই ছিল। তার পর ভারতভূমি শস্যশামল হয়ে গোধন ও পশু দিয়ে যখন এই অভাব দূর করল, তখনই তাঁদের ভাবনার ধারা পালটে গেল। এক দিন যাঁরা সমান জীবনের জন্য সর্বস্ব পণ করেছিলেন, সম্পদের আস্বাদে সেই চিন্তা বদলে গেল, সৃষ্টি হল ধনী ও দরিদ্রের, সমাজে এল বর্ণাশ্রম ধর্ম। ভূমিহীন সম্পদহীন দাস বা অনার্য জাতি শূদ্র নামে পরিচর্যা করবে আর্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের। বেদের কোনখানে চার বর্ণের একটিরও উল্লেখ নেই। হঠাৎ শেষ মণ্ডলে একটি সূক্ত পাওয়া গেল যে পুরুষের দেহ থেকে উৎপত্তি হয়েছে এই চার বর্ণের। বেদের নাম করে যে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরাই বর্ণ বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আজ দিন বদলেছে, পরাজিত নিপীড়িত জনগণই ফিরে এসেছে ক্ষমতায়। তাই বর্ণভেদের যুগ শেষ হয়ে যাচ্ছে, সমান জীবন যাত্রার দিন আসছে ফিরে। ফিরে আসছে বেদের সেই পুরনো দিনগুলি, মানুষ যখন মানুষের সঙ্গে মিলিত হত সমান অধিকারে। শত্রুর সংজ্ঞা এখন পালটে গেছে, অভাব এখন আমাদের শত্রু, শত্রু দারিদ্র্য। অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমাদের বাঁচতে হবে। পড়ে দেখতে হবে ঋগ্বেদের সেই প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা।

না, বেদ কোন ধর্ম গ্রন্থ নয়। ঋগ্বেদে দেবতার কাছে প্রার্থনা আছে, কোন ধর্মানুষ্ঠানের কথা নেই। তার বদলে আছে সেই প্রাচীন আর্য জাতির সরল অনাড়ম্বর জীবন যাত্রার কথা, নারীর মর্যাদার কথা, কবি কলপনা ও দার্শনিক চিন্তার কথা। ঋগ্বেদ একাধারে ইতিহাস ভূগোল ও প্রাচীন সাহিত্য সংস্কৃতির অপরূপ নিদর্শন। এই গ্রন্থের সমস্ত আলোচনাই ঋগ্বেদ অবলম্বন করে, প্রয়োজন মতো ঋক বা সূক্তের বাঙলা অনুবাদ ব্যবহার করা হয়েছে বেদের ভাষা প্রায় দুর্বোধ্য বলে। বেদাঙ্গ ও বেদান্তের কথাও সংক্ষেপে বলা হয়েছে। আর চার বেদের পরিচয় দেবার সময়ে প্রত্যেকটি বেদ থেকে কিছু পরিচিত মন্ত্রের উদ্ধৃতি ও তার বাঙলা অনুবাদ দেওয়া হয়েছে পাঠক সাধারনের অবগতি ও রসাস্বদের জন্য। বলা বাহুল্য যে এই গ্রন্থ প্রণয়নে গ্রন্থ পঞ্জীতে উল্লিখিত বহু গ্রন্থেরই সাহায্য নিয়েছি। এই বই পড়ে পাঠক যদি মূল বেদ পাঠের সামান্যতম আস্বাদ ও আনন্দ পান, তবে গ্রন্থকারের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে হবে।

রম্যাণি
বি. এফ. ৭৭, সল্ট লেক সিটি, গ্রন্থকার
কলকাতা-৭০০০৬৪।

১. বেদ কি মানুষের রচনা নয়?

বেদ শব্দটি আমরা অনেকেই শুনেছি, কিন্তু বেদের সঙ্গে পরিচয় আমাদের সবার সমান নয়। সবার কথা না জানলেও নিজের কথা আমি ভাল ভাবেই জানি এবং সত্য কথা স্বীকার করতে লজ্জা পাই নে। শৈশবেই এই নামটা শুনেছিলাম বড়দের মুখে এবং বুঝেছিলাম যে এই নামের একখানা ভয়াবহ ধর্মগ্রন্থ আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করবে। কিন্তু নিজের চোখে এই বই কোন দিন দেখি নি।

তার পর স্কুলে যখন ইতিহাসের বই হাতে পেলাম, তখন তার প্রথম দিকেই পড়লাম—আর্যদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম বেদ। এই বিশাল ধর্ম সাহিত্য বহু শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছে। বেদ চার ভাগে বিভক্ত—ঋক্, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব। প্রত্যেক বেদের আবার তিনটি ভাগ আছে। যথা—সংহিতা, আরণ্যক ও উপনিষদ সহ ব্রাহ্মণ এবং সূত্র অথবা বেদাঙ্গ। স্তব, স্তুতি এবং যজ্ঞের মন্ত্র—প্রায়শ এই সমস্ত বিষয় বস্তু নিয়েই বেদের সংহিতা ভাগ পদ্যে রচিত হয়েছে। গদ্যে লিখিত ব্রাহ্মণ অংশে যজ্ঞের বিবিধ অনুষ্ঠানের সার্থকতা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা ও মন্তব্য আছে। অরণ্যবাসী ঋষি ও ব্রহ্মচারীদের দার্শনিক চিন্তার ধারা আরণ্যক ও উপনিষদে স্থান পেয়েছে।

এর পর ঐতিহাসিক লিখেছেন, ভগবান স্বয়ং বেদের এই সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভাগ রচনা করেছেন, সুতরাং তা অভ্রান্ত ও বিচার বিতর্কের অতীত, হিন্দুদের এই ধারণা। বেদকে তাই নিত্য, শাশ্বত ও অপৌরুষেয় বলা হয়। আর্য-ঋষিরা এই সমস্ত মন্ত্র জ্ঞাননেত্রে দেখেছিলেন বলেই তাঁদের দ্রষ্টা বলা হয়। বেদের অবশিষ্ট অংশ বেদাঙ্গ মানুষের রচনা বলে স্বীকৃত হয়।

পরীক্ষায় পাশ করবার জন্য বেদের এই পরিচয় আমরা মুখস্থ করেছিলাম। বুদ্ধের কথায় এও পড়েছিলাম, উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বের উপর বুদ্ধের ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে এর অনেক প্রভেদ ছিল। বেদের অপৌরুষেয়তা বা অবিসংবাদিত্ব এবং জন্মগত জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব বুদ্ধ স্বীকার করতেন না। বেদোক্ত যাগযজ্ঞে নির্বাণ বা মুক্তিলাভ হতে পারে, বুদ্ধ তা মানতেন না। বুদ্ধের ধর্মমত অত্যন্ত সরল। তাঁর মতে মানুষ নিজের কর্মের দ্বারা নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে তোলে; কোন দেব দেবীর এতে হাত নেই।

জৈন ধর্মের প্রসঙ্গেও ঐতিহাসিক লিখেছেন—উভয় ধর্মেরই মূল সূত্রগুলি ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র সমূহ থেকে গৃহীত, কিন্তু উভয়েই বেদের অপৌরুষেয়তা ও অবিসংবাদিত্ব এবং যাগযজ্ঞের বিরোধী। মানুষ যে নিজের কর্মফল-বশতই সংসারে দুঃখ ভোগ করে এবং সর্বজীবে অহিংসা ও বিশুদ্ধ নৈতিক জীবন যাপনই যে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় এ সম্বন্ধে উভয়েই এক মত। উভয় ধর্মই ঈশ্বর সম্বন্ধে নির্বাক।

ধর্ম সম্বন্ধে এই রকমের ধারণা নিয়েই আমাদের জীবন আরম্ভ করতে হয়েছে। বেদের কোন অংশ কখনও আমাদের পাঠ্য সূচীতে ছিল না। কিন্তু বাইবেল পড়তে হয়েছে। ইংরেজ আমলে স্কুল কলেজে বাইবেল পড়ানো হত। কলেজে সংস্কৃত ক্লাসে গীতারও একটা অধ্যায় পড়তে হয়েছে। কিন্তু বেদের কোন অংশের মূল বা অনুবাদ পড়বার সৌভাগ্য কখনও হয় নি। স্কুল কলেজে তো নয়ই, উত্তর জীবনেও কখনও কিছু পড়বার সুযোগ পাই নি। রামায়ণ বা মহাভারতের যেমন শিশুপাঠ্য সংস্করণ আছে, কিংবা গীতা বা চণ্ডীর মূল ও অনুবাদ জনসাধারণের হাতের কাছে পেঁছে দেওয়া হয়েছে, বেদের সে রকম কোন সংস্করণের সংবাদ আমাদের অজ্ঞাত ছিল। তাই বেদ সম্বন্ধে একটা ভয় আজও আমাদের আচ্ছন্ন করে আছে।

পুরাণের কিছু গল্পও আমরা পড়েছিলাম। তাতে জেনেছিলাম যে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার ছিল চার মুখ, এই চার মুখে তিনি চার বেদ বলেছিলেন। এ যেন চার বেদ বলবার জন্যই তাঁর চারটি মুখের দরকার হয়েছিল। তার পর এও পড়েছিলাম যে মহাভারত রচনা করেছিলেন যে বেদব্যাস, তিনিই নাকি বেদ বিভাগ করেছিলেন। অর্থাৎ বেদ সংগ্রহ করে তাকে চারটি ভাগ করেছিলেন বলেই তাঁর নাম হয়েছিল বেদব্যাস। বেদ যে মানুষের রচনা নয়, বেদ ভগবানের মুখ থেকে বেরিয়েছিল, এই কথাই নানা জায়গায় নানা ভাবে পড়ে ছোটবেলা থেকেই আমরা বেদকে আমাদের ধর্মগ্রন্থ বলে ভেবে রেখেছিলাম। ইতিহাসের ফাঁকি আমরা বুঝতে পারি নি। বেদ অপৌরুষেয়, এ হিন্দুদের ধারণা। কিন্তু নিজের ধারণার কথা ঐতিহাসিক বলেন নি। হিন্দু হয়ে বোধহয় সত্য কথা বলা যায় না। তাই আজও পর্যন্ত কোথাও এ কথা পড়ি নি বা শুনি নি যে বেদ রচনা করেছিলেন সেকালের কবিরা, যাঁদের সাধারণ নাম ছিল ঋষি। তাঁরা যে প্রকৃতির নানা রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে নানা ভাবে তার বর্ণনার চেষ্টা করেছিলেন, এ কথা আমরা এখনও বিশ্বাস করি না। প্রাকৃতিক শক্তিকে তাঁরা দেবতা ভাবতেন। দেবত্ব আরোপ করেছেন সেই সব শক্তির উপরে—এই কথা

না বলে আমরা সেই প্রাচীন কবিদের কল্পনা শক্তিকে ধ্যানে ভগবানের দান বলে বিশ্বাস করি। বলি যে ঋষিরা তপস্যা করে ভগবানের কাছ থেকেই বেদ পেয়েছিলেন। এরই অর্থ—বেদ অপৌরুষেয়, বেদ হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ। এই ধারণা আমাদের হৃদয়ে এমন বদ্ধমূল যে আমরা অন্য কথা বলবার সাহসও হারিয়ে ফেলেছি।

বেদ নিয়ে আলোচনা গ্রন্থ কিছু ছিল, পদ্যে কিছু অনুবাদও আছে। সাম্প্রতিক কালে চার বেদের মূল এবং অনুবাদও পাওয়া যাচ্ছে। বেদের বিষয় বস্তু নিয়ে কিছু গ্রন্থ ও নিবন্ধ রচনাও হয়েছে। ঠিক এই সময়ে বেদ আর আগের মতো দুষ্প্রাপ্য নয়। কিন্তু একটি কথা স্বীকার করতে হয়। বেদ সম্বন্ধে প্রাচীনকালের পণ্ডিতরা যা বলেছিলেন এবং দেশ-বিদেশের পণ্ডিতরা যে সব মত প্রকাশ করেছিলেন, আজও আমরা তা শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে চলেছি। স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে বেদের নূতন মূল্যায়নে আমরা এখনও যত্নবান নই। এ কাজ না করলে বেদ সম্বন্ধে আমাদের পুরনো ধারণার কোন পরিবর্তন হবে না।

আমি কী বলতে চাইছি তা বোঝাবার জন্য দু একটি উদাহরণ দিতে ইচ্ছা হচ্ছে। ঋগ্বেদ থেকেই এই উদাহরণ উদ্ধার করছি। প্রথম মণ্ডলের ১২৬ নম্বর সূক্ত বা কবিতার সরল অনুবাদ করছি। কক্ষীবান ঋষি রাজা ভাবয়ব্যের উদ্দেশে বলছেন—

সিন্ধুবাসী ভাবয়ব্যের জন্য নিজ বুদ্ধিবলে
সম্পাদন করি বহু স্তোম।
হিংসা রহিত রাজা কীর্তি লাভের কামনায়
সহস্র সোমযাগ করেছেন আমার জন্য ॥ ১ ॥
অসুর রাজা গ্রহণের জন্য আমাকে বলতেই
আমি কক্ষীবান তাঁর নিকটে শত নিষ্ক,
শত অশ্ব ও শত বলীবর্দ করলাম গ্রহণ।
রাজা তাঁর শাশ্বতী কীর্তি বিস্তার করবেন স্বর্গলোকে ॥ ২ ॥
স্বনয়ের দেওয়া শ্যাম অশ্ব-বাহিত দশখানি রথ
বধূ সমন্বিত হয়ে এল আমার নিকটে।
গাভী এল এক সহস্র ষাট।
কক্ষীবান তাই নিয়ে পরদিনই দিল তার পিতাকে ॥ ৩ ॥
সহস্র গরুর সামনে দশ রথের চল্লিশ অশ্ব
চলতে লাগল শ্রেণীবদ্ধ হয়ে।
কক্ষীবানের অনুচররা তৃণাদি খাদ্য দিয়ে
পরিচর্যা করতে লাগল সেই গতিশীল অশ্বদের ॥ ৪ ॥

বন্ধুরা আমার, পূর্বের দান স্মরণ করেই করেছি গ্রহণ
একাদশ রথ ও বহুমূল্য গাভী তোমাদেরই জন্য।
প্রজাদের মতো অনুরাগ সমন্বিত হয়ে
কীর্তি লাভের চেষ্টা করুক শকট বিশিষ্ট অঙ্গিরাগণ ॥ ৫ ॥

এর পর রাজা ঋষি তাঁর স্ত্রী লোমশার উদ্দেশে বলছেন—

আলিঙ্গিতা হয়ে এই সম্ভোগ যোগ্যা রমণী
চিরকাল রমণ করে সূত বৎসা নকুলীর মতো।
বহু তেজ যুক্ত হয়ে এই নারী
শতবার ভোগ প্রদান করেছে আমাকে ॥ ৬ ॥

এর পর লোমশা ঋষি তাঁর স্বামীর উদ্দেশে বলছেন—

কাছে এসে স্পর্শ কর আমাকে,
ভেবোনা যে অঙ্গে আমার অল্প লোম।
গান্ধারের মেষীর মতো লোম আমার দেহে,
আর পূর্ণ আমার অবয়ব ॥ ৭ ॥

এই সাতটি ঋক্ বা শ্লোকে সম্পূর্ণ এই সূক্ত বা কবিতাটি। এর টীকায় সায়ণ বলেছেন, তৎ পুত্রস্য স্বনয়স্য ইত্যর্থঃ। Wilson বলেছেন, Either the river 1ndus or the shore. নিস্ক শব্দের দুটি অর্থ—আভরণ ও সুবর্ণ। অর্থাৎ প্রাচীন কালে নিষ্ক নামে ছোট ছোট সোনার খণ্ড মুদ্রা রূপে প্রচলিত ছিল এবং আভরণ রূপেও ব্যবহৃত হত। গান্ধার বলা হত বর্তমানের পেশওয়ার প্রদেশকে। এই অঞ্চলের মেষের লোম এখনও প্রসিদ্ধ।

এইবারে আমার প্রশ্ন হল, এই সূক্তটিতে কি আমরা কোন দেবতার স্তব পাই, না এই সূক্তটি পড়ে মনে হয় যে কোন ধ্যানমগ্ন ঋষিকে ভগবান এটি দিয়েছিলেন?

এই রকমের আরও একটি সূক্ত উদ্ধারের লোভ সামলাতে পারছি না। এটিও ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের সূক্ত, এর নম্বর ১৭৯। গোড়াতেই বলা হয়েছে যে এই সূক্ত কোন দেবতা সম্বন্ধে রচিত হয়নি। অগস্ত্য ও তাঁর স্ত্রী এবং শিষ্যের মধ্যে কথোপকথন মাত্র। অতএব তাঁরাই এই সূক্তের ঋষি। সংলাপের বিষয় অনুসারে রতি বা সম্ভোগ এর দেবতা বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। সূক্তটির সরল অনুবাদ এই রকম।—

লোপামুদ্রা বলছেন—

বহু বৎসর রাত্রি দিন ও জরা উৎপাদক ঊষায়
তোমার সেবা করে শ্রান্ত হয়েছি আমি।

শরীরের সৌন্দর্য নাশ করেছে জরা।
এখন কী? স্ত্রীর নিকটে আসুক পুরুষ ॥ ১ ॥
যে প্রাচীন ঋষিরা সত্য বলতেন দেবতাদের সাথে,
তাঁরাও সম্ভোগ করেছেন প্রণয় সুখ।
কিন্ত পান নি তার অন্ত।
এবারে স্ত্রীর নিকটে আসুক পুরুষ ॥ ২ ॥

এর উত্তরে অগস্ত্য বলছেন—

আমরা শ্রান্ত হই নি বৃথা, রক্ষা করছেন দেবতারা।
সমস্তই আমরা পারি উপভোগ করতে।
যদি উভয়ে হই চেষ্টান্বিত,
তবে এই জগতের শত ভোগও পারব ভোগ করতে ॥ ৩ ॥
যদিও আমি নিযুক্ত জপ ও সংযমে
তবু আমার মনে জন্ম নিয়েছে প্রণয়।
লোপামুদ্রা সঙ্গত হোন সমর্থ পতিতে,
অধীরা স্ত্রী উপভোগ করুন ধীর ও মহাপ্রাণ পুরুষ ॥ ৪ ॥

এবারে শিষ্য বলছেন—

আমি প্রার্থনা করছি সোমপান করে
হৃদয়স্থ সোমের নিকটে একান্তে,
তিনি সুখী করুন আমাকে
এই বহু কামনায় ভরা মর্ত্য লোকে ॥ ৫
উপযুক্ত কাজ করেছিলেন উগ্র ঋষি অগস্ত্য।
বহু পুত্র ও বলের কামনায় সম্ভোগ করেছিলেন প্রণয় সুখ।
জপ তপ সাধন ও ধর্ম পোষণ করেও
পেয়েছিলেন দেবতাদের সত্য আশীর্বাদ ॥ ৬ ॥

এখানেও দেবতার স্তব নয়, যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান নয়। এই সূক্তে রক্তমাংসের মানুষের কামনা বাসনার কথাই অকপটে প্রকাশিত হয়েছে। লোপামুদ্রা তাঁর কামনার কথা স্বামীকে জানাতে এতটুকু দ্বিধা করেন নি। অগস্ত্যও জীবনের পরম সত্যকে স্বীকার করেছিলেন ধর্মের সঙ্গে অবিরোধে। তাদের এই গোপন কথা শিষ্যরাও জানতে পেরেছিল। পরবর্তী যুগের জন্য তারাও বলে গিয়েছে যে জীবনের ধর্মকে মেনে নিয়েও অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা দেবতার আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন।

আমরা শুনেছি যে নারী এবং শূদ্র বেদ পাঠের অধিকারী নয়, এরা কোন ধর্ম কাজেরও নাকি অধিকারী নয়। অথচ উপরে উদ্ধৃত দুটি সূক্তেই দেখা যাচ্ছে যে পুরুষের সঙ্গে নারীও ঋগ্বেদের ঋক রচনা

করেছেন। বেদের অনেক সূক্তই নারী ঋষির রচনা। ইন্দ্রাণী ঋষি তো সপত্নী পীড়নের কথা লিখেছেন দশম মণ্ডলের ১৪৫ সূক্তে। তার সরল অনুবাদ এই রকম—

এই তীব্র শক্তির লতা, এই ওষধি,
এ আমি উদ্ধার করছি খনন করে।
সপত্নীকে ক্লেশ দেওয়া যায় এই দিয়ে,
এই দিয়ে লাভ করাও যায় স্বামীর প্রণয় ॥ ১ ॥
ওগো ওষধি, তোমার উন্নত মুখ,
উপায় তুমি আমার স্বামীর প্রিয় হবার।
তোমার তো তীব্র তেজ, দূর করে দাও আমার সপত্নীকে।
আমার স্বামী যাতে বশে থাকে আমারই, তাই কর তুমি ॥ ২ ॥
ওগো ওষধি, তুমি প্রধান।
আমিও যেন প্রধান হই।
প্রধানের উপরে প্রধান,
আর আমার সপত্নী যেন নীচ হয় নীচেরও ॥ ৩ ॥
সে সপত্নীর নাম আমি মুখে আনি না।
সে তো সবার অপ্রিয়!
আমি তাকে পাঠাতে চাই
দূর থেকে আরও দূরে ॥ ৪ ॥
ওগো ওষধি, অসীম ক্ষমতা তোমার,
আমারও ক্ষমতা আছে।
এসো আমরা সপত্নীকে করি হীন-বল
উভয়ে মিলে ক্ষমতাপন্ন হয়ে ॥ ৫ ॥
ওগো পতি, এই ওষধি রাখলাম তোমার মাথার দিকে,
আর মাথার জন্য দিলাম এই জোরালো উপাধান।
তোমার মন হোক আমার দিকে,
গাভী যেমন বৎসের দিকে যায়, আর জল যায় নিচের দিকে ॥৬॥

টীকায় এই সূক্তকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলা হয়েছে। সমাজে তখন বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং সপত্নীদের মধ্যে যে বিদ্বেষের ভাব ছিল তা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। এই সূক্তটি ইন্দ্রাণী ঋষি রচনা করেছিলেন সপত্নীদের উপরে প্রভুত্ব লাভের মন্ত্র হিসাবে। সূক্তের দেবতা সপত্নী পীড়ন।

এইবারে বসিষ্ঠ ঋষির একটি সূক্তের কথা বলব। সপ্তম মণ্ডলের ৫৫ নম্বর সূক্ত। সূক্তের দেবতা বাস্তোষ্পতি ও ইন্দ্র। কুকুর হল গৃহ

রক্ষক বাস্তুপতি। ঋষি এই কুকুরের স্তব করছেন, ইন্দ্রের নয়। এর সরল অনুবাদ এই রকম—

ওগো বাস্তুপতি, তুমি নাশ কর রোগ,
সব রূপে প্রবেশ করে সখা ও সুখের হও আমাদের ॥ ১ ॥
সাদা ও পিঙ্গল রঙের সরমা পুত্র,
অস্ত্রের মতো তোমার দাঁতের শোভা।
সুখে ঘুমোও তুমি ॥ ২ ॥
হে সারমেয়, তুমি কোথাও গিয়েই আসো ফিরে,
ছুটে যাও চোর ডাকাতের দিকে।
ইন্দ্রের স্তোতাদের কাছে কেন যাও?
কেন বাধা দাও আমাদের?
সুখে ঘুমোও তুমি ॥ ৩ ॥
তুমি বিদারণ কর শূকর,
শূকরও তোমাকে বিদারণ করতে পারে।
ইন্দ্রের স্তোতাদের কাছে কেন যাও?
কেন বাধা দাও আমাদের?
সুখে ঘুমোয় তুমি ॥ ৪ ॥
তোমার মাতা ঘুমলো, ঘুমলো তোমার পিতা,
কুকুর ঘুমোক, ঘুমিয়ে পড়ুক গৃহস্বামী,
বন্ধুরাও ঘুমোক,
আর ঘুমিয়ে পড়ুক চারিদিকের জনগণ ॥ ৫ ॥
এখানে যে আছে, বিচরণ করছে এখানে,
আর দেখছে আমাদের,
তাদের চোখ নষ্ট করে দেব,
তারা হবে এই গৃহের মতো অন্ধ ॥ ৬ ॥
সহস্র শৃঙ্গ নিয়ে যে বৃষভ উঠে আসে সমুদ্র থেকে,
আমাদের অভিভাবক সে।
তারই সাহায্যে ঘুম পাড়াব জনগণকে ॥ ৭ ॥
যে নারীরা শুয়ে আছে প্রাঙ্গনে,
আর যারা বাহনে বা শয্যায় শুয়ে আছে,
পুণ্য গন্ধা তারা!
ঘুম পাড়াব তাদের সবাইকে ॥ ৮ ॥

এর টীকায় বলা হয়েছে যে সমুদ্র থেকে উদ্গত সহস্র শৃঙ্গ বৃষভ সহস্র রশ্মি সূর্য বা চন্দ্র হতে পারে। বাস্তোস্পতি গৃহের পালয়িতা

দেবতা। সরমার কুলোদ্ভব বলে সারমেয় নামে অভিহিত হয়েছেন।

এর ঠিক পূর্ববতী সূক্তটিও বসিষ্ঠ ঋষির রচনা, বাস্তোস্পতি দেবতা। তার অনুবাদ—

হে বাস্তুপতি, প্রবোধিত কর তুমি আমাদের,
নীরোগ কর আমাদের নিবাস।
দাও আমাদের যে ধন আমরা চাই,
হও সুখকর আমাদের পুত্র পৌত্র ও পশুদের ॥ ১ ॥
হে বাস্তুপতি, বর্ধয়িতা হও তুমি আমাদের ধনের।
তুমি সখা হলে জরারহিত হব আমরা,
গাভী ও অশ্বও হবে আমাদের।
পিতা যেমন পালন করে পুত্রদের,
আমাদেরও তুমি পালন কর তেমনি করে ॥ ২ ॥
হে বাস্তুপতি, আমরা যেন করি লাভ,
তোমার রমণীয় সুখকর ও ধনযুক্ত স্থান।
যে বরণীয় ধন আমরা পেয়েছি ও পাইনি এখনও,
তা রক্ষা কর তুমি।
কল্যাণের সঙ্গে আমাদের পালন কর সর্বদা ॥ ৩ ॥

এই পাঁচটি সূক্তের অনুবাদ পড়বার পরেও কি মনে হয় যে বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন মানুষের রচনা নয়? মানুষের রচনা না হলে মানুষের মনের কথা এমন আন্তরিক ভাবে বললেন কে? এ কি ধর্মের কথা? না জীবনের কথা? ধর্মগ্রন্থ বলে কি আমরা বেদকে আজও দূরে সরিয়ে রাখব?

২. বেদ কবে, কারা, কত দিন ধরে রচনা করেছিলেন?

দেশ বিদেশের বড় বড় পণ্ডিতেরা বেদ রচনার কাল নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। কোন বিদেশী পণ্ডিত মনে করেন যে বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়েছে খ্রীষ্টের জন্মের চার হাজার বৎসর আগে। আবার কেউ একে ১০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের আগের রচনা বলে মানতে রাজী নন। আমাদের দেশের পণ্ডিতদের মধ্যেও মতের এই রকম বিরোধ আছে। কাজেই বেদ কত দিনের পুরনো সে সম্বন্ধে আমরা অন্ধকারেই আছি।

কিন্তু এটা পৃথিবীর বয়স নির্ণয় নয় যে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে নিজের মাথাই খারাপ হয়ে যাবে। হাতে কোন গ্রন্থ থাকলে তার কাল নির্ণয়ের জন্য নানা উপায় আছে। ভাষা দেখে সময় বলাই সবচেয়ে সুবিধার। ভাষাতত্ত্ববিদরা তা করেছেন। তাতে জানা গেছে যে বেদ আরও সাম্প্রতিক কালে রচিত হয়েছে।

আমরা একটা সোজা কথা বুঝি। চারটি বেদের মধ্যে ঋগ্বেদকেই সব চেয়ে প্রাচীন বলা হয়, কিন্তু এর প্রত্যেকটি সূক্তের উপরে একজন করে ঋষির নাম লেখা আছে। তাঁরা তো এক সময়ের মানুষ নন, একই বংশের অনেক ঋষি যে সূক্তগুলি লিখেছেন, তা বেদেই বলা আছে। তাঁদের ভাষা এক রকম না হতে পারে, হলেও তার বিচার সম্ভব না হতে পারে। তবে বেদের টীকা যাঁরা রচনা করেছেন, তাঁরা অনেক সূক্তকে আধুনিক কালের রচনা বলেছেন। তার মানে বেদে আধুনিক কালের রচনার সঙ্গে প্রাচীন কালের রচনাও মিলে আছে। সবচেয়ে প্রাচীন কালের রচনা কোনগুলি এবং তা কতকালের পুরনো তার হিসাব কি ভাষাতত্ত্ববিদরা সঠিক ভাবে করেছেন!

আমার মনে হয়েছে যে যাঁরা বেদের সূক্ত রচনা করেছেন সেই ঋষিদের কাল নির্ণয় করতে পারলে খুব সহজেই বেদের প্রাচীনত্ব বেরিয়ে পড়বে। এ কাজটা খুব সহজেই হতে পারে।

একটা সত্য আমরা সবাই মেনে নিয়েছি। সেটা হল যে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন নামে একজন ঋষি বেদ বিভাগ বা সংকলন করে বেদব্যাস নাম পেয়েছিলেন। এক বিদেশী পণ্ডিত বলেছেন যে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি এই কাজটি করেছিলেন। এটি বেশ যুক্তিগ্রাহ্য

কথা বলে আমার মনে হয়েছে। যুধিষ্ঠির ছিলেন ধার্মিক রাজা, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন তাঁর পিতামহ স্থানীয়, অগাধ জ্ঞানের অধিকারী বলে বিখ্যাত। সারা জীবন জ্ঞানের চর্চা করে পুরাণ সংহিতা মহাভারত বেদান্ত দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ যিনি রচনা করেছেন, তিনি যে বেদ সংগ্রহ করে বিভাগ করবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সেকালে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। বেদ শ্রুতি নামে অভিহিত ছিল, গুরু-পরম্পরায় তা চলে আসছিল। শুধু ব্রাহ্মণদের নয়, ক্ষত্রিয়দেরও বেদ অধ্যয়ন করতে হত গুরুগৃহে। তাই যুধিষ্ঠির রাজা হবার পর তাঁর পিতামহকে সমগ্র বেদ সংগ্রহ করে যে সংহিতাকারে সংকলন করতে বলবেন, তা খুবই যুক্তির কথা। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন এই মহৎ কাজ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বেই এই কাজ করেছিলেন, কারণ তখন তার এই শ্রমসাধ্য কাজ করার ক্ষমতা ছিল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল আমরা জানি। সেই যুদ্ধ এ দেশের ঐতিহাসিক ঘটনা বলে স্বীকৃত হয়েছে। সেই তারিখটা যাচাই করে দেখলেই বেদ সংগ্রহের ও সংকলনের সময় কতকটা নিশ্চিত ভাবে ধরা যাবে।

আমাদের পঞ্জিকায় কল্যব্দের উল্লেখ থাকে। কল্যব্দ মানে কলির আরম্ভ। কী ভাবে এই কল্যব্দ চালু হল তা জানা দরকার। যত দূর জানা যায়, প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্যভট সর্ব প্রথম এই কল্যব্দের কথা বলেন ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। সেদিন তিনি বলেছিলেন যে কলির ৩৬০০ বৎসর অতীত হয়েছে, অর্থাৎ কলি যুগের সূচনা হয়েছে ৩১০১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্জিকায় ৫০৮৪ কল্যব্দ উল্লিখিত হয়েছে। এখন ভেবে দেখা দরকার যে কল্যব্দ চালু করেছিলেন কে?

আমাদের ধারণা যে কৃষ্ণের মৃত্যুর পর থেকেই কলিযুগের আরম্ভ। কৃষ্ণের মৃত্যু হয়েছিল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অনেক পরে। তাহলে কি বলা যেতে পারে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়েছিল ৩১০১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দেরও অনেক আগে? এ কথা কেউই মানতে রাজী হবেন না, তার কারণ সকলেই এই যুদ্ধের সময়টা অনেক পরবর্তী কালে বলে উল্লেখ করেছেন।

তাহলে যুধিষ্ঠিরের পর একজন শক্তিশালী সম্রাটকে খুঁজে বার করতে হবে এবং তার জন্য নিশ্চিত ভাবে বলা যেতে পারে মহাপদ্ম নন্দই এমন একজন সম্রাট যিনি তাঁর রাজ্যাভিষেকের দিন থেকে নন্দাব্দ চালু করেছিলেন। নন্দ শূদ্র ছিলেন বলে পুরাণকাররা তাঁকে কলির অংশ বলেছেন এবং তাঁরই প্রচলিত অব্দ যে কলির নামে আবৃত হয়েছিল এ কথার ইঙ্গিতও আছে পুরাণে। তাই নন্দাব্দই কল্যব্দে পরিণত

হয়েছে ধরে নিলে অসঙ্গত হবে না। কিন্তু তারপরে যে কিছু যোগ বিয়োগ হয়েছে তাতে সংশয় নেই।

আর্যভটই কল্যব্দ দেখে ভেবেছিলেন যে এত অল্প দিন আগে কলির আরম্ভ হতে পারে না। তিনি গণনা করে দেখলেন যে সাতাশ নক্ষত্র যুগ অর্থাৎ ২৭০০ বৎসর পূর্বেই কলি যুগের সূচনা হয়েছিল এবং কলাব্দের সঙ্গে ২৭০০ বৎসর জুড়ে দিয়ে বললেন যে ৩১০১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দেই কলির সূচনা হয়েছিল। এত দিন আমরা এই কথাই মেনে এসেছি। কিন্তু এখন যদি আমরা কল্যব্দ থেকে ২৭০০ বৎসর বাদ দিই, তাহলেই দেখব যে আর্যভট যে কল্যব্দ পেয়েছিলেন তা ৪০১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ অর্থাৎ এটিই ছিল মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যাভিষেকের কাল। ঐতিহাসিকরা হিসাব করে বলেছেন যে ৪১৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মহারাজা নন্দ সিংহাসনে বসেছিলেন। আমাদের তারিখটা তাহলে ভুল নয় এবং অনুমান করা তারিখের চেয়ে অনেক বেশি যুক্তিপূর্ণ।

এর পর পুরাণের হিসাব মতো পরীক্ষিতের জন্ম হয়েছিল নন্দের রাজ্যাভিষেকের এক হাজার পনর বৎসর আগে অর্থাৎ ১৪১৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। এই বৎসরেই হয়েছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। কাজেই আমরা অসংশয়ে বলতে পারি যে বেদব্যাস বেদ সংগ্রহ ও বিভাগ করেছিলেন এর আগেই।

পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত কিছু সূক্ত বাদ দিলে বলা যেতে পারে যে মূল বেদ এর পূর্বে রচিত হয়েছিল। কতকাল আগে তা নির্ণয়ের সূত্রও বেদেই পাওয়া যাবে।

যে ঋষিরা বেদের সূক্তগুলি রচনা করেছেন, তাঁদের নাম বেদেই উল্লিখিত আছে। ঋগ্বেদের দশটি মণ্ডল বা ভাগ। এতে দেখা যায় যে প্রথম ও দশম মণ্ডলে বিভিন্ন ঋষির রচিত সূক্ত। দ্বিতীয় মণ্ডলে গৃৎসমদ বংশীয় ঋষি। এইভাবে তৃতীয়, চতুর্থ প্রভৃতি মণ্ডলে যথাক্রমে বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ, বসিষ্ঠ, কণ্ব ও অঙ্গিরা বংশীয় ঋষিরাই সূক্তগুলি রচনা করেছেন। এই ঋষিরা আমাদের পরিচিত। প্রথম ও দশম মণ্ডলেরও বহু ঋষি আমাদের খুবই পরিচিত। অগস্ত্য দীর্ঘতমা গৌতম ছাড়াও বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুছন্দা, কণ্বের পুত্র মেধাতিথি, অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ প্রভৃতি নামও আমাদের শোনা। এই সব ঋষিরা সবাই সমসাময়িক না হলেও তাদের আনুমানিক কাল নির্ণয় কঠিন কাজ নয়।

প্রথমেই দুজন বিখ্যাত ঋষি বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে ধরা যেতে পারে। পুরাণে একাধিক বসিষ্ঠ আছেন বলেই মনে হয়। বিশ্বামিত্রও একাধিক

থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু এদের মধ্যে একজন বসিষ্ঠ যে একজন বা প্রথম বিশ্বামিত্রের সমসাময়িক ছিলেন তাতে কোন সংশয় নেই। তারা মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের সময়ে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিলেন। হরিশ্চন্দ্র যখন বরুণ যজ্ঞের আয়োজন করে অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপকে বলি দেবার ব্যবস্থা করেন, তখন বিশ্বামিত্র তাঁকে বরুণের স্তব করতে বলেন। শুনঃশেপের সাতটি স্তোত্র প্রথম মণ্ডলে আছে—তিনটি অগ্নির স্তব, একটি বরুণের এবং ইন্দ্রাদি দেবতার স্তব তিনটি। প্রথম স্তোত্রে তিনি বলছেন—

দেবতাদের মধ্যে কার জ্যোতির্ময় নাম
এখন চিন্তা করব ?
কে আমাকে ফিরিয়ে দেবেন পৃথিবীতে ?
পিতা মাতাকে কি আবার দেখতে পাব ?—ঋগ্বেদ ১।২৪।১

শুনঃশেপের এই কাহিনী ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, রামায়ণ ও পুরাণে পাওয়া যায়। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীও আমাদের সুপরিচিত। কাজেই এই ঘটনাকে ঐতিহাসিক বলে মেনে নিতেও আমাদের কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়। এখন হরিশ্চন্দ্রের কাল নির্ণয় কি সম্ভব ?

আমি বলব, তা অসম্ভব নয়। যে সূত্র ধরে আমরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল পেয়েছি, সেই সূত্র ধরেই কল্পের আরম্ভ বার করা সম্ভব। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে কৃষ্ণের বয়স যে বিয়াল্লিশ বৎসর তা আমরা জানি। অতএব তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৪৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। পাঁচ হাজার বছরের এক কল্পের তখন সাতাশ পিতৃযুগ অর্থাৎ ৪৫০০ বৎসর অতীত হয়েছিল। এই হিসাবে কল্পের আরম্ভ ৫৯৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। সত্য যুগের পরিমাণ দু হাজার বছর এবং ত্রেতা দেড় হাজার বছরের। এইভাবে হিসাব করলে দেখা যাবে যে ৩৯৫৮ থেকে ১৪৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত ত্রেতাযুগ। এই সময়ে যে রাজারা রাজত্ব করেছেন, তাদের গড় রাজত্ব কাল পঁচিশ বৎসর ধরলে হরিশ্চন্দ্রকে আমরা পাব ৩০৬৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। এর সাত-আটশো বৎসর আগে হয়েছিল দেবাসুরের যুদ্ধ। তারপর রাজা যযাতির সময় থেকেই দেশে শান্তি স্থাপিত হয়।

এর পর আমরা কি বলতে পারি না যে রাজা হরিশ্চন্দ্রের আমলে দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তোত্র পাঠ প্রচলিত ছিল ? তা না থাকলে বালক শুনঃশেপকে বিশ্বামিত্র কেন বরুণের স্তব পাঠ করতে বলবেন ! তবে শুনঃশেপ প্রথমেই বরুণের স্তব করেন নি, করেছিলেন অগ্নির স্তব। তারপর বরুণের স্তব করেছিলেন। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলে বিশ্বামিত্রের নিজের রচিত সূক্ত আছে একচল্লিশটি। অত্রি রচিত সূক্ত আছে পঞ্চম

মণ্ডলে। এঁকে ব্রহ্মার মানস পুত্র বলা হয়। এর অর্থ বোধহয় এই যে ইনি একজন প্রাচীন ঋষি এবং এঁর পিতৃ-পরিচয় অজ্ঞাত। এই সব বিচার করে অনুমান করলে অন্যায় হবে না যে বেদের সূক্ত রচনা আরম্ভ হয়েছে ৩০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দেরও অনেক আগে থেকে। তার মানে ঋগ্বেদ রচনার আরম্ভ আজ থেকে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে এবং এই বেদ তার বর্তমান রূপ পেয়েছে সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বে। কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের পিতা পরাশরের রচিত সূক্ত দেখে নিশ্চিত বলা যায় যে দেড় হাজার বছর ধরে বেদের সূক্তগুলি রচিত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিক কারণেই মনে আসে। প্রশ্নটি হল, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস বেদ বিভাগের সময়ে কী পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন? তাঁর বেদ বিভাগের আগে নিশ্চয়ই ঋক, সাম, যজুঃ প্রভৃতি নাম ছিল না। বেদ বিভাগ করবার পরেই তিনি এই সব নাম দিয়ে থাকবেন। এর একটা সম্ভাব্য কারণও আছে। বেদ অপৌরুষেয় বা অবিসংবাদিত বলে মনে করা হত। তখন নিশ্চয়ই বেদ বলতে সব বেদগুলিই বোঝাত। অনেকে বলেন, যে সূক্তগুলি পাঠ করা হত তা ঋগ্বেদে সংকলিত হয়, যা গান করা হত তা সামবেদের অন্তর্গত করা হয় এবং যাগ যজ্ঞের মন্ত্রগুলিকে নিয়েই যজুর্বেদ সংকলিত হয়। আবার কেউ বলেন যে তা নয়, বেদব্যাস পদ্যগুলি ঋগ্বেদের, গানগুলি সামবেদের এবং গদ্যাংশ যজুর্বেদের অন্তর্গত করেন।

ব্যাপারটা তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে এই দুই মতের মধ্যে ব্যবধান সামান্যই। ঋষিরা যখন মনের আনন্দ বা আবেগে, ভয়ে বা ভক্তিতে অথবা অন্য যে কোন কারণে ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচনা করেছেন, তার নাম হয়েছে সূক্ত। এই সূক্তগুলি কয়েকটি ঋক্ বা মন্ত্রের সমষ্টি। তারপর যখন আর্য সমাজে যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্মকাণ্ড আরম্ভ হয়, তখন এই সব অনুষ্ঠানের জন্য মন্ত্রের অনুসন্ধান করা হয়। যিনি যজ্ঞের আয়োজন করতেন তিনি যজমান এবং যাঁরা যজ্ঞ করতেন তাঁরা ঋত্বিক। বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন নামের ঋত্বিক নিযুক্ত হতেন। হোতা দেবতাদের প্রশস্তি পাঠ করতেন, গান গাইতেন উদ্গাতা এবং অধ্বর্যু অগ্নিতে আহুতি দিতেন। বেদ বিভাগের সময় হোতার জন্য ঋক্ সংহিতা, উদ্গাতার জন্য সাম সংহিতা এবং অধ্বর্যুর জন্য যজুঃ সংহিতা সংকলিত হল। ঋক্গুলি মিত অর্থাৎ পদবন্ধ এবং যজুঃ অমিত অর্থাৎ যা পদবন্ধ নয় বা গদ্যে রচিত। একই যজ্ঞে বেদের পদ্য গান ও গদ্যে রচিত মন্ত্রের ব্যবহার ছিল বলেই বেদকে তিনটি ভাগ করে ঋক্, সাম ও যজুঃ এই ত্রয়ী রূপ দেওয়া হয়।

এক বেদের সঙ্গে অন্য বেদের সম্পর্ক নেই ভাবলে খুবই ভুল করা হবে। তার কারণ পণ্ডিতরা অনুসন্ধান করে ঋগ্বেদের অনেক সূক্ত সামবেদ ও যজুর্বেদে পেয়েছেন। হিসাব করে দেখা গেছে যে এখন আমরা সামবেদের যে কৌথুম শাখা দেখি তার ১৬০৩ টি সূক্তের মধ্যে ৯৯টি মাত্র ঋক ঋগ্বেদে নেই। অনেকে মনে করেন যে এই ঋকগুলি ঋগ্বেদেরই কোন অপ্রচলিত শাখার অন্তর্গত ছিল। অর্থাৎ সামবেদে নূতন কিছুই নেই।

এই ভাবে মিলিয়ে দেখা গেছে যে যজুর্বেদের বাজসনেয় সংহিতার অর্ধেক মন্ত্রই ঋগ্বেদ থেকে সংগৃহীত।

অথর্ব বেদে পদ্য ও গদ্য দুইই আছে এবং আশ্চর্যের বিষয় যে এতেও ঋগ্বেদের মন্ত্র ঢুকে পড়েছে। এর এক পঞ্চমাংশ মন্ত্রই ঋগ্বেদের। এই সব দেখে শুনে পণ্ডিতরা মনে করেন যে ঋগ্বেদই সবচেয়ে প্রাচীন। অথর্ব বেদেও অনেক প্রাচীন রচনা আছে বলে মনে করা হয়।

আমাদের আসল প্রশ্নটা অন্য রকম। বেদ বিভাগের সময় বেদব্যাস ঋগ্বেদের সূক্তগুলি কী ভাবে সাজিয়েছিলেন? তিনি কি কোন নিয়ম অনুসরণ করেন নি? না করে থাকলে কেন করেন নি?

একটু আগেই বলেছি যে ঋগ্বেদের প্রথম ও দশম মণ্ডল ছাড়া অন্য সব মণ্ডলে এক একটি বংশের ঋষিদের রচনা সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু ব্যতিক্রমও আছে। যেমন প্রথম মণ্ডলের প্রথম দিকে দশম সূক্ত বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দার রচনা এবং একাদশ সূক্তটি মধুচ্ছন্দার পুত্র জেতৃ রচনা করেছেন। অথচ তৃতীয় মণ্ডল বিশ্বামিত্র বংশীয় ঋষিদের রচনায় পূর্ণ। এই ভাবে দেখানো যেতে পারে যে একই বংশের ঋষিদের রচনা বিভিন্ন মণ্ডলে মিলে মিশে আছে। ঋষিদের বংশ পরিচয় আমাদের জানা নেই বলে কিছু সংশয়ের অবকাশ আছে। তবে অসংশয়ে বলা যায় যে এমন দৃষ্টান্ত আছে অনেক। যেমন প্রথম মণ্ডলেই ঘোর পুত্র কণ্ব ও কণ্ব বংশীয় অনেক ঋষির রচনা আছে। আবার অষ্টম মণ্ডলের সমস্ত রচনাই কণ্ব বংশীয় ঋষিদের রচনায় পূর্ণ। এই ভাবে অঙ্গিরা বা বসিষ্ঠ বংশীয় ঋষিদের জন্য নির্দিষ্ট মণ্ডল থাকতেও তাঁদের অনেক রচনা প্রথম মণ্ডলে সংকলিত হয়েছে। এই সব দেখে অসঙ্কোচে বলা যায় যে বেদব্যাস বেদ বিভাগের সময়ে এই ভাবে মণ্ডল বিভাগ করেন নি। তিনি আদৌ মণ্ডল বিভাগ করেছিলেন কিনা সন্দেহ জাগে।

এই আলোচনার প্রয়োজন সামান্যই। এইটুকু জানবার জন্যই চেষ্টা করেছি যে বেদব্যাস ঋগ্বেদের বর্তমান রূপ দিয়েছিলেন কিনা। তা দিয়ে থাকলে সূক্তগুলি প্রাচীনত্ব বিচার করে সাজিয়েছিলেন কিনা। ঋগ্বেদের

প্রথম সূক্তটি বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দার দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে প্রাচীনত্ব বিচার করে সূক্ত গুলি সাজানো হয় নি। তার কারণ মধুচ্ছন্দার পিতা বিশ্বামিত্রের রচনা আছে অনেক পরে তৃতীয় মণ্ডলে। তাঁর প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্র পাওয়া যাবে তৃতীয় মণ্ডলের শেষ সূক্ত অর্থাৎ ৬২ সূক্তের দশম ঋকে। যজুর্বেদেও এই মন্ত্র আছে। খুবই আশ্চর্যের কথা যে এই সূক্তেরই শেষ ঋকে অথাৎ অষ্টাদশ ঋকের মূলে জমদগ্নির নাম আছে।—

জমদগ্নি কর্তৃক স্তুত হয়ে
তোমরা উপবেশন কর যজ্ঞ স্থলে।
যজ্ঞকে বর্ধন কর তোমরাই,
তাই পান কর সোম।

এই ঋক্‌টি পড়ে মনে হয় নাকি যে সূক্তটি জমদগ্নিরই রচনা? জমদগ্নি ছিলেন বিশ্বামিত্রের ভগিনী সত্যবতীর পুত্র। পণ্ডিতরাও বলেন যে শেষ তিনটি ঋক জমদগ্নির রচনা এবং প্রথম পনরটি ঋক্‌ রচনা করেছেন বিশ্বামিত্র। অতএব দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময়েই একটি সূক্ত রচনা করেছেন একাধিক ঋষি।

এই প্রসঙ্গে অথর্ব বেদের কথাও বলা উচিত। বেদব্যাস যখন বেদ বিভাগ করেছিলেন, তখন অথর্ব নামে কোন বেদের অস্তিত্ব জানা ছিল বলে মনে হয় না। থাকলে বেদে বা বৈদিক সাহিত্যে তার উল্লেখ থাকত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯০ সূক্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই প্রসিদ্ধ সূক্তের নাম পুরুষ সূক্ত এবং আপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রচিত বলে মনে করা হয়। সূক্তটির বাঙ্‌লা অনুবাদ এই রকম—

পুরুষের সহস্র মস্তক, চক্ষু ও চরণও সহস্র।
পৃথিবীকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করেও
অতিরিক্ত থাকেন দশ অঙ্গুলির পরিমাণ ॥ ১ ॥
যা হয়েছে বা যা হবে, সবই সেই পুরুষ।
অমরত্ব লাভের অধিকারী তিনি,
কেননা তিনি অতিরোহণ করেন অন্নের দ্বারা ॥ ২ ॥
এ তাঁর মহিমা, কিন্তু তিনি আরও বড়।
বিশ্বের সমস্ত জীব তাঁর এক পাদ।
তাঁর তিন পাদ আকাশের অমর অংশ ॥ ৩ ॥
পুরুষ তাঁর তিন পাদ নিয়ে উঠলেন উপরে,
চতুর্থ অংশ রইল এখানেই।
তিনি ব্যপ্ত হলেন সমস্ত চেতন ও অচেতন বস্তুতে ॥ ৪ ॥

তাঁর থেকে বিরাট জন্মালেন এবং বিরাট থেকে সেই পুরুষ।
জন্মেই তিনি অতিক্রম করলেন পৃথিবীকে
পুরো ভাগে ও পশ্চাদ্ ভাগে ॥ ৫ ॥
পুরুষকে হব্য রূপে গ্রহণ করে
যখন যজ্ঞ আরম্ভ করলেন দেবতারা,
বসন্ত ঘৃত হল, গ্রীষ্ম কাঠ ও শরৎ হব্য ॥ ৬ ॥
যিনি সবার আগে জন্মেছিলেন,
সেই পুরুষকে বর্হিতে পূজা দেওয়া হল যজ্ঞীয় পশু রূপে।
তা দিয়ে যজ্ঞ করলেন দেবতা ঋষি ও সাধ্যরা ॥ ৭ ॥
সেই হোম যুক্ত যজ্ঞ থেকে উৎপন্ন হল দধি ও ঘৃত।
তিনি নির্মাণ করলেন সেই বায়ব্য পশু।
তারা গ্রাম্য ও বন্য ॥ ৮ ॥
সেই হোম যুক্ত যজ্ঞ থেকে উৎপন্ন হল ঋক্ ও সাম ;
আবির্ভূত হল সমস্ত ছন্দ,
তার থেকেই জন্ম গ্রহণ করল যজুঃ ॥ ৯ ॥
জন্ম নিল ঘোটক ও দন্ত যুক্ত পশু।
গাভী ও ছাগও জন্মাল ॥ ১০ ॥
পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হল।
কিন্তু কত খণ্ড করা হয়েছিল ?
তার মুখ, হাত, উরু ও চরণ কী হল ? ॥ ১১ ॥
তাঁর মুখ হল ব্রাহ্মণ, আর রাজন্য হল দুই বাহু।
উরু বৈশ্য হল, আর দুই চরণ থেকে হল শূদ্র ॥ ১২ ॥
মন থেকে চন্দ্র হল, আর চক্ষু থেকে সূর্য।
মুখ থেকে ইন্দ্র ও অগ্নি, বায়ু প্রাণ থেকে ॥ ১৩ ॥
নাভি থেকে আকাশ, আর মস্তক থেকে স্বর্গ।
চরণ থেকে ভূমি ও কর্ণ থেকে দিক ও ভুবন হল নির্মিত ॥ ১৪ ॥
দেবতারা যখন বন্ধন করলেন যজ্ঞের সময়ে
সেই পশুরূপ পুরুষকে,
তখন সাতটি বেদী ও তিন সপ্ত হল যজ্ঞ কাষ্ঠ ॥ ১৫ ॥
দেবতারা যজ্ঞ করলেন যজ্ঞ দিয়ে।
সেই প্রথম ধর্মানুষ্ঠান।
যে স্বর্গে আছেন প্রধান দেবতা ও সাধ্যেরা,
সেই স্বর্গের প্রতিষ্ঠা করলেন মহিমান্বিত দেবতারা ॥ ১৬ ॥

এই পুরুষ সূক্তের নবম ঋক থেকেই জানা যাচ্ছে যে এই সূক্তটি

রচনার সময়েও অথর্ব বেদের কথা সূক্ত রচয়িতা নারায়ণ ঋষির জানা ছিল না। তা জানা থাকলে তিনি ঋক সাম ও যজুর পরে অথর্ব বেদের নাম উল্লেখ করতেন। অথচ এই নারায়ণ ঋষির সময়ে বেদব্যাস সমগ্র বেদ সংগ্রহ করে তিন ভাগ করেছিলেন। পণ্ডিতরা বলেন যে ঋগ্বেদ রচনার কালে বৈদিক সমাজে জাতি বা বর্ণ বিভাগ ছিল না। অনেক পরবর্তীকালে এই বিভাগ হয়েছিল বলে ঋগ্বেদের আর কোনখানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণের উল্লেখ নাই। ভাষাতত্ত্ববিদরাও বলেন যে এই সূক্তের ভাষাও বৈদিক ভাষা নয়, এ ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত ভাষা। পঞ্চদশ ঋকে দেখা যাচ্ছে যে বিশ্ব জগতের নিয়ন্তাকেই যজ্ঞের বলি রূপে অর্পণ করা হচ্ছে। এই ভাবটি ঋগ্বেদ রচনা কালের নয়, এ অনেক পরবর্তী কালের অনুভবের কথা। তখনও সমাজে অথর্ব বেদের নাম প্রচলিত হয় নি। মনে হয় যে এরও পরে যে সব বৈদিক সূক্ত আবিষ্কৃত হয়েছিল অথবা পূর্বে যে সব কোন কারণে বা অকারণে পরিত্যক্ত হয়েছিল, তা সংগ্রহ করে অথর্বাঙ্গিরসের নামে অথর্ব বেদ নামে প্রচারিত হয়। অথর্ব ও অঙ্গিরা দুই প্রাচীন ঋষি, তাঁরা বৈদিক যুগের আদিতে বিদ্যমান ছিলেন। এঁদের রচনা থাকাও অসম্ভব নয়। অথর্ব শব্দটি অচল অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। এই বেদের অথর্ব শব্দের যে ব্যবহার আছে, তার অর্থ করা হয়েছে পরব্রহ্ম ভগবান। কোন পণ্ডিত বলেছেন যে খ্রীষ্টের জন্মের আট হাজার বৎসর পূর্বেও এই বেদ বিদ্যমান ছিল। তবে জ্যোতির্বিদরা এই বেদের ঊনবিংশ কাণ্ডের সপ্তম সূক্তে উল্লিখিত নক্ষত্র সমাবেশ দেখে স্থির করেছেন যে এই বেদের সঙ্কলন কাল হল ১৫১৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ, অর্থাৎ বেদব্যাস ত্রয়ী বেদ বিভাগ করবার পূর্বেই অথর্ব বেদ প্রচলিত হয়েছিল। আমরা রামায়ণে পাই যে অথর্ব বেদের বিধান অনুসারেই পুত্রার্থ যজ্ঞের ব্যবস্থা হয়েছিল। বিষ্ণু পুরাণেও অথর্ব বেদের উল্লেখ আছে।

এই যুক্তি দিয়ে অবশ্য এ কথা প্রমাণ হয় না যে রামায়ণের কালে অথর্ব বেদ প্রচলিত ছিল। তবে এ কথা মানতে হয় যে রামায়ণ রচনার কালে কবি অথর্ব বেদ প্রচলিত আছে দেখেছেন। বিষ্ণু পুরাণ রচনার কালেও অথর্ব বেদ যে প্রচলিত ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অথর্ব বেদ যাঁরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের বলেছেন, তাঁদেরও যুক্তি আছে। বেদ রচনার ঠিক পরেই বেদের ব্রাহ্মণগুলি রচিত হয়েছিল। এই সব ব্রাহ্মণ গ্রন্থে অথর্ব বেদের উল্লেখ নেই। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বেদকে ত্রয়ী বলা হয়েছে এবং ঋক সাম ও যজুর্বেদ এই তিনটি বেদের নামই উল্লিখিত হয়েছে। ॥ ১।২।১।২৬ ॥

ব্রাহ্মণ গ্রন্থের পর এসেছিল আরণ্যক ও উপনিষদ রচনার যুগ এবং এই যুগের প্রথম দিকেই বৃহত্তম উপনিষদ দুখানি—ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক—রচিত হয়েছিল। এই দুটি উপনিষদই ব্রাহ্মণের অংশ ও প্রাচীনতম উপনিষদের অন্যতম বলে স্বীকৃত। তবে অনুমান করা যেতে পারে যে এই উপনিষদ দুটি দীর্ঘ দিন ধরে রচিত হয়েছিল। এই রকম অনুমান করার কারণ হল যে এদের প্রথম দিকে বেদকে ত্রয়ী বলা হলেও শেষের দিকে অথর্ব বেদের উল্লেখ আছে। কথাটা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডে আমরা দেখি যে মৃত্যুর ভয়ে দেবতারা ত্রয়ী বিদ্যায় প্রবেশ করলেন। ১।৪।২। তারপরেই আছে যে তাঁরা ঋক সাম ও যজুর স্বরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। ১।৪।৩ এর পর সপ্তম অধ্যায়ে দেখা যায় যে নারদ সনৎ কুমারকে যে সব বিদ্যা আয়ত্ব করেছেন বলছেন তাতে ঋক সাম ও যজুর সঙ্গে অথর্ব বেদের উল্লেখও আছে। ৭।১।২।

ঠিক এই ভাবেই বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চম ব্রাহ্মণে দেখি যে তিনটি বেদের মধ্যে বাক্যের সঙ্গে ঋগ্বেদের, প্রাণের সঙ্গে সাম বেদের ও মনের সঙ্গে যজুর্বেদের তুলনা করা যায়। ১।৫।৫। এখানে শুধু তিনটি বেদেরই উল্লেখ। কিন্তু পরে চতুর্থ অধ্যায়ে চার বেদেরই উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে যে ব্রহ্ম থেকেই চার বেদ উৎপন্ন হয়েছে। ৪।৫।১১।

এই সব দেখে অনুমান করলে কি আপত্তি হবে যে প্রথমে বৈদিক সমাজে ঋক সাম ও যজুঃ এই তিনখানি বেদই ত্রয়ী নামে প্রচলিত ছিল এবং উপনিষদ রচনার কালেই অথর্ব বেদ সংগৃহীত হয়ে তার স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছিল। এই জন্যই অথর্ব বেদে অনেক পুরাতন ঋকও দেখতে পাওয়া যায় এবং এর মন্ত্রের এক পঞ্চমাংশ ঋগ্বেদ থেকেই নেওয়া হয়েছে। অথর্ব বেদের বিচিত্র বিষয়বস্তুর কথা যথাস্থানে আলোচিত হবে।

ঋগ্বেদের সূক্ত রচয়িতা ঋষিদের নাম সবই লিপিবদ্ধ আছে। সামবেদের গানগুলিও প্রায় সবই ঋগ্বেদ থেকে সংগৃহীত বলে সে সবের নামও পাওয়া যায়। কিন্তু যজুর্বেদ ও অথর্ববেদের মন্ত্র রচয়িতাদের নাম উল্লিখিত হয়নি। যে সব সূক্ত বা মন্ত্র ঋগ্বেদ থেকে নেওয়া হয়েছে, তার রচয়িতাদের নাম উল্লিখিত না হলেও খুঁজে বার করা যেতে পারে।

এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে দেবাসুরের যুদ্ধ অবসানের পর অর্থাৎ মহারাজা যযাতির আমল থেকে দেশে শান্তি স্থাপিত হয়েছে

এবং এর পর থেকেই বৈদিক সাহিত্য রচনা আরম্ভ হয়েছে। যযাতির কাল আরম্ভ ৩৭২১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে এবং ৩৪৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ মান্ধাতার আমল। ১৪১৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছে। বেদ বিভাগ এর কিছু আগের ঘটনা। ১৪০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ বা তার অব্যবহিত পরেই অথর্ব বেদের আবির্ভাব বা উদ্ধার। বেদব্যাসের তিরোধানের কিছু আগে বা পরে এই বেদ সংগৃহীত হয়েছিল। কাজেই বলা যেতে পারে যে এই দেশেরই বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী ঋষিরা দেড় হাজার বছরের বেশি সময় ধরে বেদের সূক্তগুলি রচনা করেছিলেন। সেগুলি সংগৃহীত হয়ে ত্রয়ী নামের তিনখানি সংহিতা সংকলিত হয়েছিল আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে। তার পরে যুক্ত হয়েছিল চতুর্থ বেদ অথর্ব। এই দীর্ঘ সময় ধরে রচিত বলেই বেদের ভাষায় এমন বৈচিত্র্য। সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তনও লক্ষ্য করবার বিষয়।

৩. বেদের দেবতা কারা?

ঋগ্বেদের প্রত্যেকটি সূক্তের প্রারম্ভে দেবতার নাম আছে। এই সব দেবতাদের নাম তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগ আমাদের অতি পরিচিত. যেমন অগ্নি বায়ু ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি। এঁদের সঙ্গেই আরও কিছু নাম আছে যা আমাদের কাছে পরিচিত হয়ে গেছে, যেমন পূষা মিত্রাবরুণ ব্রহ্মণস্পাতি বা মরুৎগণ। দ্বিতীয় ভাগে আছে এমন কিছু নাম যা আমরা দেবতার নাম মনে করি না, যেমন অশ্ব জল তৃণ। তৃতীয় ভাগে আপ্রী অপাং নপাৎ দ্রবিণোদা প্রভৃতি নামও উল্লেখ করা যেতে পারে। এই শব্দগুলি আমাদের একেবারেই পরিচিত নয়।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে একশো একানব্বুইটি সূক্ত আছে। চব্বিশ জন ঋষি এই সূক্তগুলি রচনা করেছেন। চার জন ঋষিই প্রধান। তাঁরা হলেন অগস্ত্য দীর্ঘতমা গোতম ও কুৎস। অগস্ত্য সাতাশটি, দীর্ঘতমা পঁচিশটি এবং গোতম ও কুৎস কুড়িটি করে সূক্ত রচনা করেছেন। প্রথম মণ্ডলে যে দেবতাদের স্তব পাওয়া যায় তাঁরা হলেন অগ্নি বায়ু অশ্বিদ্বয় ইন্দ্র ঋভু বরুণ ব্রহ্মণস্পতি মরুৎগণ সবিতা পূষা রুদ্র উষা সূর্য বিশ্বদেব বহু-দেবতা সোম সকল-দেবতা দাস-দেবতা মিত্রাবরুণ আপ্রী দ্যাবাপৃথিবী অশ্ব কাল পিতৃ বৃহস্পতি জল ও তৃণ। দেবতাদের নামের এই তালিকা দেখেই বোঝা যাবে যে সূক্তর দেবতা মানে কবিতার বিষয় বস্তু, অর্থাৎ সূক্তে যার প্রশস্তি আছে তাকেই দেবতা বলা হয়েছে। দেবতা মানে বর্তমানে প্রচলিত অর্থে দেবতা নয়। দেবতার আলোচনায় আমাদের এই কথা মনে রাখতে হবে।

আর একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না। দেবতা নামে একটি জাতি অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ করে শেষ পর্যন্ত নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পণ্ডিতরা বলেন যে দেবতা ও অসুরেরা ছিলেন প্রাচীন আর্য জাতিরই দুটি শাখা। এঁরা কোথায় ছিলেন এবং কী ভাবে ভারতে এলেন তা নিয়ে নানা মত আছে। দেবতাদের কথায় আসবার আগে আর্য জাতির সম্বন্ধেই কিছু বলা দরকার।

আর্য শব্দটি এসেছে কৃষিকর্ম থেকে, অর্থাৎ সোজা কথায় আর্য মানে কৃষক বা চাষী। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সেকালে নিজেদের যাঁরা আর্য বলতেন, তাঁরা এই শব্দটি ব্যবহার করে গৌরব বোধ করতেন। এর কারণ নির্ণয় করা কঠিন নয়। সভ্যতার ক্রম বিবর্তনের যুগে কৃষি কর্মের আবিষ্কার সমাজে একটা বিপ্লব এনেছিল। বনের ফল

মূল আর পশুর মাংস খেয়ে জীবন ধারণে যারা অভ্যস্ত, তারা চাষ করে ফসল উৎপাদন করতে শিখে যে নিজেদের আর্য বলে গৌরব বোধ করবে, তাতে আর সন্দেহ কী! এই গৌরব মণ্ডিত শব্দটি বেদের ঋষিরাও ত্যাগ করতে পারেন নি। যে জাতি সর্বপ্রথম চাষ করতে শিখে সভ্য জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়েছিল, তারাই তো এই বিরাট বিশ্বে সবারই বরণীয়! শুধু তাই নয়, যারা আর্য নয় তারা অসভ্য অনার্য দাস বা দস্যু—এই হল তাদের সংজ্ঞা।

এই আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল, এই নিয়েও নানা মত আছে। কেউ বলেন তাদের বাস ছিল মধ্য এশিয়ায়, কেউ বলেন এশিয়া মাইনরে। এ দেশের পণ্ডিত তাদের ভারতবাসী বলেও দাবী করেছেন, আবার কেউ উত্তর মেরু অঞ্চলের মানুষও বলেছেন। সাধারণ ভাবে মেনে নেওয়া হয় যে এই আর্যরা বাইরে থেকে ভারতে এসেছিলেন এবং এখানকার সভ্যতা গড়ে ওঠার পরে বহির্বিশ্বে তা নিয়ে যান।

কিন্তু তখন তো এই দেশের নাম ভারত ছিল না। তখন একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তাদের বাস ছিল বলে অনুমান করা যায়। বর্তমানে যা উত্তর ভারত বলে পরিচিত, তারই সংলগ্ন আফগানিস্তান, কান্দাহার, পামীর প্রভৃতি অঞ্চল আর্যদের আদি নিবাস ছিল বলে মনে করা যায়। পামীর অঞ্চলেই ছিল মেরু পর্বত এবং এই মেরু পর্বত সুমেরু নয়। কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত আর্যরা যে সুসংহত ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল, বহু পরবর্তী কালে রচিত পুরাণে তার প্রমান আছে।

সিন্ধুনদের উপত্যকায় আর একটি উন্নত সভ্যতার কথা আমরা জানি এবং সাধারণ ভাবে বিশ্বাস করি যে আর্যদের আগমনের পরে তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে এই সভ্যতা বিলুপ্ত হয়। বেদে এই অঞ্চলের প্রাচীন মানুষকেই যে দাস বা দস্যু বলা হয়েছে, এ অনেক পণ্ডিতেরই মত।

এ সবই অনুমানের কথা বলে মনে হয়। এর কারণ আছে। সিন্ধু সভ্যতার যে সব নিদর্শন আমরা মাটির নিচে থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছি, তা আর্যদের কৃষি কাজের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত। তারা যে নগর ও বন্দর নির্মাণ করেছিল এ কালের মতো আধুনিক পদ্ধতিতে তা অনুমানের কথা নয়, তা মহেঞ্জোদারো থেকে হরাপ্পা ও দক্ষিণে লোথাল পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় আজও বিদ্যমান। তাই সিন্ধু উপত্যকার এই সভ্য জাতি কৃষি জানত না, বনের ফলমূল খেয়ে ও ব্যাধের বৃত্তি নিয়ে ইঁট পাথরে তৈরি বাড়িতে বাস করে সমুদ্র পথে বাণিজ্যে যেত, তা ভাবতেও কষ্ট হয়। আর এই সভ্যতা দেখতে পেলে আর্যরা কৃষি বিদ্যা জানে বলে গৌরব বোধ করতেও লজ্জা পেত। তারা দৈহিক শক্তিতে যত উন্নতই হোক,

সিন্ধু উপত্যকার সভ্য মানুষকে সহজে উৎখাত করতে পারত না। কাজেই আমাদের অন্য কিছু ভাবাই সঙ্গত হবে বলে মনে করি।

আমরা জানি এবং প্রায় সকল দেশের মানুষই বিশ্বাস করি যে প্রাচীন কালে কোন এক সময়ে বিশ্বগ্রাসী জলপ্লাবনে পৃথিবী ডুবে গিয়েছিল। বাইবেলে নোয়ার আর্কের গল্প আছে, পুরাণে আছে মৎস্য অবতারের গল্প। এই গল্পটি নানা ভাবে নানা দেশেই প্রচলিত আছে বলে শুনেছি। কিছু মানুষ নৌকোয় চেপে সেই প্লাবনের সময়ে রক্ষা পেয়েছিল। যারা সমতল ভূমিতে বাস করত তারা আশ্রয় নিয়েছিল পাহাড়ে পর্বতে ও নিরাপদ জায়গায়। মানুষের পরিচিত পৃথিবী দীর্ঘ দিন ধরে মানুষ বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। পুরাণে এই সময়ের পরিমাণ মাপা আছে কণ্ডু নামের এক মুনির কাহিনীতে। এই অন্ধকার যুগ ছিল প্রায় এক হাজার বছর। এই সময়ের কোন ইতিহাস নেই।

তার পর আবার সব ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। পুরাণে প্রচেতাদের পুত্র দক্ষ প্রজাপতি নূতন সৃষ্টির সূচনা করেন ত্রেতা যুগের সূচনায়। হিসাব করে দেখা গেছে যে সেই মহাপ্লাবন এসেছিল ৪৮৭০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের পরে এবং দক্ষ প্রজাপতির কাল ৩৮৯০ থেকে। পুরাণের দেবতা ও অসুর জাতি তাঁরই দৌহিত্র এবং তারা প্রায় শতবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত ছিল। এই যুদ্ধ কুরুক্ষেত্রের মতো যুদ্ধ নয়, এ কতকটা পরিবারিক বা সামাজিক সংঘর্ষের মতো বেদনাদায়ক।

এইবারে ভেবে দেখুন, মহাপ্লাবনে সিন্ধু সভ্যতা ডুবে গিয়েছিল বলে কি আমরা মনে করতে পারি না? বিশ্বগ্রাসী বন্যার জলে কোন শহর বা গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া কি একেবারেই অসম্ভব? মাটির নিচে তার নিদর্শন তো এখনও বর্তমান! তবে আমরা কেন বলতে পারব না যে খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় হাজার পাঁচেক বছর আগে এক ভয়াবহ বন্যায় সিন্ধু উপত্যকার উন্নত সভ্যতা জলমগ্ন হয়ে গিয়েছিল। যারা কোন রকমে আত্মরক্ষা করেছিল উচ্চভূমিতে আশ্রয় নিয়ে, সেই নিঃস্ব সর্বহারা আদিবাসী মানুষেরাই পরবর্তী কালে দাস বা দস্যু নামে অভিহিত হয়েছিল। পামীর অঞ্চলের উচ্চভূমি থেকে যারা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল জলাভাবের জন্য বা অন্য কোন কারণে, তারা তাদের কৃষি বিদ্যা নিয়ে এসেছিল সিন্ধু নদীর উর্বর উপত্যকায়। সপ্ত সিন্ধবে পুনরায় বসতি স্থাপন করে তারাই নিজেদের আর্য ও প্রাচীন অধিবাসীদের অনার্য নাম দিয়েছিল। নিজেদের উন্নত সভ্যতা হারিয়ে প্রাক্-আর্য বা অনার্যরাই দাস হয়েছিল আর্যদের, এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনে হয়তো দস্যুবৃত্তিও করেছিল। তাই তারা আর্যদের রচনায় নিন্দিত হয়েছে।

অমি আগেই বলেছি যে দেবতা ও অসুররা যখন যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন তখন আর্যদের সমাজে শান্তির অভাব নিশ্চয়ই ছিল। শান্তির পরিবেশ না থাকলে সাহিত্য রচনা সম্ভব হয় না। তাই এই সময়ে বেদ রচনা আরম্ভ হয় নি। বেদ রচনা যখন আরম্ভ হয়েছে তখন আর্যরা দেবতা ও অসুরদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল অর্থাৎ দেবতা ও অসুরদের বিরোধ যেখানে নিত্য হত সেখান থেকে তারা বেরিয়ে পড়েছিল। এর আগে আর্যদের দলেও একটা বিরোধ ছিল এবং সেটা বোধহয় সামান্য কারণেই। কিন্তু পরস্পরকে তারা ঘৃণা করতে আরম্ভ করে। এক সময়ে এই বিরোধের জন্য তারা আলাদা হয়ে যায়—এক দল ইরাণীয় আর্য ও অন্য দল ভারতীয় আর্য নামে অভিহিত হয়। বিবাদটা শুরু হয় যজ্ঞ নিয়েই। ভারতীয় আর্যরা পশুবলি দিয়ে যজ্ঞে আহুতি দিতে চাইতেন এবং যজ্ঞের সময়ে সোম নামে এক রকম উদ্ভিদের রস মাদক রূপে পান করতে ভালবাসতেন। ইরাণীয় আর্যরা এই প্রথার বিরোধী ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তাঁরা অগ্নিকে পবিত্র ভাবতেন এবং পশুর মাংস আহুতি দিয়ে তা অপবিত্র করতে চাইতেন না। সোম লতার রস তাঁরা পান করতেন না এমন নয়, স্বাস্থ্যবর্ধক পানীয় হিসাবে তাঁরা বোধহয় তাজা রস পান করার পক্ষপাতী ছিলেন। এই নিয়েই বিবাদ শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা দুদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরকে নিন্দা করতে আরম্ভ করেন।

বেদেও এই বিবাদের প্রভাব বিস্তৃত হয়। দুটি শব্দ নিয়ে আলোচনা করলেই এ কথা স্পষ্ট হবে। দেব শব্দে দীপ্যমান বা দ্যোতমান বোঝায়। দেবতা বলতে বোঝাত বিশ্বে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তিকে। অসুর শব্দেও এক সময় প্রাণবান বা বলবান বোঝাত। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৫৪ সূক্তে অসুর শব্দের ব্যবহার আছে—

> যিনি শত্রু বিজয়ী ও নিজ বলে দৃঢ় মনা.
> স্তুতি কর সেই মহৎ ও দীপ্তিমান ইন্দ্রের।
> কেননা তিনি যশস্বী অসুর ও দূর করেন শত্রু,
> অশ্ব সেবিত ও অভীষ্টবর্ষী বেগবান তিনি ॥ ১।৫৪।৩ ॥

প্রথম মণ্ডলের ২৪ সূক্তেও অসুর শব্দ নিন্দাবাচক ছিল না। বরুণের স্তব করবার সময় অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ বলছেন—

> হে বরুণ, নমস্কার করি তোমার ক্রোধ অপনয়নের জন্য,
> এরই জন্য করি যজ্ঞে হব্য দান।
> হে অসুর, হে প্রচেতা, হে রাজন,
> শিথিল কর আমাদের কৃত পাপ ॥ ১।২৪।১৪ ॥

অসুর শব্দের অর্থ এখানে অনিষ্ট ক্ষেপনশীল। বরুণকে অসুর বলে সম্মান করা হয়েছে। এটাই স্বাভাবিক। তার কারণ প্রাচীন আর্যরা তাঁদের উপাস্য দেবতাকে দেব অথবা অসুর এই নামেই ভাবতেন। কিন্তু এদের মধ্যে দুটি দল হবার পরে ভারতীয় আর্যরা দেব শব্দটি এবং ইরাণীয়রা অসুর শব্দটি উপাস্য দেবতা হিসাবে গ্রহণ করলেন। তারপর কালক্রমে ইরাণীয়রা দেবকে নিন্দাবাচক শব্দে পরিণত করলেন। দেব বা দয়েব পাপমতি বা evil spirit-এ পরিণত হল। ভারতীয় আর্যরাও ইরাণীয়দের উপাস্য দেবতা অসুরকে পরমেশ্বরের পদ থেকে নামিয়ে দেব বিরোধী বলে নিন্দা করতে লাগলেন। ঋগ্বেদেরই দশম মণ্ডলের ১৫৭ সূক্তে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। ভুবন ঋষি বলছেন—

দেবতারা যখন ফিরলেন অসুরদের বধ করে,
তখনই রক্ষা হল তাঁদের অমরত্বের পদ ॥ ১০।১৫৭।৪ ॥

এই সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলে মনে করা হয়। অসুর শব্দটি এই অর্থেই পুরাণে ব্যবহৃত হয়েছে।

স্মরণ করে দেখা যেতে পারে যে দেবতা ও অসুরদের যে যুদ্ধ হয়েছিল দীর্ঘ দিন ধরে, তাতে অসুর বলে কোন জাতি ছিল না। যারা দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, তারাই অসুর নামে অভিহিত হয়। পুরাণে আমরা দেখি যে কশ্যপ নামে এক ঋষি দক্ষের অনেকগুলি কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রথমা পত্নী অদিতির গর্ভে যাঁদের জন্ম হয়, তাঁরা আদিত্য নামে পরিচিত। এঁদের মধ্যে আছেন ইন্দ্র বিবস্বান প্রভৃতি নামের বারোটি পুত্র। দিতি কশ্যপের দ্বিতীয়া পত্নী, তাঁর পুত্ররা দৈত্য নামে অভিহিত। হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু দৈত্য। তৃতীয়া পত্নী দনুর পুত্ররা দানব নামে পরিচিত। যে কোন কারণেই হোক, দৈত্য ও দানবরা একত্রিত হয়ে দেবতাদের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হত। এর কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। ইন্দ্র স্বর্গ রাজ্য অধিকার করে রাজা হয়ে বসেছিলেন, বঞ্চিত হয়েছিলেন দৈত্য ও দানবরা। বিবাদ এই স্বর্গ রাজ্যের অধিকার নিয়েই, পরবর্তী কালে দৈত্য ও দানবরাই অসুর আখ্যা লাভ করে বেদেও নিন্দিত হয়েছিলেন।

আর একটি কথার উল্লেখ না করলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সে কথাটি হল মানুষের ব্যক্তি পূজার প্রবণতা। যাদের আমরা ভয় পাই, ভক্তি করি বা ভালবাসি, তাদের ওপরে আমরা দেবত্ব আরোপের চেষ্টা করি এবং কিছু দিন গত হবার পরে দেখি যে তারা পুরোপুরি ভাবে দেবতা হয়ে গেছেন বা স্থান পেয়েছেন আকাশের

জ্যোতিষ্ক মণ্ডলে। দু একটি উদাহরণ দিলেই আমার কথাটা স্পষ্ট হবে। প্রথমে ইন্দ্রের কথাই ধরা যাক। শক্র কশ্যপ ও অদিতির এক পুত্র, তিনি স্বর্গ রাজ্য অর্থাৎ ইলাবৃতবর্ষ অধিকার করেছিলেন। সেখানকার রাজাকে বলা হত ইন্দ্র। এই ইন্দ্ররা দীর্ঘ কাল ধরে রাজত্ব করেছেন। তিনি ছিলেন আদিত্য জাতির মানুষ, আদিত্যদেরই রাজা। কিন্তু তাঁর উপরে আমরা দেবত্ব আরোপ করেছি।

কশ্যপ ও অদিতির আর এক পুত্রের নাম বিবস্বান। তিনি অন্তরীক্ষ প্রদেশের অর্থাৎ হিমালয় অঞ্চলের রাজা হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র কন্যার নাম মনু যম শনি যমী প্রভৃতি। তাঁর শৌর্য বীর্য ইত্যাদি দেখে আমরা তাঁকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করি এবং পরবর্তী কালে বিবস্বানই জ্যোতিষ্ক মণ্ডলে স্থান পেয়েছেন সূর্যরূপে। বিবস্বানের রথে সাতটি ঘোড়া যুক্ত হত বলে আকাশের সূর্য এখন সপ্তাশ্ববাহিত রথে ভ্রমণ করেন। বিবস্বান ও সূর্য এখন অভিন্ন।

কিন্তু মানুষের এই দিবি আরোহণ এক দিনে বা অল্প সময়ে হয় না। সময় লাগে দীর্ঘ দিন। অনেক সময়ে কয়েক শতাব্দী। মানুষ ইন্দ্র বা বিবস্বানের দেবতা হতে কত দিন সময় লেগেছিল তা জানা সম্ভব নয়। এর সাক্ষী এক মাত্র ঋগ্বেদ। কিন্তু ঋগ্বেদের সূক্তগুলি এক সময়ের রচনা নয় বলে কিছু অনুমান করা সম্ভব নয়। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে হয়তো আমরা দেখব যে প্রথম দিকে রচিত সূক্তগুলিতে প্রাকৃতিক বর্ণনাই আছে, আছে উপমা ও রূপক। উষাকে অনুসরণ করছেন সূর্য, মেঘ ভেদ করে জলধারা নামছে, কিংবা জলভরা মেঘে বিচিত্র রঙের সমাবেশ। তারপর যত দিন যেতে লাগল, আমরা ভুলে যেতে লাগলাম মানুষ ইন্দ্র বা বৃত্রের কথা, বিবস্বান বা উর্বশীর কথা। এই সব মানুষেরাই বেদের উপমা ও রূপকে স্থান পেয়ে গেলেন। এক দিন তাঁরা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হয়ে গেলেন সবারই অজ্ঞাতসারে। দেবতা জাতির মানুষ আর উপাস্য দেবতায় কোন তফাৎ রইল না। আদিত্যদের সঙ্গে রাজ্যের অধিকার নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন যে দৈত্য ও দানবরা তারা অসুরে পরিণত হলেন, আর দেবতা হয়ে গেলেন আদিত্যরা। অসুর শব্দটি আর তার পুরনো অর্থে ব্যবহৃত হয় না, অসুর বলতে আমরা এখন দেবতা বিরোধী এক শক্তিশালী জাতি বুঝি।

দশম মণ্ডলের ১৫৭ সূক্তে ভুবন ঋষি তাই ত্রিষ্টুপ ছন্দে প্রার্থনা করেছেন—

এই ভুবন থেকেই যেন আমরা করতে পারি সুখের উপায়।
তাই করে দিন ইন্দ্র ও সমস্ত দেবতারা।
ইন্দ্র ও আদিত্যরা মিলিত হয়ে করুন নিরুপদ্রব
আমাদের যজ্ঞ দেহ ও সন্তানদের।
ইন্দ্র হোন আমাদের দেহের রক্ষক
আদিত্য ও মরুৎদের সহকারী নিয়ে।
দেবতারা যখন ফিরলেন অসুরদের বধ করে,
তখনই রক্ষা হল তাঁদের অমরত্বের পদ।
নানা কার্য করে স্তবকে পাঠানো হল দেবতাদের নিকটে।
তারপর দেখা গেল আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত হতে ॥

পরবর্তী সূক্তে চক্ষু ঋষির গায়ত্রী ছন্দে সূর্যের স্তবও উল্লেখ করার মতো। ঋষি বলছেন—

স্বর্গের উপদ্রব থেকে আমাদের রক্ষা করুন সূর্য,
বায়ু আকাশের ও অগ্নি পৃথিবীর উপদ্রব থেকে।
হে সবিতা, পূজা গ্রহণ কর আমাদের।
তোমার যে তেজ, তার উদ্দেশে যজ্ঞ করা উচিত এক শত।
শত্রুদের যে সব উজ্জ্বল অস্ত্র এসে পড়ছে,
তা থেকে তুমি রক্ষা কর আমাদের।
হে সবিতা, তুমি আমাদের দান কর চক্ষু,
চক্ষু দান কর পর্বতের দেবতা ও বিধাতা।
চক্ষুকে দৃষ্টি শক্তি দাও,
সব কিছুই আমরা যেন দেখতে পাই ভাল ভাবে।
শরীরকে এমন চক্ষু দাও
যাতে সব কিছু দেখতে পাই একত্রে ও বিশেষ ভাবে।
হে সূর্য, তোমাকে যেন আমরা দেখতে পারি ভাল ভাবে,
আর মানুষ যা দেখতে পায়, তাও যেন দেখি আমরা ॥

ঋগ্বেদ পাঠের সময় এই কথাটি মনে রাখতে হবে যে দেবতারা দেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন নি, সাধারণ মানুষকেই দেবতায় পরিণত করা হয়েছে। দেবতা জাতির মানুষ তো উপাস্য দেবতা আগেই হয়েছেন, পরবর্তী কালের মানুষও দেবতা হয়েছেন একে একে বেদের কাল পেরিয়ে পুরাণ রচনার যুগে এসে। সে অন্য কাহিনী, বেদের কথায় সে আলোচনার প্রয়োজন নেই।

বেদের অনার্য কারা ?

দীর্ঘদিন ধরে ঋগ্বেদের সূক্তিগুলি যাঁরা রচনা করেছিলেন, তাঁদের একটা সমাজ ছিল। তাঁরা মধ্য এশিয়ার কোন পর্বতময় প্রদেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন বলেই আমরা বিশ্বাস করি। বেদের কোনখানে তাঁদের আদি বাসভূমির বর্ণনা পাওয়া যায় না বলে বিস্মিত হতে হয়। বর্ণনা কেন, সেই আদি বাসস্থানের সম্বন্ধে কোন উল্লেখই পাওয়া যায় না। এর থেকে এই কথাই অনুমান করা যায় যে বেদ রচনা যখন আরম্ভ হয়, ঋষিরা তখন সেই পুরাতন আবাসের কথা ভুলে গেছেন। নিজের চোখে তো নিশ্চয়ই দেখেন নি, পূর্ব পুরুষের কাছে শোনা কথাও তাঁরা মনে রাখতে পারেন নি। তাঁরা তখন ভারতের পশ্চিম সীমান্তে বসবাস করে ভারতের নদনদীর বর্ণনাই করেছেন তাঁদের রচনায়।

দশম মণ্ডলের ৭৫ সূক্তে সিন্ধুক্ষিৎ ঋষি জগতী ছন্দে নদী দেবতার স্তব করছেন—

হে জলগণ, যজমানের গৃহে ব্যাখ্যা করছেন কবি
তোমাদের সর্ব শ্রেষ্ঠ মহিমা।
তারা তিন শ্রেণীতে চলল সাত সাত করে,
সিন্ধু নদীর তেজই শ্রেষ্ঠ সকল নদীর উপরে ॥ ১ ॥
হে সিন্ধু নদী, তুমি যখন ধাবিত হলে
শস্যশালী প্রদেশ লক্ষ্য করে,
তখন বরুণ কেটে দিলেন তোমার চলার পথ।
তুমি চল ভূমির উপর উন্নত পথে,
বিরাজ কর সমস্ত গমনশীল নদীর উপরে ॥ ২ ॥
পৃথিবী থেকে সিন্ধুর শব্দ উঠে
আচ্ছাদন করছে আকাশ পর্যন্ত।
ইনি চলেছেন মহাবেগে উজ্জ্বল মূর্তিতে।
শব্দ প্রবল হলে মনে হয়
যেন ঘোর রবে বৃষ্টি পড়ছে মেঘ থেকে ॥ ৩ ॥
সিন্ধু আসছেন বৃষের মতো গর্জন করে।
গাভী জননী যেমন দুগ্ধ নিয়ে যায় বৎসের নিকটে,
তেমনি অন্য সব নদী জল নিয়ে আসছে
তোমার চতুর্দিকে শব্দ করতে করতে।

রাজা যেমন সৈন্য নিয়ে যায় যুদ্ধ করবার জন্য,
তেমনি তুমি চলেছ আগে আগে
তোমার সহগামিনী দুটি নদী শ্রেণীকে নিয়ে ॥ ৪ ॥
হে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী শতদ্রু ও পরুষ্ণী,
তোমরা ভাগ করে নাও আমার এই স্তবগুলি।
হে অসিক্নি-সঙ্গত মরুদবৃধা নদী,
হে বিতস্তা ও সুষোমা-সঙ্গত আর্জীকীয়া নদী,
শোন তোমরা ॥ ৫ ॥
হে সিন্ধু, তুমি মিলিত হয়ে চললে প্রথমে তৃষ্টামার সঙ্গে,
পরে মিললে সুসর্তু রসা ও শ্বেতীর সাথে।
তুমি মিলিত করলে ক্রমু ও গোমতীকে, কুভা ও মেহৎনুর সাথে।
এই সব নদীর সঙ্গে তুমি যাও একত্রে এক রথে ॥ ৬ ॥
এই দুর্ধর্ষ সিন্ধু যাচ্ছেন সরল ভাবে,
বর্ণ তাঁর শুভ্র ও উজ্জ্বল, অতি মহৎ তিনি,
জল তাঁর চতুর্দিক পরিপূর্ণ করছে মহাবেগে।
এঁর তুল্য গতিশালী নেই কেউ,
ঘোটকীর মতো অদ্ভুত, আর সৌষ্ঠব স্থূলকায় রমণীর মতো ॥৭॥
সিন্ধু সুন্দরী ও চিরযৌবনা।
এঁর আছে উৎকৃষ্ট ঘোটক ও রথ, আছে বস্ত্র ও অলঙ্কার,
ইনি সজ্জিত হয়েছেন উত্তম রূপে।
এঁর তীরে সীলমা খড় আছে, অন্ন ও পশুলোম আছে বিস্তর।
ইনি আচ্ছাদিত মধু প্রসবকারী পুষ্পে ॥ ৮ ॥
যোজনা করেছিলেন সিন্ধু ঘোটকযুক্ত সুখকর রথ।
এই যজ্ঞে অন্ন এনে দিয়েছেন তার দ্বারা।
অতি মহৎ বলে সবাই স্তব করে এঁর মহিমা।
ইনি দুর্ধর্ষ মহৎ ও যশস্বী আপনার যশে ॥ ১০।৭৫।৯ ॥

এই সূক্তটি সিন্ধু নদীর উদ্দেশ্যে রচিত। পঞ্চম ঋকে এর পূর্ব দিকের অর্থাৎ পাঞ্জাবের নদীগুলির নাম পাওয়া যায়। পরুষ্ণী ইরাবতীর নাম এবং আর্জীকীয়া বিপাশা নদী। চন্দ্রভাগার নাম অসিক্নি এবং সুষোমা সিন্ধু নদীরই অপর নাম। ষষ্ঠ ঋকে পশ্চিম দিকের অর্থাৎ কাবুল প্রদেশের নদীগুলির নাম পাওয়া যাচ্ছে। গোমতী নদীর বর্তমান নাম গোমল। ঋগ্বেদের নানা স্থানে সপ্ত নদীর উল্লেখ আছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে সিন্ধু ও তাঁর পাঁচটি শাখা ইরাবতী চন্দ্রভাগা শতদ্রু বিপাশা ও বিতস্তার সঙ্গে সরস্বতীকে নিয়ে এই সপ্ত নদী।

জাহ্নবী বা গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়েছে অনেক পরবর্তীকালে।

তাঁরা যে পঞ্চক্ষিতি পঞ্চজন বা পঞ্চকৃষ্টির উল্লেখ করেছেন, তা এই পঞ্চনদের সঙ্গেই যুক্ত। পঞ্চনদ বিধৌত ভূমিই পঞ্চক্ষিতি অর্থাৎ পাঞ্জাব প্রদেশ, এই পাঁচটি নদীর তীরবাসী মানুষ পঞ্চজন এবং পঞ্চকৃষ্টি পাঁচটি কৃষিপ্রধান জনপদ বা জাতি। ঠিক এই ভাবেই সপ্ত মানুষ বলতে সপ্ত নদীর তীরবাসী মানুষই বোঝায়। গান্ধার দেশের উল্লেখ আছে প্রথম মণ্ডলের ১২৬ সূক্তের সপ্তম ঋকে। গান্ধার নাম ছিল বর্তমান পেশাওয়ার প্রদেশের।

আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে যে ঋগ্বেদের কোনখানে সিন্ধু সভ্যতার কোন নিদর্শনের উল্লেখ নেই। যে সিন্ধুর তীরে এসে তাঁরা বসবাস আরম্ভ করেন, সপ্ত সিন্ধুর নামে স্তব-স্তোত্র রচনা করেন, সেই সিন্ধু তীরবর্তী জনপদ বা জনপদবাসীর সম্বন্ধে কোন কথা ঋগ্বেদ থেকে জানা যায় না। এর একটিই অর্থ। তা হল যে ঋষিরা সেই সভ্যতার কোন নিদর্শন দেখতে পাননি, শোনেন নি কোন কথা, এমন কি অনুমান বা কল্পনা করার মতো কোন উপাদানও খুঁজে পান নি। যে মানুষদের তাঁরা এই অঞ্চলে দেখেছেন, তাঁরা আর্য নয় বলেই অনার্য নামে অভিহিত হয়েছে। ঋগ্বেদে তাদের পরিচয় দাস বা দস্যু নামে।

প্রথম মণ্ডলের ৫১ সূক্তে অঙ্গিরার পুত্র সবা ঋষি ত্রিষ্টুপ ছন্দে বলছেন—

হে ইন্দ্র, কারা আর্য ও দস্যু কারা, অবগত হও তা।
শাসন করে বশীভূত কর যজ্ঞের বিরোধীদের ॥ ১।৫১।৮ ॥

এই ঋকে আর্য ও দস্যু উভয় শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। আর্যরা দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করত, ভারতবর্ষের আদিম জাতি তা করত না। আর্য ঋষিরা তাদেরই যজ্ঞ-বিরোধী দস্যু বলে অভিহিত করেছেন।

এই মণ্ডলেরই ১০০ সূক্তে বৃষাগিরের পুত্ররা ত্রিষ্টুপ ছন্দে ইন্দ্র দেবতার উদ্দেশে বলছেন—

তিনি আহত হয়েছিলেন অনেকের দ্বারা,
যুক্ত হয়েছিলেন গমনশীল মরুৎগণের সঙ্গে,
তারপর হননকারী বজ্রে বধ করলেন প্রহার করে
পৃথিবী-নিবাসী দস্যু ও শিমুদের,
ক্ষেত্র ভাগ করে নিলেন শ্বেত বর্ণ মিত্রদের সাথে।
প্রাপ্ত হলেন সমুদয় শোভনীয় বজ্রী ইন্দ্র সূর্য ও জল ॥

সায়ন বলেছেন যে দস্যুর অর্থ শত্রু, শিমুর অর্থ রাক্ষস এবং

শ্বেতবর্ণ মিত্ররা হলেন অলঙ্কারে দীপ্তাঙ্গ মরুৎগণ। কিন্তু এই ব্যাখ্যা ঠিক মনে হয় না। আদিম জাতিকেই দস্যু বলা হয়েছে এবং শ্বেত বর্ণ মিত্র বলতে আর্য জাতি বুঝিয়েছেন। শিমুও কোন অনার্য জাতি। এই ঋকের সরল অর্থ হল শ্বেতবর্ণ আর্য জাতির সঙ্গে অনার্য দস্যু ও শিমুদের যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে মরুৎগণের সহায়তায় ইন্দ্র বজ্রপ্রহারে তাদের পরাস্ত করে তাদের ক্ষেত্র কেড়ে নিয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিলেন। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে বিষ্ণুপুরাণের মতে পৃথু রাজার রাজ্যকেই পরে পৃথিবী বলা হত।

এই প্রসঙ্গে দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান ঋষির একটি ঋকের উল্লেখ করা যেতে পারে—

হে অশ্বিদ্বয়, আর্যদের জন্য তোমরা
চাষ করেছিলে লাঙ্গল দিয়ে,
অন্নের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলে যব বপনের পর,
বিস্তীর্ণ জ্যোতি প্রকাশ করেছ বজ্রে দস্যু বধ করে ॥১।১১৭।২১॥

দস্যু অর্থাৎ ভারতের আদিম অধিবাসীদের বিনাশ করে এবং যব বপন করে প্রথম আর্যরা প্রতিপত্তি লাভ করেছিল।

তৃতীয় মণ্ডলের এক সূক্তে বিশ্বামিত্র ঋষি ত্রিষ্টুপ ছন্দে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে বলছেন—

অশ্ব দান করেছেন ইন্দ্র, দান করেছেন সূর্য,
গোধন দান করেছেন বহু লোকের উপভোগের যোগ্য,
দান করেছেন সুবর্ণময় ধন,
আর্য বর্ণকে রক্ষা করেছেন দস্যুদের বধ করে ॥ ৩।৩৪।৯ ॥

এখানে বর্ণ শব্দের অর্থ জাতি। ঋগ্বেদ রচনাকালে যে সমাজে আর্য ও দস্যু এই দুটি জাতি বা বর্ণ ছিল, তা এই ঋক থেকেই জানা যায়।

এই রকমের উক্তি ঋগ্বেদের আরও অনেক স্থানে আছে। তাই সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে দস্যুরাই ভারতের আদিম অধিবাসী এবং নবাগত আর্যরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বসতি স্থাপন করেছিলেন। দস্যুদেরই বলা হয়েছে যে তারা পৃথিবী নিবাসী অর্থাৎ তাদের বাস পুরাণের পৃথু রাজার রাজ্য পৃথিবীতে।

ভারত প্রভৃতি দশ জাতির সঙ্গে সুদাস রাজার যুদ্ধের কথাও আছে। বিশ্বামিত্র ছিলেন ভারতদের পুরোহিত এবং সুদাস রাজার পুরোহিত ছিলেন বসিষ্ঠ। এই যুদ্ধের বর্ণনা দিয়ে দুই ঋষিই সূক্ত রচনা করেছেন। প্রথম মণ্ডলের ৩৩ সূক্তের ঋষি দুজন। বিশ্বামিত্র ও নদী ঋষি। দুজনে মিলে তেরোটি ঋক রচনা করেছেন, তার মধ্যে বিশ্বামিত্রের রচনা ১ থেকে

৩, ৫, ৭, ৯ এবং ১১ থেকে ১৩ ঋক, বাকিগুলি নদী ঋষির রচনা। এর অনুবাদ এই রকম—

পর্বতের উৎসঙ্গ থেকে জলপ্রবাহবতী বিপাশ ও শুতুদ্রী
বেগে ছুটেছে সাগর সঙ্গমের অভিলাষে
মন্দুরাবিমুক্ত দুই ঘোটকীর মতো স্পর্ধা করে
গোদ্বয়ের মতো শোভমানা হয়ে
বৎসলেহনাভিলাষিণী ধেনুদ্বয়ের মতো ॥ ১ ॥
হে নদীদ্বয়, তোমাদের প্রেরণ করেছেন ইন্দ্র,
তোমরা রক্ষা করছ তাঁর প্রার্থনা,
রথীদ্বয়ের মতো যাচ্ছ সমুদ্রের অভিমুখে।
তোমরা এক যোগে প্রবাহিত ও বর্ধিত হয়ে তরঙ্গের দ্বারা,
পরস্পর শোভা পাচ্ছ পরস্পরের নিকটে গিয়ে।' ২ ॥
মাতৃরূপী শুতুদ্রী নদীর নিকটে উপস্থিত হয়েছি আমি,
উপস্থিত হয়েছি সৌভাগ্যবতী বিপাশ নদীর নিকটে।
এঁরা একই দিকে যাচ্ছে বৎসলেহনাভিলাষিনী ধেনুর মতো ।৩।।

নদীদ্বয়। আমরা এই জলে স্ফীত হয়ে যাচ্ছি দেবকৃতস্থানের অভিমুখে,
নিবৃত্ত হবার নয় আমাদের এই গমনের উদ্যোগ।
কী জন্য এই বিপ্র বার বার আহ্বান করছে নদী গণকে ? ॥৪॥

বিশ্বমিত্র। হে জলবতী নদীদ্বয়, মুহূর্তের জন্য বিরত হও গমনে
আমার সোম সম্পাদক বাক্যের জন্য।
কুশিকের পুত্র আমি প্রসাদের অভিলাষে
স্তুতি দিয়ে নদীকে ডাকছি আমার উদ্দেশে।। ৫ ॥

নদীদ্বয়। আমাদের খনন করেছেন বজ্রবাহু ইন্দ্র
নদীগণের পরিবেষ্টক বৃত্রকে হনন করে।
আমাদের প্রেরণ করেছেন
জগৎ প্রেরক সুহস্ত দ্যুতিমান ইন্দ্র।
তাঁরই আজ্ঞায় আমরা গমন করছি প্রভূত হয়ে ॥ ৬ ॥

বিশ্বমিত্র। যে, অহিকে বিদীর্ণ করেছিলেন ইন্দ্র,
সর্বদা কীর্তন করা উচিত তাঁর সেই বীর কর্ম।
ইন্দ্র বজ্রে বধ করেছিলেন অবরোধকারীদের,
এসেছিল গমনাভিলাষী জল॥

নদীদ্বয়। হে স্তোতা, তুমি বিস্মৃত হয়োও না
যে বাক্য করছ ঘোষণা।

উক্থ রচনা করে তুমি আমাদের সেবা কোরো
ভবিষ্যৎ যজ্ঞ দিবসে।
তোমাকে নমস্কার করছি আমরা,
পুরুষের মতো প্রগল্ভ কোরো না আমাদের ॥ ৮ ॥

বিশ্বামিত্র। হে ভগিনীর মতো নদীদ্বয়, আমি স্তব করছি শোন,
রথ ও অশ্ব নিয়ে আমি এসেছি দূর দেশ থেকে।
তোমরা অবনত হও, সুখে পার হওয়া যাবে তাতে।
হে নদীদ্বয়, তোমরা যাও রথ চক্রের অক্ষের অধোদেশে
স্রোতের জল নিয়ে ॥ ৯ ॥

নদীদ্বয়। হে স্তোতা, আমরা শুনলাম তোমার সমস্ত কথা,
দূর দেশ থেকে এসেছ তুমি, তাই যাও রথ ও শকটের সাথে।
তোমার জন্য আমরা অবনত হচ্ছি,
মাতার মতো সন্তানকে স্তন পান করাবার জন্য,
পুরুষকে আলিঙ্গনের জন্য যুবতীর মতো ॥ ১০ ॥

বিশ্বামিত্র। হে নদীদ্বয়, ভারতগণ পার হবে তোমাদের,
পার হতে অভিলাষী ভরত বংশীয়রা
ইন্দ্র প্রেরিত তোমাদের আজ্ঞা নিয়ে হবে পার।
পার হবার উদ্যোগ করছে তারা, অনুমতি পেয়েছে তোমাদের।
তোমরা যজ্ঞার্হ, সর্বত্র তোমাদের স্তুতি করব আমি ॥ ১১ ॥
পার হয়ে গেলেন গোধন অভিলাষী ভারতগণ
নদীগণের সুন্দর স্তুতি করছেন বিপ্র।
অন্নকারিণী ও ধনযুক্তা হয়ে তৃপ্ত ও পূর্ণ কর তোমরা
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী সকলকে এবং চলে যাও শীঘ্র ॥ ১২ ॥
হে নদীদ্বয়, এইরূপে প্রবাহিত হোক তোমাদের তরঙ্গ,
তার উপরে থাকুক যুগকীল,
রজ্জু স্পর্শ কোরো না তোমরা।
এক্ষণে যেন বর্ধিতা না হয় এই পাপ রহিতা
কল্যাণকারিণী অনিন্দনীয়া বিপাশ ও শুতুদ্রু ॥ ১।৩৩।১৩ ॥

এই সূক্তটি পাঠ করলেই বোঝা যায় যে গোধন অভিলাষী ভরত বংশীয়রা বিপাশা ও শতদ্রু নদীর তীরে সমবেত হয়ে পার হবার জন্য উদ্যোগ করছেন। তাঁদের পুরোহিত বিশ্বামিত্র ঋষি নদীদ্বয়ের স্তব করে পার হবার অনুমতি চাইছেন। তারপর তাঁরা জলের উপর দিয়ে রজ্জু বেধে এই দুই নদী পার হয়ে গেলেন যুদ্ধের জন্য। যুদ্ধ

হয়েছিল সুদাস রাজার সঙ্গে। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন ভারত প্রভৃতি জাতি। বিজয়ী রাজা সুদাসের পুরোহিত বসিষ্ঠ যে গীত রচনা করেছিলেন, তা আছে সপ্তম মণ্ডলের ১৮ ও ৮৩ সূক্তে।

৮৩ সূক্তে বসিষ্ঠ ত্রিষ্টুপ ছন্দে ইন্দ্র ও বরুণ দেবতাকে বলেছেন—

হে নেতা ইন্দ্র ও বরুণ, তোমাদের বন্ধুত্ব চেয়ে
পরশুধারী যোদ্ধারা পূর্ব দিকে এসেছিল গোলাভের ইচ্ছায়।
বধ কর উভয়ে দাস বৃত্র ও আর্য-শত্রুগণকে।
তোমরা এসো সুদাস রাজাকে রক্ষার উদ্দেশে ॥ ১ ॥
মানুষ যেখানে মিলিত হয় ধ্বজা উত্তোলন করে,
কিছুই অনুকূল হয় না যে যুদ্ধে,
দূতেরা যাতে স্বর্গ দর্শন করে ও ভীত হয় সংগ্রামে,
হে ইন্দ্র ও বরুণ, কথা কও আমাদের পক্ষ হয়ে ॥ ২ ॥
হে ইন্দ্র ও বরুণ, ধ্বংসপ্রাপ্ত বলে দৃষ্ট হচ্ছে ভূমির অন্ত,
দ্যুলোকে আরোহণ করছে কোলাহল,
সৈন্যের শত্রুরা উপস্থিত হয়েছে আমার নিকটে,
তোমরা আমাদের নিকটে এসো রক্ষার জন্য ॥ ৩ ॥
হে ইন্দ্র ও বরুণ, তোমরা রক্ষা করেছ সুদাসকে
আয়ুধ দিয়ে অপ্রাপ্ত ভেদকে হিংসা করে,
শুনেছ তৃৎসুদের স্তোত্র,
তাদের পৌরহিত্য সফল হয়েছিল যুদ্ধ কালে ॥ ৪ ॥
হে ইন্দ্র ও বরুণ, চারিদিক থেকে আমাকে বাধা দিচ্ছে
শত্রুর আয়ুধ, বাধা দিচ্ছে হিংসকদের মধ্যে শত্রুরা।
উভয় প্রকার ধনের ঈশ্বর তোমরা,
আমাদের রক্ষা কর যুদ্ধের দিনে ॥ ৫ ॥
যুদ্ধকালে উভয় প্রকার লোকেই আহ্বান করে
ইন্দ্র ও বরুণকে ধনলাভের জন্য।
এই যুদ্ধে তোমরা রক্ষা করেছিলে তৃৎসুগণের সাথে
দশজন রাজা কর্তৃক হিংসিত সুদাসকে ॥ ৬ ॥
হে ইন্দ্র ও বরুণ, দশজন যজ্ঞরহিত রাজা
মিলিত হয়েও সমর্থ হন না সুদাসকে প্রহার করতে।
সফল হয়েছিল হব্য যুক্ত যজ্ঞে নেতাদের স্তোত্র।
এদের যজ্ঞে আবির্ভূত হয়েছিলেন সমস্ত দেবতারা ॥ ৭ ॥
যেখানে অন্ন ও স্তুতির সাথে পরিচর্যা করে
নির্মলগামী জটাযুক্ত কর্মবিশিষ্ট তৃৎসুগণ,

সে দেশে তোমরা বল দিয়েছিলে, হে ইন্দ্র ও বরুণ,
দশজন রাজা কর্তৃক পরিবেষ্টিত সুদাসকে ॥ ৮ ॥
হে ইন্দ্র ও বরুণ, যুদ্ধে বৃত্রগণকে হনন করেন
তোমাদের একজন, ব্রত রক্ষা করেন আর একজন।
হে অভীষ্টবর্ষীদ্বয়, তোমাদের আহ্বান করছি
সুপ্রবৃত্ত স্তুতি দিয়ে, সুখ প্রদান কর আমাদের ॥ ৯ ॥
ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও অর্যমা আমাদের দিন
দ্যোতমান ধন ও বিস্তীর্ণ গৃহ।
আমাদের অহিংসক হোক যজ্ঞবর্ধিকা অদিতির তেজ।
আমরা স্তুতি করব সবিতা দেবতার ॥ ১০ ॥

এই সূক্তে সুদাস রাজার পুরোহিত ইন্দ্র ও বরুণের নিকটে প্রার্থনা করছেন রাজার আর্য অনার্য সকল প্রকার শত্রু ধ্বংস করে তাঁকে রক্ষা করতে। ভারত প্রভৃতি দশটি জাতি তাঁকে আক্রমণ করেছিল। সুদাস রাজা একাকী তাঁদের পরাজিত করেছিলেন। ঋগ্বেদেই পাওয়া যায় যে সুদাসের বিরুদ্ধাচারী জাতির মধ্যে ছিল ভারত, যদু, মৎস্য, অনু ও দ্রুহ্যু, জাতির নাম। এই মণ্ডলেরই ১৮ সূক্তে বসিষ্ঠ বলছেন—

তুর্বশ নামে রাজা ছিলেন যজ্ঞশীল ও দানকারী।
মৎস্যের ন্যায় নিয়ন্ত্রিত হলেও ভৃগু ও দ্রুহ্যুগণ
সুদাস ও তুর্বশের সাক্ষাৎ করিয়ে দিয়েছিলেন ধনের জন্য।
এই উভয়ের মধ্যে সখা বধ করেছিলেন সখাকে ॥ ৩।১৮।৬ ॥
দেববান রাজার পৌত্র, পিজবনের পুত্র সুদাস,
তাঁর কাছে আমি পেয়েছি দুই শত গো ও দুখানি রথ,
পেয়েছি ইন্দ্রকে স্তব করে।
হোতা যেমন গমন করে যজ্ঞ গৃহে,
তেমনি করে গমন করছি আমিও ॥ ৩।১৮।২২ ॥

দেখা যাচ্ছে যে যুদ্ধে জয়লাভ করে রাজা সুদাস তাঁর পুরোহিত বসিষ্ঠকে দুশো গরু ও দুখানি রথ দিয়েছিলেন। সুদাসের পিতৃপরিচয়ও আছে। কিন্তু এই সুদাস পুরাণের সুদাস নন। পুরাণের সুদাস ঋতুপর্ণের পৌত্র ও সর্বকামের পুত্র, তিনি বিদ্যমান ছিলেন ২৫৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। ঋগ্বেদের সুদাস দেববানের পৌত্র ও পিজবনের পুত্র। কাজেই এই সুদাসের কাল অনুমান করা সম্ভব নয়। তবে বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র যদি পুরাণের বিখ্যাত ঋষি হন, তবে তাঁরা দুজনেই রাজা হরিশ্চন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। তার কাল হল ৩০৬৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ।

এই প্রসঙ্গটি আর এক ভাবে বিচার করা যায়। পৌরাণিক সুদাসের

পুত্রের নাম মিত্রসহ। বসিষ্ঠের শাপে ইনিই কল্মাষপাদ হয়েছিলেন। এই বসিষ্ঠেরও সমসাময়িক ছিলেন বিশ্বামিত্র। মনে হয় যে বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র নাম বংশ পরম্পরায় চলে আসছিল এবং পৌরাণিক সুদাস যদি ঋগ্বেদের সুদাস হন, তবে তাঁর পিতৃপরিচয় কোনখানে ভুল হয়েছে। সত্য যাই হোক, এ কথা মানতে হয় যে ঋগ্বেদের এই সূক্তগুলি রচিত হয়েছে ৩০০০ ও ২৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে।

সুদাস রাজার সঙ্গে আর যাঁদের যুদ্ধ হয়েছিল তাঁদের মধ্যে আছেন ভরত বংশীয় রাজারা এবং যযাতির পুত্র যদু, অনু ও দ্রুহ্যু বংশের রাজারা। যযাতি বিদ্যমান ছিলেন ৩৭২১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। কত পুরুষ পরে তার বংশধররা সুদাসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, সে কথা ঋগ্বেদে নেই, নেই পুরাণেও। কাজেই সঠিক ভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়।

এই আলোচনা এই জন্যই তাৎপর্যপূর্ণ যে এই সময়ের ঋষিরা পুরাণে উল্লিখিত দেবাসুরের দ্বন্দ্ব দেখেন নি। তা ঘটেছিল ৩৯৫০ থেকে ৩৭৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে। তাঁরা দেবতা ও অসুরদের নাম শুনেছিলেন, শুনেছিলেন তাঁদের বিক্রমের কথা এবং সেই সব কথা কিংবদন্তীর মতো মুখে মুখে চলে আসছিল। ঋষিরা যে প্রকৃতির নানা রূপ ও শক্তিতে দেবতাদের কল্পনা করবেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মেঘাবৃত আকাশ বজ্রবিদ্যুতে ছিন্ন ভিন্ন হতে দেখে তাঁরা বলেছেন বৃত্রের সঙ্গে ইন্দ্রের যুদ্ধ। যাঁরা বলেন যে ঋষিদের বর্ণনা দেখেই পুরাণকার তাঁদের কাহিনী রচনা করেছেন, তাঁরা ভুল বলেন। বেদ পুরাণের পূর্বে রচিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু যে সব ঐতিহাসিক ঘটনা মুখে মুখে চলে আসছিল, সেই সব ঘটনারই উল্লেখ আছে ঋগ্বেদে। পুরাণ সংহিতায় সে সব ঘটনা সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হয়েছিল। তাই বলা হয়েছে যে পুরাণ সংহিতাই আমাদের আদি গ্রন্থ, ঋগ্বেদ নয়। যে পৃথু রাজার নামে পৃথিবী নাম হয়েছিল ভারতের উত্তরাংশের, তিনিই মহাপ্লাবনের পূর্বে পুরাণ রচনার জন্য ঐতিহাসিক নিয়োগ করেছিলেন তাঁর রাজসভায়। পুরাণে তাঁরা মাগধ ও সূত নামে পরিচিত।

আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। পুরাণ অনুসারে কল্পের আরম্ভ ৫৯৫৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। তখন স্বায়ম্ভুব মনুর কাল। তাঁরই পঞ্চম পুরুষে ভরত হিমালয়ের দক্ষিণের বর্ষে রাজা হয়েছিলেন এবং ভারতবর্ষ নাম হয়েছিল তাঁরই নাম অনুসারে। ঋগ্বেদে সুদাস রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমরা ভারত বা ভরতবংশীয় দশটি জাতির কথা পাই। এর থেকেই বোঝা যায় যে মহাপ্লাবনের পরে যখন এই দেশে নূতন বসতি স্থাপন হয়, তখনও ভরতবংশীয়রা নিশ্চিহ্ন হয়ে

যান নি। সিন্ধুর উপত্যকায় যে সুসভ্য জাতি নগর ও বন্দর নির্মাণ করে সেকালের সভ্যতার নিদর্শন রেখে গেছে মাটির নিচে, তার সঙ্গে ভরতবংশীয়দের সম্বন্ধ নিশ্চয়ই ছিল। হয়তো তারাই ছিল ভরতবংশীয়। মহাপ্লাবনের সময়ে গিরি কন্দরে আশ্রয় নিয়ে তাঁরা কোন রকমে প্রাণ রক্ষা করেছিলেন এবং এক হাজার বছরের অন্ধকার যুগের পর তাঁরাই বিচ্ছিন্ন হয়ে দশটি জাতিতে পরিণত হন, কিংবা যযাতির বংশধরেরা যোগ দেন তাঁদের সঙ্গে।

দেবাসুরের দ্বন্দ্ব ইলাবৃত বর্ষের ঘটনা। তার কয়েকশো বৎসর পরে দেবতা বলে পরিচিত জাতি যখন সেই বর্ষ ছেড়ে ভারতে আসেন, তখন মধ্য পথে তাঁরা দুদলে বিভক্ত হয়ে গেছেন। একদল ইরাণীয় আর্য নামে পরিচিত হয়েছেন, আর যে দল এসে ভারতে উপস্থিত হলেন তাঁদের নাম হয়েছিল ভারতীয় বা হিন্দু আর্য। সিন্ধু নদী থেকেই হিন্দু শব্দের উৎপত্তি এবং ভরত রাজার দেশ ভারতবর্ষ থেকে ভারতীয় আর্য নাম। এই নূতন আগন্তুক আর্যদের সঙ্গেই সংঘর্ষ হয়েছিল ভরত-বংশীয়দের। এই বিবাদের সময় আর্যরাজা সুদাসের পুরোহিত ছিলেন বসিষ্ঠ এবং ভরতবংশীয়দের পুরোহিত বিশ্বামিত্র। এঁদের সঙ্গেই ছিল এ দেশের আদিম অধিবাসী অনার্যরা। এঁদের সহায়তা করার জন্যই বিশ্বামিত্র নিন্দিত হয়েছেন। সমাজে তখন দুটি মাত্র বর্ণ ছিল— আর্য ও অনার্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র ও বৈশ্য এই চার বর্ণের উদ্ভব তখনও হয় নি। তা হবার পর বিশ্বামিত্র বংশীয়দের ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা হত না। এ বোধ হয় অনার্যদের পৌরহিত্য করার জন্যই। তাইতেই বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে নানাভাবে সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত বসিষ্ঠকে মেনে নিতে হয়েছে যে বিশ্বামিত্রও ব্রাহ্মণ।

আমরা একটা পুরনো ধারণাকে আজও আঁকড়ে ধরে আছি। এখনও বিশ্বাস করি যে বেদের উপমা থেকেই পুরাণে কাহিনী রচনা করা হয়েছে। এই বদ্ধমূল ধারণা থেকে মুক্ত হতে না পারলে বেদের প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে যে বেদের সমাজ দেবাসুরের বহু পরবর্তীকালের সমাজ। মানুষ তখন আদিত্য জাতির উপরে দেবত্ব আরোপ করেছে এবং দৈত্য ও দানবদের অসুর নামে মন্দের প্রতীক ভাবছে। অথচ এঁরা সবাই রক্তমাংসের মানুষ। এই ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করেই আমাদের বৈদিক সমাজের আলোচনা করতে হবে।

আর্যদের বৃত্তি কী ছিল

বিদেশের অনেক পণ্ডিতের ধারণা যে আর্যরা যাযাবর পশু পালক ছিলেন। পশুপালন সকলেই করে। আর্যরা বৃত্তি হিসাবে পশুপালন করত, এ রকম কথা ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। বরং আমরা প্রথম মণ্ডলের ১১৭ সূক্তে পেয়েছি যে কক্ষীবান ঋষি অশ্বীদ্বয়কে বলছেন—

হে অশ্বীদ্বয়, আর্যদের জন্য তোমরা
চাষ করেছিলে লাঙ্গল দিয়ে।
অন্নের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলে যব বপনের পর,
বিস্তীর্ণ জ্যোতি প্রকাশ করেছ বজ্রে দস্যু বধ করে ॥ ১।১১৭।২১ ॥

দস্যু বা অনার্য জাতিকে বধ করে আর্যরা যব বপন করেছিল এবং এর জন্য তারা লাভবান হয়েছিল। যব ছিল তাদের প্রধান শস্য। ধানও ছিল, তাকে বলত ব্রীহি। ঋগ্বেদে ধান্য শব্দও পাওয়া যায়, কিন্তু তার অর্থ ভাজা যব। অন্ন বলতে খাদ্য বোঝাত।

ভূমি কর্ষণের পূর্বে ঋষিরা ক্ষেত্রপতির স্তব করতেন। বামদেব ঋষি চতুর্থ মণ্ডলের ৫৭ সূক্তে বলছেন—

আমরা ক্ষেত্র জয় করব বন্ধু সদৃশ ক্ষেত্রপতির সাথে,
তিনি পুষ্টি প্রদান করুন আমাদের গো ও অশ্বের।
এই রকম দান করেই তিনি সুখী করেন আমাদের ॥ ১ ॥
হে ক্ষেত্রপতি, ধেনু যেমন দান করে দুগ্ধ,
তেমনি তুমি দান কর প্রভূত জল
মধুস্রাবী সুপবিত্র ঘৃততুল্য ও মাধুর্যোপেত।
যজ্ঞের স্বামীরা সুখী করুন আমাদের ॥ ২ ॥
আমাদের জন্য মধুযুক্ত হোন ওষধি সমূহ।
দ্যুলোক জল ও অন্তরিক্ষও হোক মধুযুক্ত।
আমাদের জন্য মধুযুক্ত হোন ক্ষেত্রপতি।
আমরা তাঁকে অনুসরণ করব শত্রুকর্তৃক অহিংসিত হয়ে ॥ ৩ ॥
সুখে বহন করুক বলীবর্দরা,
মানুষেরা কাজ করুক সুখে,
সুখে কর্ষণ করুক লাঙ্গল।
প্রগ্রহ বন্ধ হোক সুখে, সুখে প্রেরণ কর প্রতোদ ॥ ৪ ॥
হে শুন, হে সীর, তোমরা সেবা কর আমাদের এই স্তুতি।

দ্যুলোকে তোমরা পেয়েছ যে জল,
তা দিয়ে সিক্ত কর এই পৃথিবীকে ॥ ৫ ॥
হে সৌভাগ্যবতী সীতা, অভিমুখী হও তুমি,
তোমাকে বন্দনা করছি আমরা।
তুমি আমাদের প্রদান কর সুন্দর ধন,
সুফল কর প্রদান ॥ ৬ ॥
সীতাকে গ্রহণ করুন ইন্দ্র,
পূষা পরিচালিত করুন তাঁকে।
জলবতী হয়ে তিনি দোহন করুন শস্য
বৎসরের পর বৎসর ॥ ৭ ॥
সুখে ভূমি কর্ষণ করুক লাঙ্গলের ফাল,
রক্ষকেরা সুখে থাক বলীবর্দের সঙ্গে,
মধুর জলে পৃথিবী সিক্ত করুন পর্জন্য,
হে শুন সীর, আমাদের প্রদান কর সুখ ॥ ৪।৫৭।৮ ॥

বোঝা যাচ্ছে যে ক্ষেত্রপতি হলেন কৃষি-কার্যের অধিষ্ঠাতা দেবতা। গৃহ্য সূত্রে পাওয়া যায় যে লাঙ্গল দিয়ে চাষ আরম্ভ করবার পূর্বে এই গৃহ্যের প্রত্যেকটি ঋক উচ্চারণ করতে হয়। শৌনকের মতে শুন দ্যুলোকের দেবতা ইন্দ্র, সুতরাং সীর বায়ু। কিন্তু যাস্ক বলেন শুন বায়ু ও সীর আদিত্য। সীর শব্দের আদি অর্থ লাঙ্গল এবং শুনাসীর অর্থ কৃষি কার্যের দুই উপকরণ—লাঙ্গল ও তার ফলা। লাঙ্গলে চিহ্নিত ভূমির রেখাকেই সীতা বলে। ঋষি স্তুতি করছেন যে সেই লাঙ্গলে কর্ষিত রেখা বৎসরের পর বৎসর শস্য দোহন করুক। পণ্ডিতরা বলেন যে রামায়ণ রচনা কালে সীতা যখন মহাকাব্যের নায়িকা হলেন, তখনও তাঁর জন্ম কথায় তাঁর নামের আদি অর্থ নিহিত ছিল। কবি বলেছেন যে সীতার জন্ম ভূমিকর্ষণের সময়ে লাঙ্গলের ফলায়।

বুধ ঋষিও কৃষি কার্যের কথা বলছেন দশম মণ্ডলের ১০১ সূক্তে।—

যোজনা কর লাঙ্গল, যুগ কর বিস্তার।
যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছে এখানে,
তাতে বপন কর বীজ।
আমাদের অন্ন পরিপূর্ণ হোক স্তবের সাথে।
নিকটের পক্ক শস্যে পতিত হোক সৃণি ॥ ১০।১০১।৩ ॥

সৃণির অর্থ কাস্তে। চাষ করে বীজ বপন ও পাকা ফসল কাটার কথা বলা হয়েছে এই সূক্তে।

কর্ষিত ভূমিতে জল সেচনের কথাও আছে দশম মণ্ডলের ৯৯ সূক্তে। বম্র ঋষি বলছেন—

ইন্দ্র উর্বরা ভূমিতে সেচন করেন প্রচুর জল
মেঘের দিকে গিয়ে মেঘে ভ্রমণ করে।
সে সব ক্ষেত্রে ঘৃতের মতো জল বইয়ে দেয়
অনেক ক্ষুদ্র নদী একত্র হয়ে।
তাদের চরণ নেই, রথ নেই, অশ্ব তাদের দ্রোণি ॥ ১০।৯৯।৪ ॥

যে সেচনী দিয়ে জল ক্ষেত্রে সেচন করা হয়, তারই নাম দ্রোণি।

গোচারণের কথা যে ঋগ্বেদে নেই তা নয়। প্রথম মণ্ডলের ৪২ সূক্তে কণ্ব ঋষি বলছেন—

আমাদের নিয়ে যাও শোভনীয় তৃণাচ্ছন্ন দেশে,
পথে যেন নতুন সন্তাপ না হয়।
হে পূষা, তুমি আমাদের রক্ষণের উপায় কর পথে ॥১।৪২।৮॥

এই রকমের উক্তি থেকে পণ্ডিতরা মনে করেন যে আর্যদের মধ্যে কোন গোষ্ঠী পশুপালক ছিল এবং তারাই তৃণের অন্বেষণে স্থান থেকে স্থানান্তরে যেত।

ষষ্ঠ মণ্ডলের ৫৪ সূক্তে ভরদ্বাজ ঋষির কণ্ঠে তাদের প্রার্থনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। ঋষি পূষা দেবতাকে বলছেন গায়ত্রী ছন্দে—

পূষা যেন অনুসরণ করেন
আমাদের ধেনুবৃন্দ রক্ষা করবার জন্য।
তিনি যেন রক্ষা করেন আমাদের অশ্বগণকে,
অন্ন প্রদান করেন আমাদের ॥ ৫ ॥
হে পূষা, রক্ষণের জন্য তুমি অনুসরণ কর
সোমাভিষবকারী যজমানের গোধন,
অনুসরণ কর স্তোত্র-উচ্চারণকারী আমাদের ও ধেনুগণের ॥৬॥
হে পূষা, নষ্ট যেন না হয় আমাদের গোধন,
এরা যেন নিহত না হয় ব্যাঘ্রাদির দ্বারা।
বিনষ্ট না হয় কূপে পড়ে।
তুমি এসো অহিংসিত ধেনুগণের সাথে সায়ংকালে ॥ ৬।৫৪।৭ ॥

আর্য গোরক্ষকেরা সূর্যকে যে রূপে দেখত, সূর্যের সেই রূপের নামই পূষা। তাই তাঁর হাতে প্রতোদ কল্পনা করা হয়েছে। তিনি পথ নির্দেশ করেন, গো অশ্ব প্রভৃতি পশু রক্ষা করেন, নষ্ট পশুও উদ্ধার করেন এবং ভ্রমণকারীদের সৎ পথে নিয়ে যান।

এই রকমের বিক্ষিপ্ত উক্তি থেকে বোঝা যায় যে প্রথম আর্যরা কৃষি

কার্য করত, পশু পালনও করত। কৃষির জন্য পশুর দরকার, দরকার যান বাহনের জন্য, শীত বস্ত্রের জন্যও। এইজন্য মেষ গোধন ও অশ্বের উল্লেখ নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

কৃষি কার্য ও পশুপালন যে শুধু আর্যরাই জানত, এ কথাও ঠিক নয়। অনার্যরাও এই কাজ করত। আর্য ও অনার্যদের মধ্যে যে সব যুদ্ধ বিগ্রহ হত, তা ভূমি ও গোধনের জন্যই। ভূমি বলতে কৃষিক্ষেত্রই বোঝাত। অনার্যদের পরাজিত করতে পারলে তাদের চাষের জমি আর্যরা ভাগ করে নিত। ১।১০০।১৮ ঋকে এই কথাই বলা হয়েছে। ষষ্ঠ মণ্ডলের ২৬ সূক্তে ভরদ্বাজ ঋষি ত্রিষ্টুপ ছন্দে ইন্দ্র দেবতার উদ্দেশে বলছেন—

হে ইন্দ্র, আমরা উদ্যত হলে শত্রুকে আক্রমন করতে
তুমি আমাদের সৈন্যদের রক্ষা কর এই সমস্ত স্তুতি দ্বারা,
সংগ্রামে বিধ্বস্ত কর শত্রুর কোপ,
সর্বত্র বিদ্যমান দাসদের বিনষ্ট কর
এই সমস্ত স্তুতিদ্বারা আর্যের জন্য ॥ ২ ॥
হে ইন্দ্র, কি আত্মীয়, কি অপরিচিত
সম্মুখীন হয়ে যারাই উদ্যোগী হয়
আমাদের প্রতিকূল আচরণে,
তুমি নষ্ট কর তাদের বল।
ক্ষয় কর বীর্য ও পরাঙ্মুখ কর তাদের ॥ ৩ ॥
হে ইন্দ্র, বিরোধীরা যখন বলীয়ান হয়ে প্রবৃত্ত হয় সংগ্রামে,
অথবা বিবাদ করে পরস্পর আক্রোশ ভরে
পুত্র পৌত্র ধেনু জল বা উর্বর ভূমির জন্য,
তখন তোমার অনুগৃহীত বীর তার শারীরিক বলে
শত্রুপক্ষের বীরকে সংহার করে ॥ ৬।২৬।৪ ॥

ভরদ্বাজ ঋষি এই শেষের ঋকে স্পষ্ট ভাষায় আর্য ও অনার্যদের বিবাদের কারণের কথা বলেছেন। তাদের যুদ্ধ হত ধেনু জল ও উর্বর ভূমির জন্য। পশু পালন করত বলে, ধেনু এবং কৃষির জন্য জল ও উর্বর ভূমির দরকার হত। দু পক্ষেরই এ সব থাকত।

কিন্তু কৃষি কার্য ও পশুপালনই তাদের একমাত্র বৃত্তি ছিল না। তারা যে নানা রকমের কাজ করত, সে কথাও ছড়িয়ে আছে ঋগ্বেদের নানা স্থানে। কৃষিকর্মের জন্য যন্ত্রাদি নির্মাণ তো করতই, যুদ্ধের জন্য রথ ও অস্ত্রাদিও নির্মাণ করত। এই প্রসঙ্গে ষষ্ঠ মণ্ডলের ৭৫ সূক্তটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এটি রচনা করেছেন ভরদ্বাজের পুত্র পায়ু ঋষি। ষষ্ঠ মণ্ডলের শেষ সূক্ত এটি।—

রাজা যখন বর্ম পরিধান করেন সংগ্রামের সময়,
তখন তাঁর রূপ হয় জীমূতের মতো।
হে রাজা, তুমি জয়লাভ কর অবিদ্ধ শরীরে,
তোমাকে রক্ষা করুক বর্মের মহিমা ॥ ১ ॥
আমরা গাভী জয় করব ধনু দিয়ে,
ধনু দিয়ে করব যুদ্ধ,
ধনু দিয়েই বধ করব মদোন্মত্ত শত্রুসেনা।
শত্রুর কামনা নষ্ট করুক এই ধনু,
ধনু দিয়েই আমরা জয় করব সকল দিক ॥ ২ ॥
সংগ্রামে এই ধনুর জ্যা যেন প্রিয় কথা বলতেই
কানের কাছে আসে ধনুধারীর।
স্ত্রী যেমন কথা বলে প্রিয় পতিকে আলিঙ্গন করে,
জ্যাও তেমনি শব্দ করে আলিঙ্গন করে বাণকে ॥ ৩ ॥
সেই ধনুষ্কোটিদ্বয় আচরণ করুক অনন্যমনস্ক স্ত্রীর মতো,
শত্রুকে আক্রমণের সময় পুত্রতুল্য রাজাকে রক্ষা করুক মাতৃভাবে,
গমন করুক স্বকার্য উত্তম রূপে অবগত হয়ে,
রাজার অমিত্রদের হিংসা করে বিদ্ধ করুক শত্রুদের ॥ ৪ ॥
বহুতর বাণের পিতা এই তূনীর,
চিশ্বা শব্দ করে বাণ তুলবার সময়ে।
যুদ্ধ কালে নিবদ্ধ থাকে যোদ্ধার পৃষ্ঠভাগে,
সমস্ত সেনা জয় করে প্রসব করে বাণ ॥ ৫ ॥
সুসারথি পুরস্থিত অশ্বদের নিয়ে যায়
যেখানে তাদের নিয়ে যেতে চায় সেখানেই।
অশ্বের পশ্চাতে থেকে ইচ্ছা মতো নিয়মিত করে রশ্মি,
স্তব কর তাদের মহিমা ॥ ৬ ॥
অশ্বরা রথের সাথে গমন করে বেগে
খুর দিয়ে ধূলি উড়িয়ে সশব্দে,
তাড়না করে না পালিয়ে
হিংস্র শত্রুদের পদাঘাত করে ॥ ৭ ॥
হব্য যেমন বর্ধিত করে অগ্নিকে,
তেমনি এ রাজাকে বর্ধিত করুক এর রথবাহিত ধন।
রথে নিহিত থাকে এঁর অস্ত্র ও কবচ।
আমরা সর্বদা প্রসন্ন মনে যাই রথের সমীপে ॥ ৮ ॥

সুপর্ণ ধারণ করে বাণ, মৃগ এর দন্ত,
তা পতিত হয় গাভী কর্তৃক বদ্ধ ও প্রেরিত হয়ে।
নেতারা যেখানে বিচরণ করেন একত্রে ও পৃথক রূপে,
বাণ সমূহ আমাদের সুখদান করুন সেই স্থানে ॥ ১১ ॥
হে বাণ, পরিবর্ধিত কর আমাদের,
আমাদের শরীর হোক পাষাণের মতো,
আমাদের হয়ে বলুন সোম,
সুখ দান করুন অদিতি ॥ ১২ ॥
হে কশা, তোমার দ্বারা তাদের সক্থিতে আঘাত করে
প্রকৃষ্ট জ্ঞান বিশিষ্ট সারথিরা,
আঘাত করে জঘন প্রদেশে,
তুমিই অশ্বদের প্রেরণ কর সংগ্রামে ॥ ১৩ ॥
হস্তঘ্ন জ্যার আঘাত নিবারণ করে সর্পের মতো,
শরীরের দ্বারা পরিবেষ্টন করে প্রকোষ্ঠকে,
অবগত হয় সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়,
সর্বতোভাবে রক্ষা করে পুরুষকে পৌরুষশালী হয়ে ॥ ১৪ ॥
যা বিষাক্ত ও শিরোদেশ যার হিংসাকারী
এবং মুখ যার লৌহময়,
নমস্কার সেই পর্জন্য কার্যভূত ইষু দেবতাকে ॥ ১৫ ॥
মন্ত্রের দ্বারা তীক্ষ্ণকৃত হিংসা কুশল ইষু,
তুমি পতিত হও বিসৃষ্ট হয়ে,
গমন করে প্রাপ্ত হও অমিত্রদের,
তাদের মধ্যে কাউকে রেখো না অবশিষ্ট ॥ ৬।৭৫।১৬ ॥

এই সূক্তটি উনিশটি ঋকে সম্পূর্ণ। যুদ্ধযাত্রার কালে রাজাকে বর্মাদি পরিধান করাবার সময় এই সূক্তের ঋকগুলি উচ্চারণ করতে হত। এতেই আছে যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্রের পরিচয়। মৃগের শৃঙ্গে নির্মিত বাণের ফলাকে দন্ত বলা হত, জ্যা নির্মিত হত গরুর স্নায়ু দিয়ে। ধনুর জ্যাঘাত থেকে প্রকোষ্ঠকে রক্ষা করার জন্য যে বর্ম বন্ধন করা যায়, তার নাম হস্তঘ্ন। ইষু শব্দের অর্থ বাণ।

লোহার তৈরি খড়্গেরও ব্যবহার ছিল। ভরদ্বাজের অপত্য গর্গ ঋষি বলছেন—

হে ইন্দ্র, আমাকে সুখী কর তুমি,
প্রসন্ন হও আমার জীবন বৃদ্ধি করতে।
বুদ্ধি আমার সুতীক্ষ্ন কর লৌহময় খড়্গ ধারার মতো,

গ্রহণ কর আমি যা কিছু উচ্চারণ করছি
তোমাকে প্রসন্ন করবার জন্য ॥ ৬।৪৭।১০ ॥

যুদ্ধের রথ ও অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণ করতে জানত দু পক্ষই। অলংকার ব্যবহারেরও প্রচলন ছিল। পঞ্চম মণ্ডলের ৫২ সূক্তে অত্রির অপত্য শ্যাবাশ্ব বলছেন—

বৃষ্টির নেতা ও বলশালী মরুৎগণ দীপ্ত পাচ্ছেন
সমুজ্জ্বল আভরণ ও বিশেষ অস্ত্রের দ্বারা,
নিক্ষেপ করছেন বিদ্যুৎরূপ ঋষ্টি।
প্রত্যহ তাঁদের অনুসরণ করে তড়িৎগণও
গর্জনকারী বারি রাশির মতো।
স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়েই বেগে নিঃসৃত হয়
দীপ্তিমান মরুৎগণের প্রভা ॥ ৫।৫২।৬ ॥

এই ঋকে দেখা যাচ্ছে যে মরুৎগণ আভরণ ও অস্ত্রে সজ্জিত। ঋষ্টি Javelin-এর ন্যায় এক প্রকার আয়ুধ।

আর একটি নূতন কথা আছে এই সূক্তের শেষ ঋকে। শ্যাবাশ্ব ঋষি বলছেন—

সাত সাত জন শক্তিমান মরুৎ
আমাকে একশো করে প্রদান করুন এক এক জনে।
আমি যেন লাভ করি যমুনা তীরের প্রসিদ্ধ ধেনুধন।
অশ্বধনও যেন লাভ করি আমি ॥ ৫।৫২।১৭ ॥

এই ঋক থেকেই জানা যাচ্ছে যে ঋগ্বেদ রচনার কালে যমুনা নদীর তীরের গাভী প্রসিদ্ধ ছিল। গঙ্গা ও যমুনা নদীর উল্লেখ বেশি জায়গায় নেই। যমুনার আর একবার উল্লেখ আছে ৭।১৮।১৯ ঋকে এবং ১০।৭৫।৫ ঋকে গঙ্গার উল্লেখ। কিন্তু আভরণের উল্লেখ আরও অনেক জায়গায় আছে। শ্যাবাশ্ব ঋষিই পঞ্চম মণ্ডলের ৫৫ সূক্তে বলছেন—

পূজনীয় মরুৎগণ সমুজ্জ্বল অস্ত্রধারী,
সুবর্ণের আভরণ তাঁদের বক্ষস্থলে।
তাঁরা ধারণ করেন প্রভূত বল,
তাঁদের বহন করছে বিনীত দ্রুতগামী অশ্বরা।
পশ্চাতে সুন্দরভাবে যাচ্ছে তাঁদের রথ ॥ ৫।৫৫।১ ॥

শ্যাবাশ্ব ঋষিই ৫৭ সূক্তে বলছেন—

হে সুবুদ্ধি মরুৎগণ, তোমাদের আছে শ্রেষ্ঠ রথ ও অশ্ব,
বাঁশী ও ঋষ্টি, উৎকৃষ্ট ধনুক, বাণ ও তূণীর।

তোমরা সুসজ্জিত হও অস্ত্রে, হে পৃশ্নিপুত্রগণ,
তোমরা এসো আমাদের কল্যাণ বিধানের জন্য ॥ ৫।৫৭।২ ॥
হে মরুৎগণ তোমাদের স্কন্ধে ঋষ্টি, বাহুতে বল,
সুবর্ণময় উষ্ণিক শিরোদেশে,
রথে অস্ত্র ও অঙ্গে আছে শোভা ॥ ৫।৫৭।৬ ॥

অলঙ্কারের নামও পাওয়া যায় শ্যাবাশ্ব ঋষির বিভিন্ন সূক্তে। পঞ্চম মণ্ডলের ৫৩ সূক্তে তিনি মরুৎ স্তব করছেন—

হে মরুৎগণ, যে দীপ্তি তোমাদের আভরণে অস্ত্রে ও মাল্যে,
শোভা পাচ্ছে বক্ষের সুবর্ণ আভরণে ও পায়ের অলঙ্কারে,
আছে রথ ও শরাসন আশ্রয় করে,
আমরা স্তব করছি সে সকলের ॥ ৪ ॥

এ হল অনুবাদ। মূলে এই সব অলঙ্কারের নাম অঞ্জি, বাশী, স্রক, রুক্ম ও খাদি। বিদেশের পণ্ডিতরা মনে করেন যে এ সব armlets, garlands, breast plates and bracelets. রুক্ম সোনার বক্ষাভরণ, খাদি হল বালা ও মল। পরের সূক্তের ১১ ঋকে শিপ্রর উল্লেখ আছে। এটি মাথার অলঙ্কার। বিদেশীদের মতে golden tiara। এই মণ্ডলেরই ৫৮ সূক্তের ২ ঋকে খাদি শব্দটি পুনরায় ব্যবহৃত হয়েছে। খাদি হাতের বলয়ই শুধু নয়, পায়েরও অলঙ্কার। এ কালের ভাষায় বালা ও মল দুই ই। নিষ্ক নামে যে সুবর্ণ মুদ্রা প্রচলিত ছিল, তাও অলঙ্কার রূপে গলায় পরা হত। পঞ্চম মণ্ডলেরই ১৯ সূক্তে অত্রির অপত্য বব্রি ঋষি বলছেন—

স্তোত্র কুশল জীবিত মানুষেরা নিষ্ক ধারণ করে কণ্ঠে
অন্নের জন্য স্তোত্র দ্বারা বর্ধিত করে
অন্তরিক্ষবর্তী বৈদ্যুত অগ্নির প্রদীপ্ত বল ॥ ৫।১৯।৩ ॥

রথের কথা আগেই বলা হয়েছে। এই রথ নির্মিত হত খদির বা শিশু কাঠে। তৃতীয় মণ্ডলের ৫৩ সূক্তে বিশ্বামিত্র ঋষি বলছেন—

দৃঢ় কর রথের খদির কাঠের সারকে,
দৃঢ় কর রথের শিশম্পা কাষ্ঠকে ॥ ৩।৫৩।১৯ ॥

বিদেশী পণ্ডিত বলেছেন, khadira, mimosa catechu, of which the scholiast says the bolt of the axle is made, whilst the Sisampa Dalbergin sisu furnishes wood for the floor: these are still timber trees in common use.

এইবারে মন্তব্য করলে অসঙ্গত হবে না যে সমাজের নানা রকম প্রয়োজনে জন সাধারণের মধ্যে বিভিন্ন বৃত্তি প্রচলিত ছিল। ছুতোর

মিস্ত্রী রথ তৈরি করত, অস্ত্র নির্মাণ করত কামার, স্যাঁকরা অলঙ্কার তৈরি করত। কেনাবেচার জন্য নিষ্ক বা স্বর্ণমুদ্রা তৈরির ব্যবস্থাও ছিল। কাপড় বোনার কথাও আছে নানা জায়গায়।

দশম মণ্ডলের ১০৬ সূক্তে ভূতাংশ ঋষি বলছেন—

হে অশ্বীদ্বয়, আমাদের আহুতি অভিলাষ করছ তোমরা দুজনে,
যেমন করে বস্ত্র বয়ন করে তন্তুবায়,
তেমনি করেই বিস্তার করে দিচ্ছে আমাদের স্তব ॥ ১০।১০৬।১॥

দ্বিতীয় মণ্ডলের ৩ সূক্তে গৃৎসমদ ঋষি বলছেন—

বয়নকুশল দুই নারী যেমন গমনাগমন করে
পরস্পরের সাহায্যের জন্য,
তেমনি সাধুকর্মের ফল প্রদায়ী ঊষা ও নক্তরূপে অগ্নি
বয়ন করছেন বিস্তৃত তন্তু
পরস্পরকে আনুকূল্য করে যজ্ঞের রূপ নির্মাণের জন্য।
ফলপ্রদ ও উদক বিশিষ্ট তাঁরা ॥ ২।৩.৬ ॥

এই ঋক থেকেই জানা যায় যে সেকালে দুজন নারী টানা ও পোড়েন সঞ্চালন করে কাপড় বুনত। এই দেখে ঋষি কল্পনা করেছেন যে দিন ও রাত্রিও বয়নরত দুই নারীর মতো গমনাগমন ও পরস্পরের আনুকূল্য করে যজ্ঞের রূপ দিতেন।

গৃৎসমদ ঋষি দ্বিতীয় মণ্ডলের ৩৮ সূক্তেও বস্ত্রবয়নকারিনী নারীর উল্লেখ করেছেন—

রাত্রি পুনরায় বেষ্টন করেছেন আলোককে
বস্ত্রবয়নকারিণী রমণীর মতো ॥ ২।৩৮।৪ ॥

যষ্ঠ মণ্ডলের ৯ সূক্তে ভরদ্বাজ ঋষি বলছেন—

আমি জানিনা তন্তু বা ওতু,
সতত চেষ্টায় যে করে বস্ত্র বয়ন
আমি অবগত নই তার কিছুই।
ইহলোকে উপদেশ পেয়ে নিজের পিতার,
কার পুত্র বলতে পারে অন্য জগতের বক্তব্য ? ॥ ৬।৯।২ ॥

টানা সুতোকে তন্তু বলে এবং ওতু পোড়েন সুতো। ঋষি বলছেন যে টানা ও পোড়েন সুতো চালিয়ে কীভাবে কাপড় বুনতে হয় তা আমি জানি না। নিজের পিতার কাছে এক বৃত্তি শিখে অন্য বৃত্তির কথা কী ভাবে বলব! সায়ন বলেছেন যে এখানে তন্তু হল বৈদিক ছন্দ, ওতু যজুর্মন্ত্র এবং বস্ত্র হল যজ্ঞ। তাহলে এই ঋকের অর্থ—ছন্দ ও যজুর্মন্ত্র না জেনে যজ্ঞ করব কীভাবে! মানুষ যজ্ঞের রহস্য বলতে সমর্থ নয়।

একমাত্র সূর্য তা বলতে পারেন, কারণ তিনি তা নিজের পিতা অগ্নির নিকটে শিক্ষা করেছেন। যজ্ঞ ঋষিও দশম মণ্ডলের ১৩০ সূক্তের প্রথম দুটি ঋকে যজ্ঞকে বস্ত্রের সঙ্গে এবং মন্ত্রগুলিকে টানা ও পোড়েনের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

মেষের লোম দিয়ে পশমি কাপড় বোনার কথাও পাওয়া যায়। দশম মণ্ডলের ২৬ সূক্তে বিমদ ঋষি বলছেন—

গর্ভধারণের যোগ্য সুন্দর মূর্তি ছাগী ও ছাগল,
পূষা প্রভু এই সব পশুর।
তিনিই বয়ন করেন মেষলোমের বস্ত্র,
সেই বস্ত্র ধৌত করে দেন তিনিই ॥ ১০।২৬।৬ ॥

ছাগ পূষার বাহন। তাই বলা হয়েছে যে তিনিই মেষলোমের বস্ত্র বয়ন ও ধৌত করেন। যে বস্ত্র বয়ন করত, তাকে বলত বাসোবায়।

বৈদিক সমাজে যে চর্মকার ছিল এবং তারা চামড়া দিয়ে পাত্র তৈরি করত তা জানা যায় ষষ্ঠ মণ্ডলের ৪৮ সূক্ত থেকে। বৃহস্পতির পুত্র শংযু ঋষি বলছেন—

হে পূষা, তোমার বন্ধুতা যেন অবিচ্ছিন্ন থাকে সর্বক্ষণ,
ছিদ্রহীন দধিপূর্ণ দৃতির মতো ॥ ৬।৪৮।১৮ ॥

এই ঋক থেকেই জানা যায় যে সেকালে দই রাখবার জন্য চামড়ার পাত্রের ব্যবহার ছিল। শুধু দই নয়, অন্যান্য ঋক থেকেও জানা যায় যে চামড়ার পাত্রে সুরা ও সোমরসও রাখা হত। বহুল ব্যবহার ছিল চামড়ার পাত্রের।

কলসীর ব্যবহারও ছিল। দশম মণ্ডলের ২৫ সূক্তে বিমদ ঋষি বলছেন—

হে সোম, জল তোলবার জন্য
যেমন কূপের মধ্যে যায় কলস,
তেমনি তোমাতে যাচ্ছে আমাদের সমস্ত স্তব।
এই যজ্ঞকে তুমি ধারণ কর আমাদের প্রাণ রক্ষার জন্য।
ঘাটে যেমন পানপাত্র ধরে বারিপানাভিলাষী ব্যক্তি ॥ ১০।২৫।৪ ॥

কলস লোহার হওয়াই সম্ভব। মূলে অযস্ময় শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাণ ও খড়্গ যে লৌহ দিয়ে নির্মিত হত, ঋগ্বেদেই তা উল্লেখ আছে। ষষ্ঠ মণ্ডলের ৩ সূক্তে ভরদ্বাজ ঋষি বলেছেন—

যোদ্ধা যেমন শাণিত করে লৌহময় অস্ত্রের ধার,
তেমনি করেই নিজ দীপ্তি তীক্ষ্ণ করে শিখা ॥ ৬।৩।৫ ॥

এই মণ্ডলেরই ৪৭ সূক্তে ভরদ্বাজের অপত্য গর্গ ঋষিও বলছেন—

হে ইন্দ্র, তুমি সুখী কর আমাকে,
প্রসন্ন হও আমার জীবন বৃদ্ধি করতে।
বুদ্ধি আমার সুতীক্ষ্ণ কর লৌহময় খড়্গ ধারার মতো,
গ্রহণ কর আমি যা কিছু উচ্চারণ করছি
তোমাকে প্রসন্ন করবার জন্য।
দেবগণ যেন রক্ষা করেন আমাকে ।। ৬।৪৭।১০ ।।

কার্মার বা কর্মকার শব্দের ব্যবহার আছে ঋগ্বেদে। এই প্রসঙ্গে নবম মণ্ডলের ১১২ সূক্তের অনুবাদ দেওয়া হল। শিশু ঋষি পংক্তি ছন্দে এই সূক্তটি রচনা করেছেন—

হে সোম, এক প্রকার নয় সকল ব্যক্তির কার্য,
ভিন্ন ভিন্ন কার্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির,
কার্য নানাবিধ আমাদেরও।
দেখ, তক্ষ করে কাষ্ঠ তক্ষণ,
রোগের প্রার্থনা করে বৈদ্য,
স্তোতা চায় যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিকে।
অতএব তুমি ক্ষরিত হও ইন্দ্রের জন্য ।। ১ ।।
দেখ, শুষ্ক বৃক্ষ শাখা পক্ষীর পক্ষ
এবং শান দেবার জন্য উজ্জ্বল প্রস্তর,
কর্মকার বাণ তৈরি করে এদের সহযোগে।
তারপর অন্বেষণ করে ধনাঢ্য ব্যক্তি
সেই বাণ বিক্রয়ের জন্য।
অতএব, হে সোম, তুমি ক্ষরিত হও ইন্দ্রের জন্য ।। ২ ।।
দেখ, আমি স্তোত্রকারের পুত্র চিকিৎসক,
এবং কন্যা প্রস্তরের উপর যব ভর্জনকারিনী।
আমরা সকলেই কর্ম করছি ভিন্ন ভিন্ন।
গাভীরা যেমন বিচরণ করে গোষ্ঠে,
আমরাও তেমনি তোমার পরিচর্যা করছি ধনের কামনায়।
অতএব, হে সোম, ক্ষরিত হও ইন্দ্রের জন্য ।। ৩ ।।
ঘোটক যোজিত হতে চায় সুগঠন রথে
যাকে বহন করতে পারে সুন্দর ভাবে!
হাস্য পরিহাস কামনা করে নর্ম সচিবেরা,
পুরুষাঙ্গ প্রার্থনা করে রোমবিশিষ্ট দ্বিধাভিৎ,

এবং জলের কামনা করে ভেক।

অতএব, হে সোম, ক্ষরিত হও ইন্দ্রের জন্য ॥ ৯।১১২।৪ ॥

তক্ষ হল সূত্রধর। বৈদ্য ও স্তোতার কাজও এক রকমের বৃত্তি। স্তোত্র পাঠকরা যজ্ঞকর্তা ধরবার চেষ্টা করতেন। পাথরে শান দিয়ে কর্মকাররা কাঠ থেকে বাণ তৈরি করত। এই সূক্তে দেখা যাচ্ছে যে স্তোত্রকারের পুত্র ভিষক অর্থাৎ চিকিৎসক হয়েছেন এবং কন্যা যব ভাজার কাজ করছেন।

কর্মার শব্দেরও ব্যবহার আছে। বৃহস্পতি ঋষি বলছেন—

দেবতারা উৎপন্ন হবার আগে নির্মান করলেন
কর্মকারের মতো ব্রহ্মণস্পতি নামে দেবতা।
অবিদ্যমান থেকে উৎপন্ন হল বিদ্যমান বস্তু ॥ ১০।৭২।২ ॥

আগের কর্মারকে আধুনিক কালের কামার মনে হলেও পরের কর্মারকে কামার বলে মনে হয় না। ব্রহ্মণস্পতি কর্মারের মতো দেবতাদের নির্মাণ করলেন। মনে হয় এই কথায় দেবতার মূর্তি গড়ার কথা বলা হচ্ছে। মূর্তি পূজার প্রচলন তখনও হয় নি। তাই মনে হয় যে পুতুলের মতো মূর্তি গড়ার কথাই বলা হয়েছে। মূর্তি গড়াও একটি বৃত্তি ছিল সমাজে।

কাঠুরের বৃত্তিও যে ছিল তার প্রমাণ আছে ১।১৩০।৪ সূক্তে। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি বলছেন—

হে ইন্দ্র, ত্বষ্টা যেমন করে ছেদন করে বনের বৃক্ষকে
তুমিও তেমনি করে ছেদন করছ আমাদের শত্রুদের
আপন শক্তি তেজ ও শরীরের বলে বর্ধিত হয়ে,
ছেদন করছ যেন পরশু দিয়ে।

ত্বষ্টা বৃক্ষ ছেদক। আসবাব তৈরির কাঠের জন্য বৃক্ষ ছেদন করা হত বলে অনুমান করা হয়।

দ্রবি শব্দে স্বর্ণকার বোঝাত। ষষ্ঠ মণ্ডলের ৩ সূক্তে ভরদ্বাজ ঋষি বলছেন—

দ্রবি যেমন দ্রবীভূত করে ধাতু,
অগ্নিও তেমনি নিঃসৃত করছে নিজের জিহ্বা
কুঠারে কাঠ ভস্মসাৎ করার মতো ॥ ৬।৩।৪ ॥

ভারবহনও একটি বৃত্তি ছিল, তারা পণ্য দ্রব্য বহনে নিযুক্ত হত। এদের বলত ভারভৃৎ। এর উল্লেখ আছে ৮।৭৫।১২ ঋকে। অঙ্গিরার পুত্র বিরূপ ঋষি বলছেন—

ভারবাহী ব্যক্তির মতো
তুমি আমাদের পরিত্যাগ কোরো না সংগ্রামে,
তুমি জয় কর ধন,
এ ছিন্ন হচ্ছে শত্রু গণের সাথে ॥ ৮।৭৫।১২ ॥

স্বর্ণকারের সঙ্গে মাল্যকারেরও উল্লেখ আছে ৮।৪৭।১৫ ঋকে। আপ্ত্য ত্রিত ঋষি বলছেন—

হে স্বর্গের দুহিতা, যে দুঃস্বপ্ন আছে
আভরণকারীর বা মাল্যকারীর,
তা দূর হোক আপ্ত্য ত্রিতের নিকট থেকে।
উপদ্রব থাকে না তোমরা রক্ষা করলে,
তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ॥ ৮।৪৭।১৫ ॥

মালাকার বৃত্তি দেখে মনে হয় যে সমাজে মালার ব্যবহার ছিল বিলাস দ্রব্য রূপে।

আর একটি বৃত্তির কথা না বললে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মুনি ঋষিদের কথা ভাবতে গেলেই একটি জটাজুটধারী গুম্ফ শ্মশ্রু মণ্ডিত বৃদ্ধের মূর্তি চোখের সামনে যেন দেখতে পাই। শৈশব থেকেই এই রকমের ছবি দেখে আমাদের এই ধারনা বদ্ধমূল হয়েছে। তাহলে কি বৈদিক সমাজে নাপিতের বৃত্তি ছিল না? তবে রাজা ও অন্যান্য বীর পুরুষেরা কীভাবে দাড়ি কামাতেন বা চুল কাটতেন? এই প্রশ্নের উত্তর আছে দশম মণ্ডলের ১৪২ সূক্তে। জরিতা প্রভৃতি চার পক্ষীর একজন বলছেন—

তুমি যখন দগ্ধ করতে যাও উপরে ও নিম্নে স্থিত বসুদের,
তখন তোমরা পৃথক ভাবে যাও লুণ্ঠনকারী সৈন্যদের মতো।
বায়ু যখন বইতে থাকে তোমার পিছনে,
তখন তুমি মুণ্ডন করে দাও বিস্তর প্রদেশ,
যেমন করে নাপিত মুণ্ডন করে দেয় মানুষের শ্মশ্রু ॥ ৪ ॥

এটি অগ্নির স্তুতি। এতে লুণ্ঠনকারী সেনা ও শ্মশ্রু মুণ্ডনকারী নাপিতের উল্লেখ আছে। মূলে নাপিতকে বলা হয়েছে বপ্তা। এই বৃত্তিটি সমাজে প্রচলিত ছিল বলেই তার একটি নাম দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ মানুষ দাড়ি কামাতো এবং দাড়ি রাখত স্বেচ্ছায় একালের মতো।

এই ভাবে অনুসন্ধান বা আলোচনা করলে অসংশয়ে বলা যাবে যে প্রাচীন আর্য সমাজে মানুষের দরকারী সমস্ত দ্রব্য নির্মাণ ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রায় সমস্ত বৃত্তিই ছিল। কিন্তু সেই বৃত্তিধারী মানুষকে

সমাজে ভিন্ন চোখে দেখা হত না। সমাজে তাদের জন্য কোন বিশেষ স্থানও নির্দিষ্ট হয় নি। রাজা রাজ্য শাসন করতেন, যুদ্ধ করতেন সেনা বাহিনী নিয়ে। ঋষিরা যজ্ঞ করতেন, দেবতাদের নামে স্তব রচনা করতেন। জনসাধারণের জন্য কৃষিকার্য পশু পালন প্রভৃতি নানা রকমের বৃত্তি অনুযায়ী কোন বর্ণ নির্ধারিত থাকলে তার উল্লেখ থাকত ঋগ্বেদে। বৃত্তি অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে বহু পরবর্তী কালে। সেই সময়েই পুরুষ সূক্ত নামে অভিহিত একটি সূক্তে সমাজের এই চার বর্ণের কথা উল্লেখ করে ঋগ্বেদে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। দশম মণ্ডলের ৯০ সূক্তে নারায়ণ ঋষি পুরুষ দেবতার উদ্দেশে বলছেন—

> খণ্ড খণ্ড করা হল পুরুষকে, কয় খণ্ড করা হয়েছিল ?
> এর মুখ কী হল, দুই বাহু, উরু ও চরণ ?
> এর মুখ হল ব্রাহ্মণ, রাজন্য হল দুই বাহু,
> যা উরু ছিল তা বৈশ্য হল, দুই চরণ থেকে হল শূদ্র ।।১১-১২।।

পণ্ডিতরা প্রমাণ করেছেন যে এই পুরুষ সূক্তের ভাষা বৈদিক ভাষা নয়, ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত। তাই আমাদের মেনে নিতে হয় যে বৈদিক সমাজে কোন রকম বর্ণভেদ ছিল না। মানুষে মানুষে এই ভেদ সৃষ্টি হয়েছে অনেক পরবর্তী কালে এবং এর পরিণাম যে ভাল হয় নি তা সকলেই স্বীকার করেন।

সমাজে নারীর মর্যাদা কেমন ছিল

বৈদিক সমাজে নারীর মর্যাদা কেমন ছিল, আজও আমরা তা কল্পনা করতে পারি না। বিগত শতাব্দীতে হিন্দু নারীর মর্মান্তিক নিপীড়নের কাহিনী আমরা জানি। অন্তঃপুরে বন্দিনী অশিক্ষিতা অসহায় নারী। সম্যক বিচার বুদ্ধি হবার আগেই তাদের বিবাহ হত যে কোন বয়সের পুরুষের সঙ্গে। স্বামীর মৃত্যুর পর সহমরণে যেতে হত। শাস্ত্রের বিধান, আগুনে পুড়ে মরতে হবে। এই সব বিধানের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এতো এই সেদিনের কথা। ইংরেজের সহায়তায় সমাজ সংস্কার শুরু হয়। সম্প্রতি এই সংস্কার সম্পূর্ণ হয়েছে স্বাধীন ভারতে। কিন্তু আজও কি আমরা বৈদিক যুগের সেই সুস্থ ও সুন্দর দাম্পত্য জীবন ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি? বেদের আলোচনায় এই প্রসঙ্গটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঋগ্বেদের নানা স্থানে ছড়ানো কিছু ঋক পড়লেই এই সত্যটি পরিস্ফুট হবে।

প্রথমে তৃতীয় মণ্ডলের ৫৩ সূক্তের দুটি ঋক পড়া যাক। বিশ্বামিত্র ঋষি বলছেন—

> হে মঘবন, জায়াই গৃহ, জায়াই জন্ম দেয় সন্তানের।
> আমরা যে কোন সময়ে অভিষুত করব সোম,
> সে সময়েই যেন তোমার নিকটে যায় দূত অগ্নি ॥ ৪ ॥
> হে মঘবন, স্বগৃহে যাও, অথবা এস এই যজ্ঞে,
> হে ভ্রাতা, তোমার প্রয়োজন আছে উভয় জায়গাতেই।
> মহৎ রথোপরি অবস্থান কর গৃহে যাবার জন্য,
> অথবা এই যজ্ঞে থাকো হ্রেস্বারবকারী অশ্ব বিমুক্ত করে ॥ ৫ ॥

পড়লেই বোঝা যাবে যে গৃহ এবং যজ্ঞকে সমান সম্মান দেওয়া হয়েছে। গৃহে জায়া আছে এবং যজ্ঞে আছে সোম।

গৃহিণীর কথাও সমাদরে বলেছেন কক্ষীবান ঋষি প্রথম মণ্ডলের ১২৪ সূক্তে। ঊষা দেবতার উদ্দেশে তিনি বলছেন—

> সূর্য যেমন আবিষ্কার করেন নিজের বক্ষ,
> লোধা ঋষি যেমন আবিষ্কার করেছিলেন নিজের প্রিয় বস্তু,
> তেমনি ঊষাও আবিষ্কার করেছেন নিজেকে।
> গৃহিণী যেমন সবাইকে জাগান নিজে জাগবার পরে,

ঊষাও তেমনি জাগরিত করেন জগতের সবাইকে।
অভিসারিকাদের মধ্যে ঊষাই আসেন সবার চেয়ে বেশি ॥

শিশু বা বালিকা কন্যার বিবাহ দেওয়া হত না। যৌবনে পদার্পণ করবার পরেই কন্যার বিবাহ হত এবং এই বিবাহে নিজের পতি মনোনয়নের অধিকার থাকত কন্যার। প্রথম মণ্ডলের ৬২ সূক্তে গোতমের পুত্র লোধা ঋষি ইন্দ্র দেবতার স্তব করছেন—

হে দর্শণীয় ইন্দ্র, তুমি স্তুত হও মন্ত্র ও নমস্কারে।
যে মেধাবীরা কামনা করে সনাতন কর্ম বা ধন,
তারা তোমাকে পায় বহু প্রয়াসে।
হে বলবান ইন্দ্র, তোমাকে স্পর্শ করে স্তুতি,
যেমন করে আকাঙ্ক্ষিনী পত্নী পায় আকাঙ্ক্ষী পতিকে ॥ ১১ ॥

পুরাণে আমরা রাজকন্যাদের স্বয়ম্বরা দেখেছি। এই প্রথা বৈদিক যুগের। সাধারণ ঘরের কন্যারাও যে মনোমত পতি নির্বাচন করত, তার আরও উদাহরণ আছে ঋগ্বেদে। দশম মণ্ডলের ২৭ সূক্তে বসুক্র ঋষি বলছেন—

কত স্ত্রীলোক আছে যে শুধু অর্থে প্রীত হয়ে
অনুরক্ত হয় নারী সহবাসে অভিলাষী পুরুষের।
যে কন্যা ভদ্র, সুগঠিত যার শরীর,
সে বরণ করে পতিত্বে
অনেকের মধ্য থেকে আপনার মনোমত প্রিয় পাত্রকে ॥ ১২ ॥

একটি বিবাহের সুন্দর বর্ণনা আছে দশম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তে। এই বিবাহের একটা ভূমিকা আছে। প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তে কক্ষীবান ঋষি বলছেন—

হে অশ্বীদ্বয়, তোমাদের ছিল শীঘ্রগামী অশ্ব,
তারই জন্য বিজিত হয়ে সূর্যের দুহিতা উঠলেন তোমাদের রথে।
কার্ষ্মের মতো সেই রথ,
সমস্ত দেবতা একে অনুমোদন করলেন হৃদয়ের সাথে ॥ ১৭ ॥

এই ঋকের অর্থ বুঝতে হলে কার্ষ্ম শব্দটির অর্থ জানতে হবে। ঘোড়দৌড়ের সময়ে যে নির্দিষ্ট কাষ্ঠ খণ্ডের নিকটে প্রথমে পেঁছিতে পারলে জয় হত, তাকেই কার্ষ্ম বলত। সূর্যা সূর্যের দুহিতা। সূর্য চেয়েছিলেন সোমরাজার হাতে কন্যা সম্প্রদান করতে। কিন্তু সমস্ত দেবতারাই সূর্যাকে চেয়েছিলেন এবং তাঁরা পরস্পর বলাবলি করে ঠিক করেছিলেন যে সকলে আদিত্য পর্যন্ত দৌড়বেন এবং তাঁদের মধ্যে যিনি

জয় লাভ করবেন, সূর্যা তাঁরই হবেন। অশ্বীদ্বয় জয় লাভ করেছিলেন এবং সূর্যা তাঁদের রথেই আরোহন করলেন।

দশ মন্ডলের ৮৫ সূক্তে সূর্যা ঋষি এই বিবাহের বর্ণনা দিচ্ছেন। সমগ্র ঋগ্বেদে বিবাহের এই একটি বর্ণনাই আছে। বিবাহের বিস্তারিত অনুষ্ঠান জানতে হলে অথর্ববেদের চতুর্দশ কান্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় অনুবাক পড়তে হবে। এতেও সূর্যার বিবাহ প্রসঙ্গ দিয়ে সূক্তের আরম্ভ হয়েছে।

সূর্যার বিবাহে তার সহচরী হয়েছিল
রৈভী নামের ঋকগুলি,
আর নরাশংসী নামের ঋকগুলি হয়েছিল দাসী ।। ৬ ।।
তাঁর সঙ্গে পতিগৃহে চলল চৈতন্য স্বরূপ উপবর্হন,
চক্ষু তাঁর অভ্যঞ্জন, দ্যুলোক ও ভূলোক তাঁর কেশ ।। ৭ ।।
স্তব হল রথের প্রতিধি, অভ্যন্তর হল কুরীর নামে ছন্দ,
অশ্বীদ্বয় সূর্যার বর হলেন,
আর অগ্নি হলেন অগ্রগামী দূত ।। ৮ ।।
সূর্যা পতি প্রার্থনা করেছিলেন মনে মনে।
সোম ছিলেন তাঁর বিবাহার্থী,
কিন্তু অশ্বীদ্বয়ই গৃহীত হলেন বর রূপে ।। ৯ ।।
মন তাঁর শকট হল, শকটবাহী হল দুই শুকতারা,
আর উপরের আচ্ছাদন হল আকাশ।
সূর্যা চললেন পতি গৃহে ।। ১০ ।।
ঋক ও সামে বর্ণিত দুই বৃষ বয়ে নিয়ে গেল তাঁর শকট।
হে সূর্যা, তোমার রথচক্র হল দুই কর্ণ,
সে রথের পথ আকাশে যাতায়াত করে ঐ পথে ।। ১১ ।।
যাবার সময় উজ্জ্বল হল রথচক্র,
বিস্তারিত অক্ষ হল স্থাপিত।
সূর্যা উদ্যত হয়ে পতি গৃহে যেতে
আরোহণ করলেন মনের শকটে ।। ১২ ।।
সূর্যাকে যে উপঢৌকন দিয়েছিলেন সূর্য,
তা চলল আগে।
গাভীদের সে তাড়িয়ে নিয়ে যায় মঘার উদয়কালে ।। ১৩ ।।
হে অশ্বীদ্বয়, তোমরা যখন গ্রহণ করলে সূর্যাকে,
দেবতারা অনুমোদন করলেন তা।

পূষা, তোমাদের পুত্র হয়ে বরণ করলেন
তোমাদের কন্যার বর স্বরূপ ॥ ১৪ ॥
তোমরা যখন বর হয়ে বরণ করতে গেলে সূর্যাকে,
তখন কোথায় ছিল তোমাদের একখানি চক্র ?
পথ জানবার জন্য কোথায় দাঁড়িয়েছিলে তোমরা ? ॥ ১৫ ॥
স্তোতারা জানেন যে আছে এমন দুখানি রথ
যা কালে কালে চলে এগিয়ে ।
তা জানেন বিদ্বানরা ॥ ১৬ ॥
সূর্যা ও দেবগণ, মিত্র ও বরুণ, নমস্কার এঁদের ।
এঁরা করেন প্রাণীর শুভ চিন্তা ॥ ১৭ ॥
ক্ষমতার বলে দুটি শিশু
বিচরণ করেন পূর্ব ও পশ্চিমে,
যজ্ঞে যান খেলতে খেলতে ।
একজন ভুবনকে দেখেন ঋতু বদল করে,
আর একজন জন্ম নেন বার বার
এই ঋতু বিধান করতে ॥ ১৮ ॥
দিনের পতাকা সূর্য আসেন প্রত্যহ
প্রভাতের আগে নূতন হয়ে,
ব্যবস্থা করেন দেবতাদের যজ্ঞ ভাগ দেবার,
আর চন্দ্র বিতরণ করেন দীর্ঘ আয়ু ॥ ১৯ ॥
ওগো সূর্যা, তোমার পতি গৃহে যাবার পথে আছে
সুন্দর পলাশ ও শাল্মলী গাছ,
এর সুন্দর চক্র, এর সুখের আবাস ।
তুমি পতি গৃহে যাও প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে ॥ ২০ ॥
হে বিশ্বাবসু, ওঠো এখান থেকে,
বিবাহ হয়ে গেছে এই কন্যার ।
তোমাকে স্তব করি, করি নমস্কার ।
যে কন্যা বিবাহের লক্ষণযুক্ত হয়ে আছে তার পিতার গৃহে,
তার নিকটে গিয়ে অবগত হও তার বিষয়ে ॥ ২১ ॥
হে বিশ্বাবসু, ওঠো এখান থেকে,
তোমায় পূজা করি নমস্কারে ।
যাও তুমি নিতম্ববতী কুমারী কন্যার কাছে,
তাকে পত্নী করে কর স্বামী সংসর্গিনী ॥ ২২ ॥

যে পথ দিয়ে বন্ধুরা যান বিবাহের জন্য কন্যা প্রার্থনায়,
সে পথ যেন হয় সরল ও নিষ্কণ্টক।
আমাদের নিয়ে চলুন ভালো করে ভগ ও অর্যমা ॥ ২৩ ॥
পিতা। ওগো কন্যা, যে বন্ধনে তোমাকে বন্ধ করেছিলেন সুন্দর সূর্য,
আজ তোমাকে মোচন করছি বরুণের সেই বন্ধন থেকে।
তোমাকে স্থাপন করছি পতির সঙ্গে সত্যের আধারে,
সৎকর্মের আবাসে নিরুপদ্রবে ॥ ২৪ ॥
ব্রহ্মা। পিতৃকুল থেকে মোচন করে দিলাম এই কন্যাকে,
অন্য স্থান থেকে নয়।
তাকে গ্রথিত করলাম পতির কুলে।
হে ইন্দ্র, এ যেন হয় পুত্রবতী ও সৌভাগ্যবতী ॥ ২৫ ॥
পূষা তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যান হাত ধরে,
অশ্বীদ্বয় তোমাকে বহন করুন রথে।
গৃহের কর্ত্রী হয়ে তুমি প্রভুত্ব কর সবার উপরে ॥ ২৬ ॥
সেখানে তোমার প্রীতি লাভ হোক সন্তানের জন্মে,
গৃহ কাজ কর সাবধান হয়ে।
স্বামীর সঙ্গে সম্মিলীত কর আপন শরীর।
সে গৃহে প্রভুত্ব কর চিরকাল ॥ ২৭ ॥
নীল ও লোহিত বর্ণ দেখে মনে হচ্ছে কৃত্যার আক্রমণ।
বৃদ্ধি হচ্ছে এই কন্যার জ্ঞাতি,
আর স্বামী বদ্ধ হচ্ছে নানা বন্ধনে ॥ ২৮ ॥
মলিন বসন ত্যাগ করে স্তোতাদের দান কর ধন।
চলে গেছে কৃত্যা।
পত্নী এক হচ্ছে পতির সঙ্গে ॥ ২৯ ॥
পতি যদি প্রয়াস করে
বধূর বস্ত্রে আপন অঙ্গ আচ্ছাদনের,
তাহলেই আক্রমণ করে এই কৃত্যা।
উজ্জ্বল দেহও হয় শ্রীভ্রষ্ট ॥ ৩০ ॥
যারা বরের নিকট থেকে সরিয়ে নিতে আসে উপঢৌকন।
দেবতারা বিফল করুন তাদের ॥ ৩১ ॥
যারা আসে পতি পত্নীর বিপক্ষতাচরণ করতে,
বিনষ্ট হোক তারা।
তারা কাটিয়ে উঠুক সুবিধায় অসুবিধা,
শত্রুরা পালাক দূরে ॥ ৩২ ॥

এ বধূ সুলক্ষণা, তোমরা এসে দেখ একে।
সৌভাগ্য ও স্বামীর প্রিয় পাত্রী হোক,
করে যাও এই আশীর্বাদ। ৩৩ ॥
দূষিত মলিন ও বিষময় এই বস্ত্র,
এ অগ্রাহ্য, যোগ্য নয় ব্যবহারের।
ব্রহ্মা নামের বিদ্বান ঋত্বিক
পেতে পারে বধূর বস্ত্র ॥ ৩৪ ॥
দেখ এই সূর্যার মূর্তি,
চারিদিকে ছিন্ন এর বস্ত্র।
একে শোধন বা নূতন করতে পারেন
ব্রহ্মা নামের ঋত্বিক ॥ ৩৫ ॥
স্বামী। তুমি সৌভাগ্যবতী হবে বলে
আমি ধরছি তোমার হাত।
আমাকে পতি পেয়ে বৃদ্ধ হও তুমি,
এই প্রার্থনা করি।
ভগ ও অর্যমা, আর বদান্য সবিতা
তোমাকে দিয়েছেন আমার গৃহকাজের জন্য ॥ ৩৬ ॥
হে পূষা, যে নারীর গর্ভে মানুষ বপন করে বীজ,
তুমি তাকে পাঠাও কল্যাণ-সম্পন্ন করে।
কামে বশ হয়ে সে সমর্পণ করে নিজের দেহ,
আলিঙ্গনও করে কামে বশ হয়ে ॥ ৩৭ ॥
হে অগ্নি, তুমি আগে নিয়ে যাও সূর্যাকে
উপঢৌকনের সঙ্গে,
বনিতাকে তুমি সমর্পণ কর
সন্তানের সঙ্গে পতিকে ॥ ৩৮ ॥
অগ্নি বনিতাকে লাবণ্য দিলেন পরমায়ু দিয়ে।
পতি এর জীবিত থাকবে শত বৎসর ॥ ৩৯ ॥
প্রথমে সোম তোমাকে বিবাহ করে, তারপর গন্ধর্ব,
অগ্নি তোমার তৃতীয় পতি, আর চতুর্থ পতি মানুষ ॥ ৪০ ॥
সোম সে নারী গন্ধর্বকে দিলেন, গন্ধর্ব দিলেন অগ্নিকে।
ধনপুত্র সমেত এ নারী আমাকে দিলেন অগ্নি ॥ ৪১ ॥
(বর ও বধূর প্রতি)
ওগো বর বধূ, পৃথক না হয়ে এখানেই থাক তোমরা,
খাও আর আহ্লাদে বিহার কর পুত্র ও পৌত্রদের সাথে ॥ ৪২ ॥

(বধূর প্রতি)

আমাদের সন্তান দিল প্রজাপতি,
অর্যমা মিলিত রাখুন আমাদের,
ওগো বধূ, তুমি থাকো কল্যাণী হয়ে,
মঙ্গল কর দাসদাসী ও পশুদের ॥ ৪৩ ॥
তোমার চক্ষু হোক দোষ শূন্য,
তুমি হও পতির কল্যাণকারী,
প্রফুল্ল হোক তোমার মন, উজ্জ্বল হোক লাবণ্য।
মা হও বীর পুত্রের, আর ভক্ত হও দেবতাদের ॥ ৪৪ ॥

(ইন্দ্রের প্রতি)

হে বারিদেব ইন্দ্র, তুমি এই নারীকে দাও পুত্র,
দাও সৌভাগ্য।
দশ পুত্র দিয়ে এর পতিকে একাদশ কর ॥ ৪৫ ॥

(বধূর প্রতি)

তুমি সম্রাজ্ঞী হও শ্বশুর শ্বশ্রু ননদ ও দেবরের ॥ ৪৬ ॥

(বর ও বধূ)

দেবতারা মিলিত করুন আমাদের উভয়ের হৃদয়।
আমাদের উভয়কে সংযুক্ত করুন বায়ু ধাতা ও বাগ্দেবী ॥ ৪৭ ॥

২১ ঋকে দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বাবসু বিবাহের অধিষ্ঠাতা দেবতা এবং ২১ ও ২২ ঋক পড়লেই মনে হয় যে বিবাহের লক্ষণ প্রাপ্ত হলেই কন্যার বিবাহ দেবার বিধান ছিল। এখান থেকেই বিবাহের বিবরণ ও মন্ত্র পাওয়া যায়। ৩৪ থেকে কয়েকটি ঋকে বিবাহের আচার সম্বন্ধে বলা হয়েছে, বিবাহের বস্ত্র এখন নাপিতে পায়, সে সময়ে ঋত্বিকের প্রাপ্য ছিল। ৩৯ ঋকে শত বৎসর আয়ুর কথা বলা হয়েছে। সেকালে এটাই বোধহয় মানুষের আয়ুর সীমা ছিল। তাই ঋগ্বেদের নানা স্থানে শত বৎসরের উল্লেখ আছে। ৪১ ঋকে যা বলা হয়েছে তা বোধহয় কতগুলি গুণের কথা। সোম লাবণ্যের প্রতীক, গন্ধর্ব শিল্পানুরাগের এবং অগ্নি সত্যবাদীতার। এই জন্যই বোধহয় কল্পনা করা হত যে বিবাহের পূর্বে কন্যাকে সোম গন্ধর্ব ও অগ্নির নিকটে সমর্পণ করে পরে তার বিবাহ কার্য সম্পন্ন করা হচ্ছে। ৪৬ ঋক পড়ে মনে হয় যে সমাজে তখন একান্নবর্তী পরিবার ছিল।

১৩ ঋকে দেখা যায় যে বিবাহের সময় কন্যাকে উপঢৌকন বা যৌতুক দেবারও বিধি ছিল। সূর্য তাঁর কন্যাকে তা দিয়েছিলেন পতি গৃহে

পাঠাবার সময়। বসনে ভূষণে সজ্জিত করে কন্যা দান করতে হত। অন্যত্রও এই রকমের উল্লেখ আছে। নবম মণ্ডলের ৪৬ ঋকে অযাস্য ঋষি বলছেন—

নববধূ যেমন স্বামীর নিকটে যায়
পিতার প্রদত্ত অলঙ্কারে সুশোভিত হয়ে,
তেমনি করেই সোম যাচ্ছেন বায়ুর দিকে ॥ ৯।৪৬।২ ॥

দশম মণ্ডলের ৩৯ সূক্তেও এই রকমের কথা আছে। ঘোষা নামের নারী ঋষি বলছেন—

যেমন করে রথ নির্মাণ করে ভৃগু সন্তানেরা,
তেমনি করেই, হে অশ্বীদ্বয়,
আমি এই স্তব রচনা করলাম তোমাদের জন্য।
পিতা যেমন বসনে ভূষণে কন্যাকে অলঙ্কৃত করেন
জামাতাকে সম্প্রদানের সময়,
আমিও তেমনি অলঙ্কৃত করছি এই স্তবকে।
আমাদের পুত্র পৌত্র যেন প্রতিষ্ঠিত থাকে নিত্যকাল ॥ ১৪ ॥

বিবাহের সময় বরও যে সাজসজ্জা করত, সে কথারও উল্লেখ আছে। পঞ্চম মণ্ডলের ৬০ সূক্তে শ্যাবাশ্ব ঋষি বলছেন—

ঐশ্বর্যশালী বর যেমন নিজের দেহ ভূষিত করে
সুবর্ণময় অলঙ্কার ও চন্দনে,
তেমনি বলশালী মরুৎরাও আয়োজন করছেন
রথের উপরে দেহের শোভা সম্পাদনের ॥ ৫।৬০।৪ ॥

মূলে অলঙ্কারের সঙ্গে স্বধাভিঃ শব্দ আছে। সায়ন তার অর্থ উদক করলেও অনেকে এর অর্থ চন্দনাদি অঙ্গরাগ মনে করেন। বিবাহের সময়ে বর সোনার অলঙ্কার পরে ও চন্দনাদি দিয়ে অঙ্গ সজ্জা করবেন, এটাই সম্ভব।

সূর্যার বিবাহের বর্ণনা থেকে আরও একটি সামাজিক রীতির কথা জানা যায়। সূর্যা বিবাহ করেছিলেন অশ্বীদ্বয়কে অর্থাৎ অশ্বিনীকুমার নামে দুই জন পুরুষকে। মহাভারতের কালে আমরা দ্রৌপদীরও পাঁচজন স্বামীর কথা জানি। ঋগ্বেদের কাহিনী থেকেই অনুমান করা চলে যে নারীর বহুবিবাহ সেই সময়েও প্রচলিত ছিল এবং নিন্দিত ছিল না। তা থাকলে সে কথার উল্লেখ থাকত কোনখানে। বরং দেখতে পাওয়া যায় যে অষ্টম মণ্ডলের ২৯ সূক্তে মরীচির পুত্র কশ্যপ অথবা বৈবস্বত মনু ঋষি বলছেন—

দুই জন অশ্বী বাস করেন
এক স্ত্রীর সঙ্গে নিবাসী পুরুষের মতো,
আর সঞ্চরণ করেন অশ্বের দ্বারা ॥ ৮।২৯।৮ ॥

পুরুষের বহু বিবাহও যে প্রচলিত ছিল তা বলা বাহুল্য। নানা স্থানে এই বিবাহের উল্লেখ আছে। দশম মণ্ডলের ১৫৯ সূক্তে শচী ঋষি শচী দেবতার উদ্দেশে বলছেন—

এই যে উদয় হয়েছেন সূর্য,
এ যেন আমার সৌভাগ্যেরই উদয়।
আমি বুঝেছি, সপত্নীরা পরাস্ত হয়েছেন আমার নিকটে
স্বামীকেও বশ করেছি আমি ॥ ১ ॥
আমিই কেতু, আমিই মস্তক,
প্রবল হয়ে আমিই শুনি স্বামীর মিষ্ট কথা।
আমার কাজই অনুমোদন করেন সবার উপরে জেনে।
স্বামী চলেন আমার মতেই ॥ ২ ॥
পুত্ররা আমার শত্রুনিধনকারী,
আমার কন্যাই শ্রেষ্ঠ শোভায় শোভিত।
সকলকে জয় করি আমি,
স্বামীর নিকটে আদরণীয় আমারই নাম ॥ ৩ ॥
যে যজ্ঞ করে শ্রেষ্ঠ ও বলবান হয়েছেন ইন্দ্র,
হে দেবগণ, তাই করেছি আমি।
তাতেই নষ্ট হয়েছে আমার সকল শত্রু ॥ ৪ ॥
জীবিত থাকে না আমার শত্রু,
আমি জয় করি, পরাস্ত করি, বধ করি আমার শত্রুদের।
অন্যে যেমন হরণ করে অস্থিরমতির সম্পত্তি,
তেমনি করেই আমি খণ্ডন করেছি অন্য নারীদের তেজ ॥ ৫ ॥
আমি জয় করেছি সকল সপত্নীদের,
পরাস্ত করেছি তাদের।
সেই জন্যই আমি প্রভুত্ব করি বীরের উপর,
প্রভুত্ব করি পরিবার বর্গের উপরেও ॥ ১০।১৫৯।৬ ॥

এই সূক্তটি সপত্নীর উপরে প্রভুত্ব লাভ করবার মন্ত্র। শচীকে এই সূক্তের দেবতা ও ঋষি বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সূক্তটি ইন্দ্রাণী ঋষির রচিত বলে মনে করা হয়। অবশ্য সূক্তের কোনখানে তার কোনও নিদর্শন নেই। অনুমান করা হয় যে দশম মণ্ডলের অপেক্ষাকৃত

আধুনিক সূক্তগুলি যাতে লোকে অশ্রদ্ধা না করে সেই জন্যই অনেক ক্ষেত্রে ঋষির জায়গায় দেবতাদের নাম বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ইন্দ্রানী ঋষির রচিত দশম মন্ডলের ১৪৫ সূক্তের অনুবাদ আগেই দেওয়া হয়েছে। সেখানে দেবতার নাম সপত্নী পীড়ন বা সপত্নী বাধন অর্থাৎ যে দেবতা সপত্নী পীড়ন করেন। এই সূক্তটি পড়লেই বোঝা যায় যে সেকালে বিবাহিত নারীরা সপত্নীর অত্যাচারে পীড়িত হয়ে দেবতার নিকটে সপত্নীকে দূর করে দেবার প্রার্থনা করতেন এবং স্বামীর প্রিয় হবার জন্য মাটি খুঁড়ে ওষধি বার করে স্বামীর উপাধানের নিচে রাখতেন স্বামীকে বশ করবার উদ্দেশে। ইন্দ্রানী ঋষি নিজেও নারী এবং এই দুঃখ হৃদয়ঙ্গম করতেন বলেই নারীর বেদনা তাঁর রচনায় রূপ দিতে পেরেছেন। দশম মণ্ডলের ১৫৯ সূক্তটি ১৪৫ সূক্তের পরিপূরক এবং তাতে তাঁর জয়ের আনন্দই সূচিত হচ্ছে।

সপ্তম মণ্ডলের ১৮ সূক্তে বসিষ্ঠ ঋষি বলছেন—

হে ইন্দ্র, তুমি জায়াদের সঙ্গে বাস কর
রাজার মতো দীপ্তি নিয়ে ॥ ৭।১৮।২ ॥

স্ত্রী পুরুষের বহু বিবাহ প্রচলিত থাকলেও সমাজে বিবাহিত স্ত্রীর সম্মান কিছুমাত্র কম ছিল না। স্ত্রী স্বামীর সহধর্মিনী। এই কথাটা একালে অনেক স্থানেই অর্থহীন হলেও সেকালে খুবই সত্য ছিল। স্ত্রী ব্যতীত পুরুষের ধর্ম কাজ হত না। যজ্ঞই তখন একমাত্র ধর্ম কাজ বলে গণ্য হত। সেই যজ্ঞ করতে হত স্বামী স্ত্রীকে একসঙ্গে। একা যজ্ঞ সম্পূর্ণ হত না। ঋগ্বেদের নানা স্থানে দেখা যায় যে স্ত্রী পুরুষ একত্র মিলিত হয়ে যজ্ঞ সম্পন্ন করছেন। প্রথম মণ্ডলের ১৩১ সূক্তে দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি বলছেন—

হে ইন্দ্র, তোমার তৃপ্তির অভিলাষে
তোমার সেবক ও পাপদ্বেষী যজমান দম্পতি
অধিক পরিমানে হব্য দান করছে তোমার উদ্দেশে।
বহু গোধন লাভের জন্য বিস্তার করছে যজ্ঞ।
তারা গোধন চায়, আর উৎসুক স্বর্গে যাবার জন্য।
তুমি প্রদান কর তাদের অভীষ্ট বর ॥ ১।১৩১।৩ ॥

প্রথম মণ্ডলের ১৭৩ সূক্তে অগস্ত্য ঋষি বলছেন—

হব্যপ্রদায়ী যজমান অধ্বর্যুদের সাথে অর্চনা করেন
ইন্দ্রকে স্বপ্রদত্ত হব্য দ্বারা,
যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হবেন ইন্দ্র
তৃষিত মৃগের ন্যায় দ্রুত বেগে।

হে উগ্র ইন্দ্র, স্ত্রী পুরুষে নিষ্পন্ন করছেন যজ্ঞ
মর্ত্য হোতা স্তোত্রাভিলাষী দেবতাদের স্তব করে ॥ ১।১৭৩।২ ॥

পঞ্চম মণ্ডলের ৪৩ সূক্তে অত্রি ঋষিও প্রার্থনা করছেন—

হে অগ্নি, বলশালী তুমি।
তোমাকে প্রদান করছে প্রচুর হব্য
একত্রে ধর্মকর্মে জীর্ণ হয়ে পরিণীত দম্পতি।
আমি যেন কৃতার্থ হই সমস্ত দেবতাকে আহ্বান করে।
তাঁরা যেন ধারণ না করেন আমাদের প্রতি বিরুদ্ধ বুদ্ধি।

এই মণ্ডলেরই ৩ সূক্তে অত্রি বংশীয় বসুশ্রুত ঋষি বলছেন—

তুমি অর্যমা হও কন্যাগণের পক্ষে।
হে হব্যবান অগ্নি, তুমি ধারণ কর গোপনীয় নাম।
যখন তুমি একান্তঃকরণ করে দাও দম্পতিকে,
তখন তারা গব্য দ্বার সিক্ত করে তোমাকে বন্ধুর মতো ॥ ২ ॥

অষ্টম মণ্ডলের ৩১ সূক্তে বৈবস্বত মনু ঋষি বলছেন—

হে দেবগণ, এক মনে অভিষব করে যে দম্পতি,
করে সোম শোধন ও মিশ্রণ,
তারা লাভ করে ভোজনযোগ্য অন্নাদি,
যজ্ঞে উপস্থিত হয় মিলিত হয়ে,
অন্নের জন্য তারা যায় না কোথাও। ৫-৬ ॥
তারা আলাপ করে না দেবগণকে দেব বলে,
ইচ্ছা করে না তোমাদের অনুগ্রহ নিবারণ করতে,,
তোমাদের পরিচর্যা করে মহা অন্নে। ৭ ॥
তারা উভয়েই লাভ করে পূর্ণ আয়ু
পুত্রবিশিষ্ট, কুমার বিশিষ্ট ও স্বর্ণ ভূষিত হয়ে ॥ ৮ ॥
দেবগণ কামনা করেন
প্রিয় যজ্ঞ বিশিষ্ট এই দম্পতির স্তুতি,
এঁরা দেবগণকে প্রদান করেন সুখপ্রদ অন্ন ॥ ৮।৩১।৯ ॥

এই নিয়ম শুধু মানুষের জন্যই নয়, দেবতাদের জন্যও এই নিয়ম ছিল। প্রথম মণ্ডলের ৭২ সূক্তে পরাশর ঋষি বলছেন—

হে অগ্নি, তোমাকে সম্যক জ্ঞাত হয়ে উপবিষ্ট হলেন দেবতারা,
পত্নীদের সাথে পূজা করলেন সম্মুখস্থ জানুযুক্ত অগ্নির।
পরে সুহৃৎ অগ্নিকে দেখে তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে
দেবতারা যজ্ঞ করলেন নিজেদের শরীর শোষণ করে ॥ ১।৭২।৫ ॥

সন্তানের জন্ম দেয় বলে নারী জায়া, স্বামীর ধর্মজীবনের সঙ্গী

বলে সহধর্মিনী এবং পতির সঙ্গে মিলে যজ্ঞ করেন বলে পত্নী। নারীর একা যজ্ঞ করার অধিকারও ছিল। চতুর্থ মণ্ডলের ৪২ সূক্তে ত্রসদস্যু ঋষি বলছেন—

হে বরুণ, সমস্ত প্রাণীই জানে তোমাকে।
হে স্তোতা, স্তব কর বরুণকে।
হে ইন্দ্র, তুমি বিখ্যাত আছ শত্রুগণকে বধ করেছ বলে।
তুমি উন্মুক্ত করেছ বন্ধ সিন্ধুগণকে ॥ ৭ ॥
দুর্গহের পুত্র বন্দী হলে এদেশের পিতা হয়েছিলেন সপ্তঋষি।
তাঁরা যজ্ঞ করে লাভ করেছিলেন
পুরুকুৎসের স্ত্রীর জন্য ত্রসদস্যুকে।
ইন্দ্রের মতো শত্রু বিনাশক ত্রসদসু অর্ধদেব ॥ ৮ ॥
হে ইন্দ্র ও বরুণ, পুরুকুৎসের পত্নী
তোমাদের প্রীত করেছিলেন হব্য ও স্তুতি দ্বারা ॥ ৪।৪২।৯ ॥

এর থেকেই জানা যাচ্ছে যে দুর্গহ রাজার পুত্র পুরুকুৎস কারারুদ্ধ হলে তাঁর রাণী অরাজক রাজ্য দেখে পুত্রলাভের জন্য স্বেচ্ছায় সমাগত সপ্তর্ষির পূজা করেছিলেন। তাঁরা প্রীত হয়ে রাণীকে ইন্দ্র ও বরুণের উদ্দেশে বিশেষরূপে যজ্ঞ করতে বলেন। রাণী একাই ইন্দ্র ও বরুণের যজ্ঞ করে ত্রসদস্যুকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন। এই ঘটনা থেকেই জানা যায় সস্ত্রীক যজ্ঞ করার বিধান থাকলেও প্রয়োজন হলে পুরুষ বা নারী একাকীও যজ্ঞ করতে পারতেন।

শুধু যজ্ঞ নয়, পুরুষের মতো নারীও অপরের যজ্ঞে ঋত্বিক হবার অধিকারী ছিলেন। পঞ্চম মণ্ডলের ২৮ সূক্তে অত্রি গোত্রজা বিশ্ববারা নামে একজন নারী ঋষি অগ্নি দেবতার উদ্দেশ্যে স্তব করছেন—

অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে দীপ্তি বিস্তার করেন আকাশে,
বিস্তৃতভাবে প্রদীপ্ত হন ঊষার সম্মুখে।
পূর্বাভিমুখী হয়ে বিশ্ববারা অগ্নির দিকে যাচ্ছে
দেবতাদের স্তব উচ্চারণ করে হব্যপাত্র নিয়ে ॥ ১ ॥
হে অগ্নি, প্রজ্বলিত হয়ে তুমি আধিপত্য কর অমৃতের উপর,
হব্যদাতার কল্যাণ বিধানে উপস্থিত থাকো তার নিকটে।
তুমি যে যজমানের কাছে থাকো, তিনি লাভ করেন সমস্ত ধন।
তোমার সম্মুখে হব্য প্রদান করেন অতিথির যোগ্য ॥ ২ ॥
হে অগ্নি, তুমি শত্রু দমন কর আমাদের ঐশ্বর্যের জন্য,
উৎকর্ষ লাভ করুক তোমার দীপ্তি,

তুমি সুশৃঙ্খলাবদ্ধ কর দাম্পত্য সম্বন্ধ,
আক্রমণ কর শত্রুদের পরাক্রম ॥ ৩ ॥
হে অগ্নি, তুমি হও প্রজ্বলিত ও দীপ্তিমান,
তোমার দীপ্তির স্তব করি আমি।
হে দীপ্তিমান, তুমি পূরণ কর কামনা,
যজ্ঞ স্থলে প্রজ্বলিত হও যথাযোগ্য রূপে ॥ ৪ ॥
হে অগ্নি, তোমাকে প্রজ্বলিত করছেন যজমান,
করছেন আহ্বান।
যজ্ঞস্থলে তুমি পূজা কর দেবতাদের,
কারণ তুমিই তো হব্যদাতা ॥ ৫ ॥
হব্যবাহক অগ্নিতে হোম কর আরব্ধ যজ্ঞে
সেবা কর অগ্নির।
তাঁকে বরণ কর
দেবতাদের নিকটে হব্য বহনের জন্য ॥ ৫।২৮।৬ ॥

এখানে স্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে যে এই সূক্তের ঋষি বিশ্ববারা একজন নারী এবং ঋগ্বেদের মন্ত্র রচনা করার অধিকার নারীরও ছিল, ক্ষমতাও ছিল। বিশ্ববারা অগ্নির উদ্দেশ্যে স্তব রচনা করে ঋত্বিকের কার্যও সম্পাদন করছেন। তৃতীয় ঋকে তিনি দাম্পত্য সম্বন্ধ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করবার জন্য অগ্নির নিকটে প্রার্থনা করছেন। এই উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজে দাম্পত্য সম্বন্ধের মধ্যে তিনি এমন কিছু হয়তো দেখেছিলেন যা তিনি অভিপ্রেত মনে করেন নি। তাই যে অগ্নির সামনে বিবাহ সম্পন্ন হত, তাঁর কাছেই দাম্পত্য সম্বন্ধ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করবার আবেদন জানাচ্ছেন।

একমাত্র বিশ্ববারাই ঋগ্বেদের মন্ত্র রচয়িতা ঋষি নন। সূর্যা ও ইন্দ্রাণী ঋষির কথা আগেই বলা হয়েছে, বলা হয়েছে লোপামুদ্রা ঋষির কথাও। তাঁদের রচনাও উদ্ধৃত করা হয়েছে। সূক্ত রচয়িতা ঋষি আরও তিনজনের নাম পাওয়া যায়—একজন অত্রির কন্যা অপালা এবং আর একজন কক্ষিবান ঋষির কন্যা ঘোষা। যথাস্থানে বাক্ ঋষির কথাও বলা হবে।

পুরাকালে অত্রির কন্যা অপালা ত্বক রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর পিতার মাথায় কেশ ছিল না এবং তাঁর ক্ষেত্র ছিল ফসলশূন্য। ইন্দ্র তাঁর দাঁত দিয়ে অভিষুত সোম পান করে তাঁকে নিজের রথের ছিদ্রে আকর্ষণ করে সমস্ত দোষ অপনয়ন করেছিলেন। অষ্টম মণ্ডলের ৯১ সূক্তে অপালা তাই ইন্দ্র দেবতার উদ্দেশে বলছেন—

কন্যা জলের জন্যে যাবার সময় পথে লাভ করলেন সোম,
গৃহে আনার সময় বললেন তাকে,
তোমাকে অভিষব করি ইন্দ্রের উদ্দেশে,
সমর্থ ইন্দ্রের উদ্দেশে অভিষব করি তোমাকে ॥ ১ ॥
হে ইন্দ্র, তুমি বীর, অত্যন্ত দীপ্তিমান তুমি,
গৃহে গৃহে তুমি গমন কর,
তুমি পান কর এই উকথ স্তুতি বিশিষ্ট সোম,
আর দন্তে অভিষুত ভ্রষ্টযব শক্তু ও অপূপ ॥ ২ ॥
হে ইন্দ্র, ইচ্ছা করি তোমায় জানতে,
তোমার সাথে অধিগত হব না এখন।
হে সোম, এঁর উদ্দেশে ক্ষরিত হও
প্রথমে মন্দ মন্দ, পরে দ্রুত বেগে ॥ ৩ ॥
সেই ইন্দ্র আমাদের সামর্থযুক্ত করুন বহুবার,
বহু সংখ্যক করুন আমাদের, ধনবান করুন অনেক বার।
আমরা পতি পরিত্যক্ত হয়ে এসেছি এখানে,
সঙ্গত হব আমরা ইন্দ্রের সাথে ॥ ৪ ॥
হে ইন্দ্র, উৎপাদনশীল কর আমার অঙ্গ,
আর আমার পিতার মস্তক ও ক্ষেত্র ॥ ৫ ॥
তাঁর উশর ক্ষেত্র কর শস্য যুক্ত,
আর লোমযুক্ত কর আমার শরীর ও পিতার মস্তক ॥ ৬ ॥
হে শতক্রতু, অপালাকে তুমি শোধন করে
চর্মবিশিষ্ট করেছিলে সূর্যের সমান,
রথের ছিদ্রে শকটের ছিদ্রে ও যুগের ছিদ্রে
তিনবার নিষ্কর্ষণ করে ॥ ৮।৯১।৭ ॥

এই সূক্তটি নিতান্ত ব্যক্তিগত হলেও এর থেকে জানা যাচ্ছে যে কোন চর্মরোগের জন্য অপালাকে পরিত্যাগ করেছিলেন তাঁর স্বামী এবং অপালা তাঁর পিতৃগৃহে ফিরে এসেছিলেন। ইন্দ্রের উদ্দেশে সোমযাগ করে তিনি রোগ মুক্ত হয়েছিলেন। কী ভাবে তা সম্ভব হয়েছিল তা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু এই সূক্ত রচনা করে অপালার ঋষি নাম হয়েছিল।

ঘোষার নাম আমরা জানতে পারি দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান ঋষির রচনায়। প্রথম মণ্ডলের ১১৭ সূক্তে অশ্বীদ্বয়ের উদ্দেশে তিনি বলছেন—

হে নেতৃদ্বয়, কৃষ্ণের পুত্র বিষ্ণকায় স্তব করেছিল তোমাদের,
তোমরা তাকে এনে দিয়েছিলে তার বিনষ্ট পুত্র বিষ্ণাপুকে।

হে অশ্বীদ্বয়! তোমরা পতি প্রদান করেছিলে
পিতৃগৃহে জরাগ্রস্তা নিষন্না ঘোষাকে ।। ১৷১১৭৷৭ ।।

এরপর দশম মণ্ডলে আমরা দেখি ঘোষা নামের নারী ঋষি অশ্বীদ্বয়ের স্তব করছেন ৩৯ এবং ৪০ সূক্তে। এই স্তুতিতে তিনি নিজের ব্যক্তিগত কথাও বলেছেন।—

পিতৃগৃহে এক নারী প্রাপ্ত হচ্ছিল বৃদ্ধাবস্থা।
তোমরা এনে দিলে তার সৌভাগ্য স্বরূপ বর।
যার চলার শক্তি নেই, বা যে নীচ অতি,
তোমার আশ্রয় স্বরূপ তারও।
লোকে তোমাদের চিকিৎসক বলে উল্লেখ করে
অন্ধের দুর্বলের রোগের জ্বালায় রোদনরত ব্যক্তির ।।১০৷৩৯৷৩।।
হে অশ্বীদ্বয়, উপদেশকারীদ্বয়, আমি রাজকন্যা ঘোষা,
আমি তোমাদের কথাই বলি চতুর্দিকে গিয়ে,
জিজ্ঞাসা করি তোমাদের বিষয়েই।
তোমরা আমার নিকটে থাকো রাত্রি দিন,
দমন করে রাখো আমার রথারূঢ় ভ্রাতুষ্পুত্রকে ।। ১০৷৪০৷৫ ।।
আমি ঘোষা, সৌভাগ্যবতী হয়েছি নারীলক্ষণ পেয়ে,
বর এসেছে আমাকে বিবাহ করবার জন্য।
তোমাদের বৃষ্টি বর্ষণে শস্য উৎপন্ন হয়েছে তাঁর।
নদীরা এঁর দিকে প্রবাহিত হচ্ছে নিম্নাভিমুখী হয়ে।
রোগ শূন্য ইনি, সমস্ত সুখভোগের সামর্থ জন্মেছে এঁর ।। ৯ ।।
হে অশ্বীদ্বয়, যারা রোদন করে বনিতার প্রাণ রক্ষার জন্য,
যজ্ঞ কার্যে নিযুক্ত করে বনিতাদের,
বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করে সুদীর্ঘ কাল,
সন্তানের জন্ম দিয়ে নিযুক্ত করে পিতৃলোকের যজ্ঞে,
পতির আলিঙ্গনে সুখী হয় সেই সব বনিতারা ।। ১০ ।।
হে অশ্বীদ্বয়, আমি অবগত নই তাদের সেই সুখ,
তোমরা বর্ণনা কর তাদের সে সুখের বিষয়,
আমি যেতে চাই স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত বলিষ্ঠ স্বামীর গৃহে,
হে অশ্বীদ্বয়, এই হল আমার কামনা ।। ১১ ।।
হে অন্ন ও ধন সম্পন্ন অশ্বীদ্বয়,
তোমরা উভয়ে সদয় হও আমার প্রতি,
পূর্ণ হোক আমার মনের সমস্ত অভিলাষ,
তোমরা কল্যাণ বিধানকর্তা, রক্ষক হও আমার ।। ১২ ।।

আমি তোমার স্তব করি, সন্তুষ্ট হও আমার প্রতি,
আমার পতির ভবনে বিধান কর ধন ও লোকবল।
যে তীর্থে আমি জল পান করি, তাকে সুবিধার কর,
বিঘ্ন বিনাশ কর পতি গৃহে যাবার পথের ॥ ১৩ ॥
হে প্রিয়দর্শন কল্যাণকর বিধাতাদ্বয়, কোথায় তোমরা ?
আজ কার ভবনে করছ আমোদ আহ্লাদ ?
কে তোমাদের রেখেছে আবদ্ধ করে ?
তোমরা গিয়েছ কোন্ বুদ্ধিমান যজমানের গৃহে ? ১০।৪০।১৪॥

এই সূক্ত দুটির মধ্যে ঘোষা ঋষির ব্যক্তিগত কথা প্রাধান্য পেলেও আরও অনেক কথা জানা যায়। অশ্বীদ্বয় তাঁর কুষ্ঠরোগ নিরাময় করেছিলেন এবং তারা আরও কত রোগের চিকিৎসা জানতেন তার আলোচনা যথাস্থানে করা হবে। তাই এখানে সম্পূর্ণ ঋকের অনুবাদ দেওয়া হল না। তবে এই প্রসঙ্গে একই সূক্তের দুটি ঋকে সে সময়ের সমাজের কথা পাওয়া যায়। তার অনুবাদ এই রকম—

হে অশ্বীদ্বয়, কোথায় তোমাদের গতি বিধি
দিনে বা রাত্রে, কাল যাপন কর কোথায় ?
শয়নকালে দেবরকে যেমন সমাদর করে বিধবা নারী,
অথবা কামিনী সমাদর করে নিজ কান্তকে,
তেমনি সমাদরে কে তোমাদের আহ্বান করে যজ্ঞস্থলে ? ॥ ২ ॥

পণ্ডিতেরা মনে করেন যে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা নারী যে তার দেবরকে বিবাহ করত, এই ঋকে সেই প্রথারই উল্লেখ করা হয়েছে। মনু সংহিতাতেও এই বিধান আছে, কিন্তু তা বিবাহের পূর্বে বাগদত্তা কন্যার পতির মৃত্যু হলে।

এই সূক্তে নারীর ব্যভিচারের কথাও আছে। ঘোষা ঋষিই বলছেন—

হে অশ্বীদ্বয় কুৎসের মতো তোমরা স্তবকারীর ভবনে যাও রথে,
তোমাদের এত মধু যে মক্ষিকারাও তা মুখে নেয়।
নারী যেমন রত হয় ব্যভিচারে,
তেমনি তোমাদের মধু গ্রহণ করে মক্ষিকারাও ॥ ১০।৪০।৬ ॥

কবষ ঋষিও এই রকম কথা লিখেছেন এই মণ্ডলেরই ৩৪ সূক্তে।—

আমি যখন মনে ভাবি, আর খেলব না পাশা,
তখন সরে যাই খেলার সঙ্গীদের কাছ থেকে।
কিন্তু থাকতে পারি না সুন্দর পিঙ্গল পাশা ছকের উপরে দেখে।
যেমন করে উপপতির নিকটে যায় ভ্রষ্টা নারী,
তেমনি করে আমিও যাই সঙ্গীদের ভবনে ॥ ১০।৩৪।৫ ॥

কূর্ম বা গৃৎসমদ ঋষি আরও স্পষ্ট ভাষায় এই কথা বলেছেন দ্বিতীয় মণ্ডলের ২৯ সূক্তে। তিনি আদিতদের বলছেন—

হে ব্রতকারী শীঘ্রগামী প্রার্থনীয় আদিত্যগণ,
দূর দেশে নিক্ষেপ কর আমার অপরাধ
গুপ্ত প্রসবিনীর গর্ভের মতো ॥ ২।২৯।১ ॥

চতুর্থ মণ্ডলের ৫ সূক্তে বামদেব ঋষি কটু ভাষায় এই কথা বলেছেন—

এ গভীর পদ উৎপাদন করেছে
পাপী অনৃত অসত্য লোকে,
ভ্রাতৃহীন বিপথগামিনী নারীর মতো,
পতিবিদ্বেষী দুষ্টচারিণী পত্নীর মতো ॥ ৪।৫।৫ ॥

গভীর পদকে সায়ন নরক বলেছেন। কিন্তু ঋগ্বেদে স্বর্গ ও পরকালের সুখের বর্ণনা থাকলেও নরকের কোন উল্লেখ নেই। তবে এই ঋক থেকে স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে যে সমাজে বিপথগামিনী নারী এবং পতিবিদ্বেষী ও দুষ্টচারিণী স্ত্রীলোকও ছিল। মনে হয়, এই সব কারণেই বিশ্ববারা ঋষি দাম্পত্য সম্বন্ধ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করবার প্রার্থনা জানিয়েছেন অগ্নির নিকটে। এ কোন আশ্চর্য কথা নয়। সমাজে ভাল মন্দ স্ত্রী পুরুষ চিরকালই ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। ভাল যা ছিল, অথচ পরবর্তীকালে নিষিদ্ধ হয়েছিল, এবারে সেই কথারই আলোচনা দরকার।

এখন আমরা জানি যে কিছু দিন পূর্বেও স্ত্রীলোক বেদ পাঠের অধিকারী ছিল না। স্ত্রীলোকের উপনয়ন এখনও হয় না। বিবাহ ব্যতীত আর কোন সংস্কার তাদের নেই। কিন্তু বৈদিক সমাজে যে এ রকম ছিল না তা অসংশয়ে বলা যায়। এই প্রসঙ্গে বেদের একটি শব্দের অর্থ জানা দরকার। বেদের অধ্যাপককে আমরা আচার্য বলি অর্থাৎ যিনি শিষ্যকে উপনীত করে সকল্প ও সরহস্য বেদপাঠ করান, তিনি আচার্য। আচার্যের পত্নী আচার্যানী। কিন্তু আচার্যা কে? কোন নারী আচার্যের কাজ করলে তাঁকেই আচার্যা বলা হয় না কি? বৈদিক সমাজে যে নারীরা বেদের সূক্ত রচনা করেছেন, ঋত্বিকের কাজ করেছেন যজ্ঞে, তাঁরা কি উপনীত হয়ে বেদ অধ্যয়ন করেন নি, কিংবা বেদ পড়ান নি শিষ্যদের? যদি তা না করে থাকেন, তবে আচার্যা শব্দটি প্রচলিত হল কেমন করে?

পণ্ডিতেরা মনে করেন যে বৈদিক যুগে নারীর বেদাধ্যয়ণ নিষিদ্ধ ছিল না, তাঁদেরও উপনয়ন হত, তাঁরা বেদ অধ্যয়ন করতেন এবং তাঁদের জন্যও সমাবর্তনের ব্যবস্থা ছিল। বেদের ব্যাখ্যা যাঁরা করতেন বা

শিষ্যদের অধ্যাপনা করতেন, তাঁদেরই বলা হত আচার্যা। যাঁরা আচার্যের পত্নী, তাঁরা আচার্যানী। আচার্যানী সকলেই বিদুষী হতেন না, তবে আচার্যানীর মধ্যেও যে বিদুষী হতেন তারও প্রমাণ আছে। বৈদিক যুগের পরেও অর্থাৎ মহাভারতেরও পরবর্তী কালে আমরা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের যে দুই স্ত্রীর কথা জানি, তাঁদের মধ্যে মৈত্রেয়ী ছিলেন বিদুষী। বচক্নু ঋষির ব্রহ্মবাদিনী কুমারী কন্যা গার্গী প্রকাশ্য রাজসভায় যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে ব্রহ্মতত্ত্বের উপর তর্ক করে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় রেখে গেছেন বৃহদারণ্যক উপনিষদে।

নির্ণয়সাগর প্রেস থেকে প্রকাশিত মনু স্মৃতিতে মনুর বচন পাওয়া গেছে যে পুরাকালে মেয়েদেরও মৌঞ্জী বন্ধন অর্থাৎ উপনয়ন হত এবং তাদেরও সাবিত্রী মন্ত্র অর্থাৎ গায়ত্রী জপ ও অধ্যয়ন অধ্যাপনার সমান অধিকার ছিল।

আর একটি কথা না বললে এই প্রসঙ্গ অসমাপ্ত থেকে যাবে। বৈদিক যুগে মেয়েরা শুধু বিদ্যাশিক্ষা নয় যুদ্ধ শিক্ষাও করতেন। যুদ্ধের সময়ে ঋষি পত্নীরা যে রথ চালাতেন এবং যুদ্ধ করতেন, ঋগ্বেদে তারও প্রমাণ আছে। দশম মণ্ডলের ১০২ সূক্তে মুদ্গল ঋষি বলছেন—

হে মুদ্গল, তোমার রথ যখন অসহায় হয় যুদ্ধে,
তখন দুর্ধর্ষ ইন্দ্র রক্ষা করুন সেই রথ।
হে ইন্দ্র, আমাদের রক্ষা কর তুমি
এই বিখ্যাত যুদ্ধে ধনার্জনের সময়॥ ১॥
মুদ্গলের পত্নী যখন সহস্র জয়িনী হলেন রথারূঢ়া হয়ে,
তখন তাঁর বস্ত্র সঞ্চালিত করল বায়ু,
মুদ্গল পত্নী রথী হলেন গাভী জয়ের সময়।
যুদ্ধে শত্রুসেনা হতে গাভীগণকে বার করে আনলেন
ইন্দ্রসেনা নামে সেই মুদ্গলানী॥ ২॥
হে ইন্দ্র, বজ্রপাত কর অনিষ্টকারী নিধনোদ্যত শত্রুদের উপর,
দাস বা আর্য যে জাতীয়ই হোক,
বধ কর তাদের অপ্রকাশ রূপে॥ ৩॥
দেখ, মহানন্দে জল পান করল এই বৃষ,
শত্রুর দিকে যাচ্ছে মৃত্তিকা স্তূপ শৃঙ্গে খনন করে।
ভারবৎ লম্বমান আছে তার মুষ্ক,
দুই শৃঙ্গ শাণিত করে আসছে আহারার্থী হয়ে॥ ৪॥
মানুষেরা তার নিকটে গিয়ে চিৎকার করাল একে,

প্রস্রাব করাল যুদ্ধের মধ্যে।
মুদ্গল তাতে জয় করলেন শত সহস্র গাভী ॥ ৫ ॥
বৃষ যোজিত হল শত্রু হিংসার জন্য,
শব্দ করতে লাগলেন কেশধারিণী-সারথি মুদ্গলাণী।
ধরে রাখা গেল না রথে যোজিত সেই বৃষকে,
সে ধাবমান হল শকট নিয়ে,
সৈন্যরা নির্গত হয়ে চলল মুদ্গলানীর পিছনে ॥ ৬ ॥
রথ চক্রের পরিধি বেঁধে দিয়েছিলেন বিদ্বান মুদ্গল,
রথে বৃষ যোজনা করলেন কৌশল সহকারে,
ইন্দ্র রক্ষা করলেন সেই গাভীগণের পতি বৃষকে,
সেই বৃষ পথে চলল দ্রুত বেগে। ৭ ॥
সুচারু রূপে বিচরণ করলেন প্রতোদধারী ও কপর্দী
চর্মের রজ্জু দিয়ে কাষ্ঠ বাঁধতে বাঁধতে।
ধন উদ্ধার করলেন বিস্তর লোকের,
স্পর্শ করে ধরে আনলেন বহু সংখ্যক গাভী ॥ ৮ ॥
দেখ, এই যে মুদ্গর পড়ে আছে যুদ্ধ সীমার মধ্যে,
এ করেছিল সেই বৃষের সহকারিতা।
এর দ্বারাই মুদ্গল জয় করেছিলেন
শত্রু সেনার মধ্য থেকে শত সহস্র গাভী ॥ ৯ ॥
কে কখন এই রকম দেখেছে অতি দূর দেশে?
যাকে রথে যোজনা করেছে, তাকেই করিয়েছে আরোহণ।
ঘাস জল দেয় না একে,
তবু বহন করছে রথ ধুরার ভার, জয়ী করছে প্রভুকে ॥ ১০ ॥
পতির ধন গ্রহণ করলেন মুদ্গলানী
বিধবার মতো নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করে,
বাণ বর্ষণ করলেন তিনি মেঘের মতো।
আমরা যেন জয়শ্রী লাভ করি এই রকম সারথির সাহায্যে ॥১১॥
হে ইন্দ্র, তুমি চক্ষু স্বরূপ সমস্ত জগতের,
যাদের চক্ষু আছে তাদেরও চক্ষু তুমি।
তুমি বারিবর্ষণ কর, কর ধন দানও,
চালিত কর দুটি পুরুষ অশ্বকে রজ্জু দিয়ে বন্ধন করে ॥১২॥

এই সূক্তে স্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে মুদ্গল ঋষির পত্নী ইন্দ্রসেনা কখনও তার স্বামীর রথ চালনা করছেন, কখনও বা নিজেই বাণ বর্ষণ করছেন শত্রুর উপরে। তাঁরাই বিজয়ী হয়েছেন এবং শত্রু সেনার মধ্যে

থেকে শত সহস্র গাভী উদ্ধার করে এনেছেন। সেকালে বোধহয় যুদ্ধ শিক্ষার প্রয়োজন ছিল সকলেরই। আত্মরক্ষার জন্য নয়, ধন ও গোধন রক্ষার জন্য এই প্রয়োজন ছিল।

পরবর্তীকালে যখন এই প্রয়োজন আর ছিল না, তখন নিজেদের স্বার্থেই পুরুষেরা হরণ করেছিল নারীর সমস্ত শিক্ষার অধিকার। তারা মেনে নিয়েছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছিল। নারী পুনরায় তার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে নিজেদেরই স্বার্থে। অনেক ক্ষেত্রে এগিয়েও যাচ্ছে। যেমন উত্তরাধিকারের ব্যাপারে। সেকালে পরিবার ছিল পিতৃতান্ত্রিক। উত্তরাধিকার সূত্রে পুত্রই পিতার সম্পত্তি পেত, তবে ব্যতিক্রম ছিল অবিবাহিতা কন্যা। তারা পিতার সম্পত্তির অংশ পেত বলে উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় মণ্ডলের ১৭ সূক্তে গৃৎসমদ ঋষি বলেছেন—

হে ইন্দ্র, তোমার নিকটে ধন চাই আমি তেমনি করে
যেমন করে পিতার সাথে অবস্থিত দুহিতা চায়
নিজের ভাগ পিতৃকুল থেকেই ।। ২।১৭।৯ ।।

তবে পুত্র না থাকলে দৌহিত্র পৌত্রের মতো সম্পত্তির অধিকারী হত। কারও পুত্র না থাকলে কন্যার বিবাহ দেবার সময়ে জামাতার সঙ্গে এই ব্যবস্থা করতে হত।—

দুহিতাকে পৈত্রিক ধন দেন না ঔরস পুত্র,
তাকে তিনি প্রণয়ের আধার করেন ভর্তার।
যদি পুত্রকন্যা উভয়ই থাকে পিতামাতার,
তবে একজন হয় ক্রিয়ার অধিকারী, অন্যজন সম্মানিতা ।।
—৩।৩১।২ ।।

একালে পুত্র ও কন্যা উভয়েই পিতার সম্পত্তির অধিকারী হয়েছে।

সমাজ ব্যবস্থা কী রকম ছিল

এর আগেই বলা হয়েছে যে বৈদিক সমাজে রাজা ছিলেন। সুদাস রাজার প্রসঙ্গে দেখা গেছে যে তিনি রাজার পুত্র ছিলেন। এর অর্থ এই যে রাজারা উত্তরাধিকার সূত্রে রাজ্যলাভ করতেন। তাঁরা যে অনেক সময়ে নির্বাচিত হতেন, এই সন্দেহ জাগে ধ্রুব ঋষির রাজস্তুতি পড়ে। দশম মণ্ডলের ১৭৩ সূক্তে ধ্রুব ঋষি অনুষ্টুপ ছন্দে রাজাকে অভিষেকের মন্ত্র পাঠ করছেন।—

হে রাজা, তোমাকে অধিরোপিত করলাম রাজপদে,
তুমি প্রভু হও এই জনগণের মধ্যে,
স্থির হয়ে থাকো অটল অবিচলিত হয়ে।
তোমাকে বাঞ্ছা করুক সমস্ত প্রজারা,
যেন নষ্ট না হয় তোমার রাজত্ব ॥ ১ ॥
তুমি এই স্থানে থাকো পর্বতের মতো অবিচলিত হয়ে,
হয়ো না রাজ্যচ্যুত।
এই স্থানে থাকো ইন্দ্রের মতো নিশ্চল হয়ে,
রাজ্যকে ধারণ কর এই স্থানে ॥ ২ ॥
এই নবাভিষিক্ত রাজাকে আশ্রয় দিয়েছেন,
অক্ষয় হোম দ্রব্য পেয়ে
তাঁকে আশীর্বাদ করেছেন সোম।
ব্রহ্মণস্পতিও করেছেন আশীর্বাদ ॥ ৩ ॥
আকাশ পৃথিবী ও পর্বত এ সমস্তই নিশ্চল।
এই বিশ্বজগৎও নিশ্চল।
ইনিও প্রজাদের মধ্যে রাজা হলেন অবিচলিত ॥ ৪ ॥
তোমার রাজ্যকে অবিচলিত করুণ বরুণ রাজা,
দেব বৃহস্পতি করুন অবিচলিত,
অবিচলিত রূপে ধারণ করুন ইন্দ্র ও অগ্নি ॥ ৫ ॥
এই দেখ অক্ষয় সোমরসকে সংযোজিত করছি
অক্ষয় হোম দ্রব্য সহকারে।
ইন্দ্র তোমার প্রজাদের করেছেন একায়ত্ত,
কর প্রদানে উন্মুখ করেছেন তাদের ॥ ১০।১৭৩ ॥ ৬ ॥

দশম মণ্ডলেরই ১৭৪ সূক্তে অভীবর্ত ঋষিও অনুষ্টুপ ছন্দে রাজস্তুতি করছেন—

যারা বিপক্ষ, যারা হিংসাকারী শত্রু আমাদের,
সৈন্য নিয়ে যে আসে যুদ্ধ করতে,
যে আমাদের করে বিদ্বেষ,
হে রাজা, তাদের সম্মুখীন হও তুমি ॥ ১০।১৭৪।২ ॥

এর উত্তরে রাজা বলছেন—

আমার শত্রু নেই, বধ করেছি আমি শত্রুদের,
রাজ্যের প্রভু আমি, সক্ষম হয়েছি বিপক্ষ নিরাকরণে।
এখন আমি অধীশ্বর হয়েছি সমস্ত প্রাণীর,
সমস্ত লোকেরও হয়েছি অধীশ্বর ॥ ১০।১৭৮।৫ ॥

রাজা শত্রু ও দস্যু-তস্করের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করতেন বটে, কিন্তু প্রজাদের মধ্যে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান ছিল খুবই স্পষ্ট। এখনকার মতো তখনও সমাজ ছিল ধনতান্ত্রিক। দরিদ্রকে দান করার নির্দেশ ছিল, কিন্তু সাম্য আনার কোন প্রচেষ্টা ছিল না। এই প্রসঙ্গে দশম মণ্ডলের ১১৭ সূক্তটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ভিক্ষু ঋষি দান দেবতার উদ্দেশে জগতী ও ত্রিষ্টুপ ছন্দে বলছেন—

যে ক্ষুধার সৃষ্টি করেছেন দেবতারা,
প্রাণ নাশিনী সেই ক্ষুধা।
আহার করলেও নেই অব্যাহতি মৃত্যুর নিকটে,
কিন্তু হ্রাস হয় না দাতার ধন,
অদাতাকে সুখী করে না কেউই ॥ ১ ॥
ক্ষুধাতুর মানুষ যখন আসে যাচ্ঞা করতে,
সরবে ভিক্ষা করে অন্ন,
তখন অন্নবান হয়েও যে কঠিন করে রাখে হৃদয়,
আর নিজে ভোজন করে আগে,
তাকে কেউই সুখী করে না কখনও ॥ ২ ॥
কোন কৃশ লোক অন্নের লোভে এলে ভিক্ষা করতে,
অন্ন দান করেন যিনি, তিনি দাতা।
তাঁর লাভ হয় সম্পূর্ণ যজ্ঞফল,
শত্রুদের মধ্যেও তিনি লাভ করেন মিত্র ॥ ৩ ॥
যদি নিকটে আসেন এক সঙ্গের সঙ্গী,
তবে সে বন্ধু নয় যে তাঁকে বন্ধু হয়েও দেয়না অন্ন।

তার গৃহ গৃহ নয়, চলে যেতে হয় সেখান থেকে,
যেতে হয় অন্য কোন ধনাঢ্য দাতার কাছে ॥ ৪ ॥
অবশ্য ধন দান করবে যাচককে.
সেই দাতা পায় অতি দীর্ঘ পথ।
যেমন করে উপর থেকে নিচে ঘোরে রথের চক্র,
তেমনি করেই ধন যায় একের নিকট থেকে অন্যের কাছে ॥৫॥
যার মন উদার নয়, মিথ্যা তার ভোজন।
ভোজন তার মৃত্যুর স্বরূপ।
সে দেবতাকে দেয় না, দেয় না বন্ধুকেও।
যে শুধু নিজে খায়, সে খায় শুধু পাপ ॥ ৬ ॥
লাঙ্গল অন্ন দেয় কৃষি কার্য করে,
সে নিজের পথে নিজের কাজে উৎপাদন করে শস্য।
বিদ্বান পুরোহিত যেমন মূর্খের চেয়ে শ্রেষ্ঠ,
তেমনি দাতার স্থান অদাতার উপরে ॥ ৭ ॥
যার সম্পত্তির পরিমাণ এক অংশ,
সে উপাসনা করে দুই অংশের অধিকারীকে।
যার আছে দু অংশ সম্পত্তি,
সে পশ্চাৎবর্তী হয় তিন অংশ বিশিষ্টের।
চতুরাংশবান স্থান পান তাদের উপরে।
এই ভাবেই শ্রেণীবদ্ধ আছে অগ্র পশ্চাৎ ভাবে ॥ ৮ ॥
পরস্পর সমানাকৃতি বটে আমাদের দুই হাত,
কিন্তু সমান নয় ধারণের ক্ষমতা।
এক মাতার উদরে জন্মেও সমান দুধ দেয়না দুই গাভী,
যমজ ভ্রাতা হয়েও সমান হয় না দুজনের পরাক্রম।
দুজনে সমান দাতা হয় না এক বংশের সন্তান হয়েও ॥ ৯ ॥

অতি সত্য কথা বলেছেন ভিক্ষু ঋষি। ধন কখনও একজনের নিকটে থাকে না, রথচক্রের বিবর্তনের মতো ধন একজনের নিকট থেকে আর একজনের নিকটে যায়। সম্পত্তিও একজনের চেয়ে আর একজনের বেশি, তাই এক জনের চেয়ে আর একজনকে বেশি মান্য করতে হয়। দুজন মানুষও এক বংশে জন্মে সমান দাতা হয় না। তবে দাতার স্থান সব সময়েই অদাতার উপরে। রাজারা দান করতেন, গৃহস্থরাও। প্রার্থীকে দান করা ছিল সমাজের নিয়ম, দান না করলে নিন্দার পাত্র হতে হত।

কিন্তু যাচঞা করে দান গ্রহণে দ্বিধা ছিল মানুষের. সঙ্কোচ ছিল জীবিকার জন্য পরমুখাপেক্ষী হতে। গৃৎসমদ ঋষি বলছেন—

হে বরুণ, পরিশোধ কর আমার পূর্বপুরুষের ঋণ,
পরিশোধ কর আমারও ঋণ।
আমাকে যেন ভোগ করতে না হয় অন্যের ধন,
হে বরুণ, আজ্ঞা কর,.........পারি ।। ২।২২।৯ ॥
যেন উদিত হয় নি অনেক ঊষা, হে বরুণ,
সকল ঊষায় যেন জীবিত থাকতে পারি আজ্ঞা কর ।। ২।২৮।৯ ।।

সমাজে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দেখা যায়, কিন্তু বর্ণ বৈষম্যের কথা জানা যায় না। থাকলে নিশ্চয়ই তা জানা যেত। যে দুটি বর্ণ ছিল তা আর্য ও দাস বা অনার্য। দেশের এই আদিম অধিবাসী দাস নামে চিহ্নিত অনার্যরাই পরবর্তী কালে শূদ্র বর্ণে পরিণত হয়েছিল কিনা তাও জানা সম্ভব নয়। মানুষের বিভিন্ন বৃত্তির কথা পূবেই বলা হয়েছে, তাদের বিভিন্ন নামও আছে। কিন্তু বৈদিক যুগেই বৃত্তি দিয়ে বর্ণ সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয় না। সে ইঙ্গিত ঋগ্বেদের কোনখানে নেই। পুরুষ সূক্তে আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উল্লেখ দেখি, তা নিতান্তই অর্বাচীন কালের রচনা বলে প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ তা বৈদিক যুগের শেষের দিকে হয়ে থাকলেও হতে পারে। এ কথা নিশ্চিত ভাবে বলা চলে যে এই ঘটনার পরেও এই বিষয় নিয়ে আর কোন সূক্ত রচিত হয় নি। অনুমান করা যেতে পারে যে এই সময়েই বেদজ্ঞরা হিন্দুধর্মের একটা রূপ দেবার জন্য কিছু বিধিনিষেধ আরোপের চেষ্টা আরম্ভ করেছিলেন। অর্থাৎ মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্ম-শাস্ত্র রচনার সূচনা হয় এই সময় থেকে। হিন্দু সমাজে চারটি বর্ণের অস্তিত্ব ঘোষণাও ঋগ্বেদের শেষ মণ্ডলে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে অনুমেয় কারণে।

এ কথা মেনে নেবার সঙ্গত কারণ আছে। বৃহস্পতি ঋষি ব্রহ্মজ্ঞান দেবতার উদ্দেশ্যে বলেছেন—

যারা পর্যালোচনা করে না ইহকাল বা পরকাল,
করে না স্তুতি প্রয়োগ বা সোমযাগ,
পাপযুক্ত ভাষা শিখে তারা উপযুক্ত হয়
লাঙ্গল চালনার অথবা তন্তুবায় হবার ॥ ১০৭১।৯ ॥

ঋষি এই ঋকে বলতে চেয়েছেন যে যারা ইহকাল ও পরকালের পর্যালোচনা করত, স্তুতি অভ্যাস বা সোমযাগ করত, তারাই হত স্তোতা। এ কাজে অসমর্থ হলেই তাদের কৃষক বা তন্তুবায় হতে হত। জন্ম দিয়ে নয়, বুদ্ধি ও কর্ম দিয়ে অবলম্বন করতে হত বিভিন্ন বৃত্তি।

বিপ্র ও ক্ষত্র বা ক্ষত্রিয় শব্দ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। কিন্তু সে সব

জাতি বা বর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বৎস ঋষি অগ্নি দেবতার উদ্দেশে বলছেন—

আমরা বিপ্র ও মর্ত্য,
আমরা মেধাবী দেব অগ্নিকে আহ্বান করি স্তুতি দ্বারা
হব্য দিয়ে প্রীতি করে আমাদের রক্ষার জন্য ॥ ৮।১১।৬ ॥

মূলে আছে বিপ্রং দেবং অগ্নিং অথাৎ মেধাবী দেব অগ্নি। বিপ্রের অর্থ এখানে মেধাবী। বলা বাহুল্য যে অগ্নি বিপ্র বা ব্রাহ্মণ জাতির ছিলেন না। পণ্ডিতরা মনে করেন যে তখন সমাজে বিপ্র বা ব্রাহ্মণ নামে কোন জাতি বা বর্ণ ছিল না।

এইভাবে বরুণকে বলা হয়েছে সুক্ষত্র। বসিষ্ঠ ঋষি বলছেন—

হে রাজা বরুণ, আমি যেন প্রাপ্ত না হই মৃন্ময় গৃহ,
হে সুক্ষত্র, দয়া কর, কর দয়া। ৭।৮৯।১ ॥

এখানে ক্ষত্র শব্দের অর্থ বল, সুক্ষত্রের অর্থ অতিশয় বলবান। বরুণ যে ক্ষত্রিয় জাতির ছিলেন না, এ কথা না বললেও চলে।

এই বসিষ্ঠ ঋষিই মিত্র ও বরুণের উদ্দেশে বলছেন—

তোমরা রাজা, রক্ষক মহা যজ্ঞের,
সিন্ধুপতি ও ক্ষত্রিয়, এসো আমাদের অভিমুখে।
হে ক্ষিপ্রদানশীল মিত্র ও বরুণ,
অন্তরিক্ষ থেকে প্রেরণ কর আমাদের অন্ন ও বৃষ্টি ॥ ৭।৬৪।২ ॥

এখানেও ক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ বলবান। মিত্র ও বরুণ তো ক্ষত্রিয় জাতি ছিলেন না, তাই বলা হয় যে বৈদিক সমাজে বিভিন্ন জাতির বা বর্ণের সৃষ্টি তখনও হয় নি।

পুরুষ সূক্ত ভিন্ন আর কোন স্থানে বৈশ্য শব্দের উল্লেখ পাই নি। তবে ক্রয় বিক্রয় ও বাণিজ্যের কথা পেয়েছি। চতুর্থ মণ্ডলের ২৪ সূক্তে বামদেব ঋষি ইন্দ্র দেবতার উদ্দেশে বলছেন—

কেউ অল্প ধন পায় অনেক পণ্য দিয়ে,
পরে ক্রেতার নিকটে গিয়ে চায় অবশিষ্ট মূল্য
বিক্রয় করি নি বলে।
অনেক দিয়েছি বলে তার অল্প মূল্য
অতিক্রম করতে পারে না বিক্রেতা।
সমর্থ হোক বা অসমর্থ,
থেকে যায় বিক্রয় কালের কথাই ॥ ৪।২৪।৯ ॥

বণিক শব্দের ব্যবহার আছে ঋগ্বেদে। পঞ্চম মণ্ডলের ৪৫ সূক্তে অত্রি বংশীয় সদাপৃণ ঋষি বলেছেন—

হে বন্ধুগণ, এসো আমরা পাঠ করি সেই স্তোত্র
যা দিয়ে উদ্ঘাটিত হয়েছিল অপহৃত ধেনুর গোষ্ঠ,
যা দিয়ে মনু জয় করেছিলেন বিশিশিপ্রকে,
আর কক্ষীবান বনে গিয়ে জল পেয়ে ছিলেন বণিকের মতো ॥৬॥

সেকালের বণিকেরা যে বাণিজ্য করতে সমুদ্রযাত্রাও করত, সে কথাও পাওয়া যায়। চতুর্থ মণ্ডলের ৫৫ সূক্তে বামদেব ঋষি বলছেন—

হে দ্যাবা পৃথিবী দেবীদ্বয়,
ধনলাভেচ্ছু ব্যক্তি যেমন স্তুতি করে সমুদ্রের
গমনের জন্য সমুদ্রের মধ্যে,
আমরাও তেমনি স্তুতি করি অহিবুধ্ন্য দেবতার সাথে
অভিলষিত কাজ লাভের আশায়।
সেই দেবতারা অপাবৃত করুণ দীপ্তধ্বনির নদীদের ॥৪।৫৫।৬॥

কী পণ্য নিয়ে তারা কোথায় যেত সে কথা পাই নি। তবে উপকূলের কাছাকাছি যে দ্বীপ ছিল সে কথা জানা যায়। প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তে কক্ষীবান ঋষি দেবতা অশ্বীদ্বয়ের উদ্দেশে বলছেন যে তুগ্র নামে একজন রাজর্ষি তাঁদের প্রিয় ছিলেন। তিনি দ্বীপান্তরবর্তী শত্রুদের উপদ্রবে ক্লিষ্ট হয়ে তাঁদের জয় করবার জন্য নিজের পুত্র ভুজ্যুকে নৌকায় সৈন্যদের সঙ্গে প্রেরণ করেন। সমুদ্রে অনেক দূর যাবার পর সে নৌকা ভেঙ্গে যায়। ভুজ্যু অশ্বীদ্বয়ের স্তুতি করলে তাঁরা তাঁকে সসৈন্যে নিজেদের পোতে তুলে তিন দিন তিন রাত পরে তুগ্রের নিকটে পৌঁছে দেন। সায়ন এই কথা বলেছেন নিচের ঋকটির টীকায়।—

ম্রিয়মান মানুষ যেমন ত্যাগ করে তার ধন,
তেমনি কষ্টে সমুদ্রে পাঠালেন তুগ্র
তাঁর পুত্র ভুজ্যুকে। ১।১১৬।৩॥

সমুদ্রে প্রমোদ ভ্রমণেরও দৃষ্টান্ত আছে। সপ্তম মণ্ডলের ৮৮ সূক্তে বসিষ্ঠ ঋষি বরুণ দেবতার উদ্দেশে বলছেন—

নৌকায় যখন আরোহন করেছিলাম আমি ও বরুণ,
সুন্দর ভাবে নৌকা পাঠিয়েছিলাম সমুদ্রের মধ্যে,
আর আমরা ছিলাম জলের উপরে গমনশীল নৌকায়,
সুখে ক্রীড়া করেছিলাম শোভার্থে নৌকাদোলায় ॥ ৩ ॥

স্থল পথে দস্যু-তস্করের উপদ্রব যে ছিল, তা জানা যায় প্রথম মণ্ডলের ৪২ সূক্তে। কণ্ব ঋষি পূষা দেবতার উদ্দেশে বলছেন—

হে পূষা, আঘাতকারী অপহরণকারী ও দুষ্টাচারী,
যে কেউ দেখায় আমাদের ভুল পথ,
তাকে দূর করে দাও পথ থেকে।
পথ থেকে দূরে তাড়িয়ে দাও
সেই মার্গ প্রতিবন্ধক তস্কর কুটিলাচারীকে ॥ ১।৪২।২-৩ ॥

বস্ত্র অপহরণকারী তস্করের কথা আছে চতুর্থ মণ্ডলের ৩৮।৫ ঋকে এবং সপ্তম মণ্ডলের ৮৬।৫ ঋকে আছে পশুখাদক চোরের কথা। রাজা যে চোরের শাস্তি বিধান করতেন, সে কথাও ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। কিন্তু কী রকমের শাস্তি দিতেন তা জানা যায় না।

সমাজে ধন বণ্টনের বৈষম্য থাকলেই দস্যু তস্করের উপদ্রব দেখা দেয়। বৈদিক সমাজে যে এই বৈষম্য দেখা দিয়েছিল তা ঋগ্বেদ থেকেই জানা যায়। প্রথম মণ্ডলের ৮১ সূক্তে গোতম ঋষি বলছেন—

যে পালনকারী ইন্দ্র মানুষের অন্ন দেন যজমানকে,
তিনি আমাদেরও প্রদান করুন সেই রূপ অন্ন।
হে ইন্দ্র, আমাদের অন্ন দাও বিভাগ করে,
আমরাও যেন পাই তোমার অপর্যাপ্ত ধনের একাংশ ॥ ৬ ॥

গোতমের এই ঋক থেকেই অনুমান করা যায় যে দেশের দরিদ্র জনগণ ধনবণ্টনের সাম্য চাইতেন। যারা ধনী, তাঁরা ভয় পেতেন চোর-ডাকাতের। তাই ধনীর গৃহে কুকুর পোষার চল ছিল। সপ্তম মণ্ডলের ৫৫ সূক্তে বসিষ্ঠ ঋষি বলছেন—

তোমার মাতা ঘুমোল, ঘুমোল তোমার পিতা,
কুকুর ঘুমোক, ঘুমিয়ে পড়ুক গৃহস্বামী,
বন্ধুরাও ঘুমোক,
আর ঘুমিয়ে পড়ুক চারি দিকের জনগণ ॥ ৭।৫৫।৫ ॥

গৃহপালিত কুকুর ঘুমিয়ে থাকার অর্থই নিরুপদ্রবে রাত কাটানো। বসিষ্ঠ তাই কুকুরকেই গৃহরক্ষক বাস্তুপতি বলেছেন। সে নিশ্চিন্তে ঘুমোলেই চোর বা পশুর উপদ্রব থাকবে না, নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবে গৃহবাসী জনগণ।

সাধারণ ভাবে মনে করা হয় যে আর্যরা গৃহ বা ইটকাঠ দিয়ে অট্টালিকা নির্মাণ করতে জানত না। সিন্ধু সভ্যতার যুগে যে নগর বা বন্দর নির্মাণের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, আর্যরা সেই বিদ্যার সঙ্গে পরিচিত ছিল না বলেই বিশ্বাস করা হয়। তারা নাকি বাস করত গ্রামে কুটীর নির্মাণ করে। নগরেও বাস করত, কিন্তু এই নগর শব্দটি এ কালের অর্থে ব্যবহৃত হত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ করা হয়।

এ ধারণা বোধহয় ঠিক নয়। তার কারণ ঋষিরা যে সহস্র স্তম্ভের গৃহ দেখেছিলেন, তার প্রমাণ আছে দ্বিতীয় মণ্ডলের ৪২ সূক্তে। গৃৎসমদ ঋষি বলছেন—

শত্রুনাশনা রাজা মিত্রাবরুণ উপবেশন করুন
এই স্থির উৎকৃষ্ট সহস্র স্তম্ভ বিশিষ্ট স্থানে ॥ ২।৪২।৫ ॥

এই ঋকটি পড়ে অনুমান করা যায় যে স্তম্ভের উপরে অট্টালিকা নির্মাণের পদ্ধতিও আর্যদের জানা ছিল, কিংবা তারা শিখে নিয়েছিল। ইট বা পাথর এবং কাঠ বা অন্য উপাদানে গৃহ নির্মিত হত এবং গৃহ নির্মাণও আর্যদের একটি বৃত্তি ছিল বলেই মনে করা যেতে পারে।

নগর নির্মাণের একটি নূতন উপাদানের কথা পাওয়া যায় সপ্তম মণ্ডলের তিনটি সূক্তে। ৩।৭ ঋকে আছে—

আমাদের রক্ষা কর অপরিমিত অয়োনির্মিত নগরী দ্বারা ॥

মূলে আছে আয়সীভি অর্থাৎ অতিশয় নিরাপদে রাখো। সায়ন আয়সীভিঃ শব্দের অর্থ বলেছেন হিরণ্ময়ীভিঃ। ১৫।১৪ ঋকেও এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। -

তুমি শতগুণাপুরী হও মহতী অয়োনির্মিতা
আমাদের মানুষদের রক্ষার জন্য।

অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে এই অয়ো শব্দে লোহা বোঝানো হয়েছে—লৌহনির্মিত গৃহ বা নগর। অর্থাৎ গৃহ নির্মাণে লোহার ব্যবহারও ছিল, বর্তমানে যেমন লোহার গরাদ বা গ্রিল ব্যবহার করে গৃহ সুরক্ষিত করা হয় কতকটা তেমনি করেই।

পুরাণে আমরা মানুষের অতি দীর্ঘ আয়ুর কথা পড়েছি। কিন্তু বৈদিক যুগে ঋষিরা শত বর্ষ আয়ুর জন্য প্রার্থনা করতেন। তৃতীয় মণ্ডলের ৩৬ সূক্তে বিশ্বামিত্র ঋষি ইন্দ্রের উদ্দেশে বলছেন—

হে মঘবন, হে ঋজীষী সোমবিশিষ্ট ইন্দ্র,
তুমি দান কর সকলের বরণীয় প্রভূত ধন,
আমাদের জীবনের জন্য প্রদান কর শত বৎসর ॥ ৩।৩৬।১০ ॥

শুধু এখানে নয়, ঋগ্বেদের নানা স্থানে মানুষের আয়ুর পরিমাণ একশত বৎসর বলেই নির্দিষ্ট হয়েছে। শত বৎসর বোঝাতে শত শরৎ বা শত হেমন্তও বলা হয়েছে। পুরাণ পড়ে যেমন মনে হয় যে ঋষিরা সহস্রাধিক বৎসর বাঁচতেন, ঋগ্বেদ পড়ে তা মনে হয় না। বরং ষষ্ঠ মণ্ডলের ৪৮ সূক্তে দেখা যায় যে বৃহস্পতির পুত্র শংযু ঋষি বলছেন—

হে অগ্নি, তুমি গৃহপতি সমস্ত মনুষ্যলোকের,
হে বরুণতম অগ্নি, তোমাকে আমি প্রজ্বলিত করছি

শত হেমন্ত, আমাকে রক্ষা কর শত পাপ থেকে।
তোমার স্তোতৃবর্গকে যারা ধন দেয়, রক্ষা কর তাদেরও ॥ ৮ ॥
এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই ঋষির বয়স শত বৎসর।

এই প্রসঙ্গেই জানা দরকার যে সমাজে কাদের ঋষি বলা হত। পঞ্চম মণ্ডলের ৬১ সূক্ত থেকে জানা যায় যে অত্রি বংশীয় ঋষি অর্চনানার পুত্র দর্ভের পুত্র রাজা রথবীতির কন্যার সঙ্গে নিজের পুত্র শ্যাবাশ্বের বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন। রাজা রাজী হলেও তাঁর মহিষী অসম্মত হন কারণ রাজকন্যা কোন ঋষিকে বিবাহ করতে আগ্রহী। এই প্রাচীন ইতিবৃত্ত থেকেই বোঝা যায় যে ঋষির পুত্র ঋষি হতেন না। বেদের মন্ত্র দ্রষ্টাকেই ঋষি বলা হত এবং এই ঋষিদের সঙ্গে রাজকন্যাদের বিবাহ হত সসম্মানে। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে রাজা এবং ঋষির জীবনযাত্রায় এমন পার্থক্য ছিল না যে বিবাহের পর রাজকন্যাদের খুব বেশি কষ্ট স্বীকার করতে হত। রাজকন্যারা এমন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হতেন না যে ঋষির আশ্রমে এসে তাঁরা দুঃখে কাল কাটাতেন।

আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়, সেটি হল যে বৈদিক সমাজে কোন বর্ণের বিচার ছিল না। কোন শক্তিমান পুরুষ প্রজা পালন করতেন বলেই রাজা. বেদের মন্ত্র দ্রষ্টা বা মন্ত্র রচয়িতা হলেই ঋষি। তা না হলে কোন সাধারণ বৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করতে হত। আত্মরক্ষার জন্য এবং নিজের ধন ও গোধন রক্ষার জন্য ঋষিদের অনেক সময়ে যুদ্ধ করতে হত বলে তারা সর্বদাই বীর পুত্র কামনা করতেন। পঞ্চম মণ্ডলের ২৩ সূক্তে অত্রির অপত্য দ্যুম্ন ঋষি অগ্নির নিকটে প্রার্থনা করছেন—

হে অগ্নি, দ্যুম্নকে তুমি দাও চক্রবিজয়ী পুত্র,
যে গৌরব লাভ করবে যুদ্ধে
সবাইকে পরাজিত করে তার পরাক্রমে ॥ ১ ॥
হে পরাক্রান্ত অগ্নি, তুমি সত্যস্বরূপ ও অদ্ভুত,
গোদাতা ও অন্নদাতা তুমি সকলের।
আমাকে তুমি দাও এমন একটি পুত্র,
যে পরাজয়ে সমর্থ হবে শত্রুর সৈন্য ॥ ৫।২৩।২ ॥

যাঁরা যজ্ঞ করতেন, তাঁদের সবাইকে ঋষি বলা হত না। যজ্ঞের বিভিন্ন নাম ছিল। প্রথম মণ্ডলের ৩৬ সূক্তে ঘোর পুত্র কণ্ব ঋষি অগ্নি দেবতার উদ্দেশে বলছেন—

যজমানেরা এই রূপে উপাসনা করেন নমস্কার করে
সেই স্বয়ং দীপ্তিমান অগ্নিকে,

হোত্রদের দ্বারা অগ্নিকে প্রদীপ্ত করে
শত্রু বিজিগীষু মানুষেরা ॥ ১।৩৬।৭ ॥

যারা হোত্র, সে সম্বন্ধে সায়ন বলেছেন যে যজ্ঞে সাতাশজন ঋত্বিক বা পুরোহিত থাকেন। যিনি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তিনি যজমান, যিনি মন্ত্রপাঠ করেন তিনি হোতা, যিনি মন্ত্র গান করেন তিনি উদ্গাতা, যিনি হব্য প্রস্তুত করেন তিনি পোতা, যিনি হব্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন তিনি নেষ্টা, যিনি সমুদায় তত্ত্বাবধান করেন তিনি ব্রহ্মা এবং যিনি দ্বার রক্ষা করেন তিনি রক্ষ।

দ্বিতীয় মণ্ডলের ১ সূক্তে গৃৎসমদ ঋষি অগ্নির উদ্দেশে বলছেন—

হে অগ্নি, হোতার কর্ম ও পোতার কর্ম তোমারই,
তোমারই কর্ম ঋত্বিকের ও নেষ্টার।
তুমি অগ্নীধ্র, যজ্ঞ কামনা কর বলে প্রশস্তাও তুমি।
তুমি অধ্বর্যু, ব্রহ্মা নামের ঋত্বিক.
তুমি গৃহপতি আমাদের গৃহে। ২।১।২ ॥

একটা সময় ছিল যখন ঋষিরা নিজের গৃহে যজ্ঞ করতেন সস্ত্রীক। তারপর ধনশালী ব্যক্তিরাও যখন যজ্ঞ করতে আরম্ভ করলেন, তখন তাঁরা অভিহিত হলেন যজমান নামে এবং যজ্ঞের জন্য পুরোহিত নিযুক্ত হতে লাগলেন। বিভিন্ন কার্যের জন্য তাদেরই বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হত। কালক্রমে এই যজ্ঞ একটি জটিল ব্যাপারে পরিণত হল এবং পুরোহিতের কার্যও একটি বৃত্তিতে পরিণত হল। রাজা ও ধনবানেরা প্রচুর দান করতেন এই পুরোহিতদের। অষ্টম মণ্ডলের ৫ সূক্তে কণ্ব গোত্র ব্রহ্মাতিথি ঋষি বলছেন—

হে অশ্বীদ্বয়, তোমরা জান অভিনব সম্ভজনীয় ধন।
এও জান যে চেদি বংশীয় কশু রাজা দিয়েছিলেন,
শত উষ্ট্র ও দশ সহস্র গোধন ॥ ৮।৫।৩৭ ॥

বৈদিক যুগে যে সব পশু পালিত হত, তাদের মধ্যে গরু, মহিষ ও অশ্বই প্রধান। তবে ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে এই রকম ভাবে উষ্ট্র ও গজেরও উল্লেখ দেখা যায়।

এই ভাবেই অষ্টম মণ্ডলের ৪৬ সূক্তে অশ্ব পুত্র বশ ঋষি পৃথুশ্রবার পুত্র কনীতের দান স্তুতি করেছেন চারটি ঋকে। ঋষি বলছেন—

যে ধন গ্রহণ করেছেন অশ্বের পুত্র বশ
প্রাতঃ কালে কন্যার পুত্র পৃথুশ্রবা রাজার নিকটে,
সে আসুক যে গ্রহণ করেছে দেবশূন্য মনুষ্য পূর্ণ ধন। ২১ ॥
আমি লাভ করেছি ষাট হাজার অযুত অশ্ব, কুড়িশত উষ্ট্র,

লাভ করেছি দশ শত কৃষ্ণ বর্ণ বড়বা,
দশ সহস্র শুভ্রবর্ণ গো লাভ করেছি তিন স্থানে ॥ ২২ ॥
রথনেমি প্রবর্তিত করছে দশটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব,
অত্যন্ত বেগবান ও বলবান মন্থনকারী তারা ॥ ২৩ ॥
এই উৎকৃষ্ট দান কানীন পুত্র পৃথুশ্রবার,
তিনি দিয়েছেন হিরণ্ময় রথ।
অতিশয় দাতা ও প্রাজ্ঞ তিনি,
তিনি করেছেন অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ কীর্তি ॥ ৮।৪৬।২৪ ॥

এই দান স্তুতিতে আরও দেখা যাচ্ছে যে কুমারী কন্যার পুত্র সমাজে কানীন বলে চিহ্নিত হতেন ঠিকই, কিন্তু তাঁরা অশ্রদ্ধার পাত্র হতেন না।

যাঁরা রাজা বা কোন ধনী যজমানের জন্য যজ্ঞ করতেন, তাঁরাই এই সব পেতেন। বিভিন্ন যজ্ঞে বিভিন্ন রকমের কাজ করতে হত। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে একটি অশ্বযজ্ঞের বর্ণনা আছে। আর্যরা এ দেশে এসে সিন্ধু নদীর তীরে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করবার পর যে অশ্ব যজ্ঞ করেছিলেন, দীর্ঘতমা ঋষি তার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন প্রথম মণ্ডলের ১৬২ সূক্তে। পরবর্তীকালে বেদের এই অশ্ব যজ্ঞ রূপান্তরিত ও বর্ধিতাবয়ব হয়ে ভারতবর্ষের রাজাদের অশ্বমেধ যজ্ঞ হয়। মহাভারতে এর বর্ণনা আছে। এই সূক্তের পঞ্চম ঋকে কয়েকজন ঋত্বিকের কাজের পরিচয় পাওয়া যায়। হোতা দেবতাদের আহ্বান করেন, অধ্বর্যু যজ্ঞের নেতা, আবয়া হব্য দান করেন, অগ্নিমিন্ধ অগ্নি প্রজ্বলিত করেন, গ্রাবগ্রাভ পাথর দিয়ে সোম ছেঁচে রস বার করেন, শংস্তা নিয়ম অনুসারে কর্মের অনুষ্ঠান করেন এবং ব্রহ্মা সমস্ত যজ্ঞ কার্যের প্রধান সম্পাদনকারী। এই যজ্ঞ ধর্মের অনুষ্ঠান ছিল না সামাজিক উৎসব, তা আমাদের নিজেদেরই বিচার করে দেখতে হবে।

দীর্ঘতমা অশ্ব দেবতার উদ্দেশে ত্রিষ্টুপ ও জগতী ছন্দে বলছেন—

যজ্ঞে আমরা কীর্তন করছি
দেবজাত দ্রুতগতি অশ্বের বীর কর্ম।
আমাদের যেন নিন্দা না করেন
মিত্র বরুণ বায়ু ইন্দ্র ঋভুক্ষা ও মরুৎগণ ॥ ১ ॥
উৎসর্গের জন্য ঋত্বিকরা ধরে নিয়ে যাচ্ছেন ছাগ
সুন্দর স্বর্ণাভরণে বিভূষিত অশ্বের সম্মুখে।
বিবিধ বর্ণের ছাগ সেই দিকে যাচ্ছে শব্দ করে,
এরা প্রিয় অন্ন হোক ইন্দ্র ও পূষার ॥ ২ ॥
পূষারই ভাগে পড়ে সকল দেবতার উপযুক্ত ছাগ,

দ্রুতগতি অশ্বের সাথে সম্মুখে আনা হচ্ছে একে।
অশ্বের সাথে ঐ অজ থেকে পুরোডাশ তৈরি করুণ ত্বষ্টা
দেবতাদের সুভোজনের জন্য ॥ ৩ ॥
ঋত্বিকরা যখন প্রতি ঋতুতে তিনবার নিয়ে যান অগ্নির নিকটে
দেবতাদের লভ্য হবির্যোগ্য অশ্বকে,
সে সময়ে অগ্রে গমন করে পূষার প্রথম ভাগের ছাগ
প্রচার করে দেবতাদের যজ্ঞের কথা ॥ ৪ ॥
হোতা অধ্বর্যু আবয়া অগ্নিমিন্ধ
গ্রাবগ্রাভ শংস্তা ও মেধাবী ব্রহ্মা,
এঁরা সকলে পরিপূর্ণ করুন নদীসকল
প্রসিদ্ধ অলঙ্কৃত ও সুন্দর যজ্ঞ দিয়ে ॥ ৫ ॥
যারা যূপবৃক্ষ ছেদন করে ও তা বহন করে যারা,
আর যারা যষাল তৈরি করে অশ্ব যূপের জন্য,
যারা সংগ্রহ করে অশ্বের জন্য পাকপাত্র,
আমাদের সঙ্কল্পই যেন হয় তাদেরও সঙ্কল্প ॥ ৬ ॥
আমার মনোরথ সিদ্ধ হোক আপনিই,
দেবতাদের আশা পূরণের জন্য আসুক মনোহর পৃষ্ঠের অশ্ব।
আমরা তাকে উত্তমরূপে বন্ধন করব তাঁদের পুষ্টির জন্য,
আনন্দিত হোন মেধাবী ঋত্বিকগণ ॥ ৭ ॥
অশ্বের গ্রীবা ও পদ বদ্ধ হয় যে রজ্জু দ্বারা,
আর যে রজ্জু বদ্ধ থাকে তার মস্তকে,
তার মুখে নিক্ষেপ করা হয় যে ঘাস,
সে সমস্তই যাক দেবগণের নিকটে ॥ ৮ ॥
মক্ষিকা ভক্ষণ করে অশ্বের যে অপক্ক মাংস,
ছেদন ও পরিস্কারের সময়ে যা লিপ্ত হয় অস্ত্রে,
ছেদকের দুই হাতে ও নখে যা থাকে লিপ্ত হয়ে,
সে সমস্তই যাক দেবগণের নিকটে ॥ ৯ ॥
বার হয়ে যায় উদরের যে অজীর্ণ তৃণ,
লেশমাত্র থাকে যে অপক্ক মাংসের,
তা নির্দোষ করুন ছেদনকর্তা,
পাক করুন পবিত্র মাংস দেবতাদের উপযোগী করে ॥ ১০ ॥
হে অশ্ব, যে রস বার হয় তোমাকে পাক করবার সময়,
আর যে অংশ আবদ্ধ হয়ে থাকে শূলে,

তা যেন ভূমিতে না পড়ে ও মিশ্রিত হয় তৃণের সঙ্গে।
সমস্তই যেন প্রদান করা হয় লালায়িত দেবতাদের ॥ ১১ ॥
যারা দেখে অশ্বের পাক চারিদিক থেকে,
বলে, মনোহর হয়েছে গন্ধ, নামাও এবার,
আর যারা অপেক্ষা করে মাংস ভিক্ষার জন্য,
তাদের সংকল্প হোক আমাদেরই সংকল্প ॥ ১২ ॥
যে কাষ্ঠদণ্ড ভাণ্ডে দেয় মাংস পাক পরীক্ষার জন্য,
যে পাত্রে রস রক্ষা হয় ও আচ্ছাদন হয় উষ্ণতা রক্ষায়,
যে বেতস শাখায় চিহ্নিত হয় অবয়র ও ছুরিকা,
এরা সকলেই প্রস্তুত করছে অশ্বের মাংস ॥ ১৩ ॥
যে স্থানে অশ্ব গিয়েছিল ও করেছিল উপনিবেশ,
যে স্থানে লুণ্ঠন করেছিল ও পদবদ্ধ হয়েছিল যা দিয়ে,
সে যা পান করেছিল ও আহার করেছিল যে ঘাস,
সে সমস্তই যাক দেবগণের নিকটে ॥ ১৪ ॥
হে অশ্বগণ, ধূম গন্ধী অগ্নি যেন না পারে শব্দ করাতে,
প্রতপ্ত সুগন্ধী ভাণ্ড যেন চলিত না হয় অগ্নির সংযোগে,
দেবগণ গ্রহণ করুন সম্মুখে প্রদত্ত যজ্ঞের অভিপ্রেত
হোমের জন্য আনীত বষট্‌কারে শোভিত অশ্বকে ॥ ১৫ ॥
যে বস্ত্রে আচ্ছাদিত করা হয় অশ্বকে,
তাকে প্রদান করা হয় যে হিরণ্ময় আভরণ,
যা দিয়ে বন্ধন করা যায় তার মস্তক ও চরণ,
সবই দেবতাদের প্রিয়, তাঁদেরই প্রদান করছেন ঋত্বিকগণ ॥ ১৬ ॥
হে অশ্ব, তুমি সবলে নাসাধ্বনি করে গমনে বিরত হলে
যে ব্যথা পেয়েছিলে কশাঘাতে ও পার্ষ্ণিদেশে পদাঘাতে,
মন্ত্র দিয়ে আহুতি প্রদান করি তোমার সেই সমস্ত ব্যথা,
যেমন করে স্রুক দিয়ে হব্য প্রদত্ত হয় যজ্ঞে ॥ ১৭ ॥
দেব বন্ধু অশ্বের বক্র পার্শ্বাস্থি চৌত্রিশটি,
তা ছেদনের জন্য গমন করছে খড়্গ।
হে অশ্বছেদক, দেখ যেন ছিন্ন ভিন্ন না হয় অন্য অঙ্গ
শব্দ করে দেখে দেখে ছেদন কর পর্বে পর্বে ॥ ১৮ ॥
তেজপুঞ্জ অশ্বের একমাত্র বিনাশকর্তা ঋভূ,
তাকে ধারণ করে দুজন।
হে অশ্ব, যথাকালে কর্তন করি তোমার যে সব অবয়ব
তা অগ্নিতে প্রদান করি পিণ্ডাকারে ॥ ১৯ ॥

হে অশ্ব, দেবতাদের নিকটে যাবার সময়
যেন ক্লেশ না দেয় তোমার প্রিয় দেহ,
খড়্গ যেন বেশিক্ষণ না থাকে তোমার অঙ্গে,
মাংসলোলুপ অনভিজ্ঞ ছেদক যেন তার অস্ত্র দিয়ে
যেন বৃথা ছিন্ন না করে তোমার অঙ্গ ॥ ২০ ॥
হে অশ্ব, মরছ না তুমি, তোমাকে হিংসা করছে না লোকে,
তুমি যাচ্ছ দেবতাদের নিকটে উত্তম পদে।
তোমার রথ বইবে ইন্দ্র ও মরুতের বাহন হরি ও পৃষতী,
রাসভের বদলে রথে যুক্ত হবে দ্রুত গতি অশ্ব ॥ ২১ ॥
এই অশ্ব আমাদের প্রদান করুন জগৎ পোষক ধন,
প্রদান করুন পুত্র ও অপত্য।
পাপ থেকে বিরত করুক এই তেজস্বী অশ্ব,
হবির্ভূত অশ্ব আমাদের প্রদান করুক শারীরিক বল ॥ ২২ ।

উপরে সম্পূর্ণ সূক্তটির অনুবাদ দেওয়া হল। মনে হচ্ছে যে এই অশ্বযজ্ঞ যেন কোন উৎসবে ভোজের ব্যাপার। অশ্ব বলি থেকে আরম্ভ করে তার মাংস কেটে দুভাবে রন্ধন করা হত। ভাণ্ডে মাংস সিদ্ধ করা হত এবং তা সুসিদ্ধ হয়েছে কিনা তা দেখা হত কাঠি দিয়ে পরীক্ষা করে। শূলে বিদ্ধ করেও পাক করা হত—শিক কাবাব বা রোস্ট্। সন্দেহ হয় যে নূতন জায়গায় উপনিবেশ স্থাপনের জন্য অশ্বের ব্যবহার ছিল এবং অশ্বকে অনুসরণ করে সেই উপনিবেশ স্থাপন করা হত। অশ্ব যজ্ঞ বোধ হয় উপনিবেশ স্থাপনেরই উৎসব। এই উৎসবে দেবতাদের আহ্বান করা হয়। এটি একটি প্রাচীন প্রথা বলে মনে হয়। দীর্ঘ দিন পূর্বে দেবতা জাতির বাস ছিল ইলাবৃত বর্ষ অর্থাৎ বর্তমান ভারতের উত্তরে পামির অঞ্চলে। তাঁরাই বোধ হয় যজ্ঞ নামে কোন সামাজিক উৎসব প্রবর্তন করেছিলেন এবং এই জন্যই পরবর্তী কালে তাঁদের স্মরণ করা হত। বোঝা যাচ্ছে যে অশ্বের মাংস দেবতাদের খুব প্রিয় ছিল এবং এই বর্ণনা পড়ে মনে হয় যে এই সূক্ত রচনার সময়ও এই মাংস জনসাধারণের কাছে পরম উপাদেয় ছিল।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে বৈদিক যুগে গরু ও মহিষের ম্যংসও খাওয়া হত। অনেক সূক্তে যজ্ঞে গো মাংস আহুতি দেবারও উল্লেখ আছে। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। ষষ্ঠ মণ্ডলের ১৭ সূক্তে ভরদ্বাজ ঋষি ইন্দ্র দেবতার উদ্দেশে বলছেন—

হে ইন্দ্র, মরুৎরা সম্প্রীতিভাজন হয়ে
তোমাকে বর্ধিত করেন, স্তোত্র দিয়ে।

তোমার জন্য শত মহিষ পাক করুন পূষা ও বিষ্ণু,
তিনটি নদী প্রবাহিত হোক মদকর শত্রুনাশক সোমে পূর্ণ
॥ ৬।১৭।১১ ॥

অর্থাৎ এমন একটি উৎসব হোক যেখানে শত মহিষ পাক হবে এবং তিনটি নদী বয়ে যাবে সোমরসের।

দশম মণ্ডলে রেণু ঋষি ইন্দ্র দেবতার উদ্দেশে বলছেন—

হে ইন্দ্র, যে অস্ত্রে বিদীর্ণ করলে পাপাত্মা রাক্ষসকে,
কোথায় রইল তোমার সেই নিক্ষেপের অস্ত্র ?
গাভীরা যেমন হত হয় গোহত্যার স্থানে,
তেমনি তোমার অস্ত্রে নিহত হয়ে শয়ন করে পৃথিবীতে
বন্ধুদ্বেষী রাক্ষসেরা ॥ ১৮।৮৯।১৪ ॥

এই ঋক দেখেই বলা হয় যে গোহত্যা সেকালে বিশেষরূপে প্রচলিত না থাকলে গোহত্যার জন্য ভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট থাকা সম্ভব হত না।

দশম মণ্ডলের ৮৬ সূক্তেও ঋষিরা বলছেন—

হে বৃষাকপিবণিতা, ধনশালিনী তুমি,
সুপুত্রা ও সুন্দরী পুত্রবধূ আমার,
ইন্দ্র ভক্ষন করুন তোমার বৃষদের,
অতি চমৎকার সুখকর হোমদ্রব্যও ॥ ১৩ ॥
আমার জন্য পাক করে দাও পনর কুড়িটি বৃষ,
তা খেয়ে শরীর স্থূল করি আমি।
পূর্ণ হোক আমার উদরের দুই পার্শ্ব
সবার শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র ॥ ১০।৮৬।১৪ ॥

সেকালে বোধহয় একটি গল্প প্রচলিত ছিল যে বৃষাকপি নামে ইন্দ্রের কোন প্রিয় পাত্র ইন্দ্রেরই প্রাপ্য যজ্ঞ সামগ্রী নষ্ট করেছিল এবং যজমান ও ইন্দ্রাণী তাতে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এই ঋক দুটি বৃষাকপির বণিতার উদ্দেশে রচিত এবং এতেও বৃষ ভক্ষণের কথা আছে।

দশম মণ্ডলের ২৭ সূক্তে বসুক্র ঋষি ইন্দ্র দেবতার উদ্দেশ্যে বলছেন—

যারা অনুষ্ঠান করে না দৈব কর্মের,
স্ফীত হয় শুধু নিজের উদর পূরণ করে,
তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাই যখন আমি,
তখন, হে ইন্দ্র, পুরোহিতদের সঙ্গে পাক করি একত্রে
স্থূলকায় বৃষ এবং তোমারই জন্য প্রস্তুত করি সোমরস
পঞ্চদশ তিথির প্রত্যেক তিথিতে ॥ ১০।২৭।২ ॥

যজ্ঞে গোমাংস যে অগ্নিতে আহুতি দেওয়াও হত, তারও স্পষ্ট উল্লেখ

আছে। ষষ্ঠ মণ্ডলের ১৬ সূক্তে ভরদ্বাজ ঋষি অগ্নি দেবতার উদ্দেশে বলছেন—

হে অগ্নি, হৃদয় দিয়ে আমরা তোমাকে
হব্য প্রদান করছি সংস্কৃত ঋক্,
বলশালী বৃষভ ও ধেনুরাও তোমার নিকট
হব্য হোক পূর্বোক্ত রূপে ॥ ৬।১৬।৪৭ ॥

শুধু মাংস নয়, সোমরস না হলে যজ্ঞ হত না। মাংসের সঙ্গে সোমপান করা হত অবাধে। ঋষিরা যে সোমরসের ভক্ত ছিলেন, তা নবম মণ্ডলের সমস্ত সূক্তেই প্রকাশ করেছেন। ৬৭ সূক্তে ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গৌতম, অত্রি, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বসিষ্ঠ ও পবিত্র এই কয়েকজন ঋষি পবমান সোম ও অগ্নি দেবতার উদ্দেশে বলছেন—

হে ক্ষরণশীল সোম, তুমি দান কর আনন্দ,
বলশালী তুমি, ধারারূপে ক্ষরিত হও এই যজ্ঞে
ধন বিতরণ করতে করতে ॥ ১ ॥
নিষ্পীড়িত হয়ে তুমি আনন্দিত ও উন্মত্ত কর মানুষকে,
পণ্ডিত ও ধনদানকর্তা তুমি, হে সোম,
ইন্দ্রের আহার হয়ে তাকে আহ্লাদিত কর তুমি ॥ ২ ॥
তুমি ধারণ কর উত্তম জাজ্জ্বল্যমান তেজ
প্রস্তরে নিষ্পীড়িত হয়ে ॥ ৩ ॥
হরিৎ বর্ণ সোমরস নিষ্পীড়িত হয়ে প্রস্তরে
নির্গত হচ্ছে মেষ লোমের মধ্য দিয়ে।
যেন অন্ন অন্ন শব্দ করছে এই রূপ ॥ ৪ ॥
হে সোমরস, তুমি যদি নির্গত হও মেষলোমের মধ্য দিয়ে,
তাহলে লাভ হয় সম্পত্তি, খাদ্য, বলবীর্য ও গোধন ॥ ৫ ॥
হে সোমরস, আমাদের তুমি এনে দাও সম্পত্তি,
শত শত গোধন ও সহস্র ঘোটক ॥ ৬ ॥
এই সোমরস শীঘ্র নিগত হয়ে মেষলোমের মধ্য দিয়ে
ব্যপ্ত হল ইন্দ্রের সর্ব শরীরে প্রবেশ করে মুহুর্মুহু ॥ ৭ ॥
সব শ্রেষ্ঠ পদার্থ এই সোমরস
নিষ্পীড়িত করেছিলেন ইন্দ্রের জন্য আমাদেরই পূর্ব পুরুষ।
নিজে ক্রিয়াতৎপর বলে ক্ষরিত হয় তারই জন্য ॥ ৮ ॥
এই যে সোম, ইনি কর্ম তৎপর করেন সকলকে,
অতি মধুর রস প্রদান করেন ক্ষরিত হয়ে।

তিনি চালিত হচ্ছেন অঙ্গুলি দ্বারা,
বচন রচনা দ্বারা হচ্ছে তাঁর গুণগান ॥ ৯ ॥
যে পূষা গমন করেন ছাগ বাহনে,
তিনি যেন রক্ষা করেন আমাদের যাত্রা কালে।
আমরা যেন সুশ্রী নারী লাভ করি তাঁর প্রসাদে ॥ ১০ ॥
এই সোমরস ক্ষরিত হচ্ছে ঘৃতের মতো মধুর মতো
কপর্দী নামে দেবতার উদ্দেশে।
আমরা যেন লাভ করি বহু সংখ্যক সুশ্রী নারী ॥ ১১ ॥
হে তেজপুঞ্জ, তোমার জন্য নিষ্পীড়িত হয়ে
এই সোমরস ক্ষরিত হচ্ছে ঘৃতের মতো নির্মল ভাবে।
আমরা যেন লাভ করি বহু সংখ্যক সুশ্রী নারী ॥ ১২ ॥
হে সোম, তুমি উত্তেজিত কর কবিদের রচনা।
প্রার্থনা করি, তুমি ক্ষরিত হও ধারা রূপে।
দেবতাদের জন্য তুমি স্থাপন করে থাক রত্ন ॥ ১৩ ॥
শ্যেন পক্ষী যেমন প্রবেশ করে সুন্দর কুলায়ে,
সোমরস তেমনি সশব্দে প্রবেশ করছে কলসে ॥ ১৪ ॥
হে সোম, তোমার নিষ্পীড়িত রস আছে কলসের মধ্যে।
তা সর্বত্র গতায়াত করছে শ্যেন পক্ষীর মতো ॥ ১৫ ॥
হে সোম, তোমার মতো মধুর বস্তু নেই কিছুই,
তুমি ক্ষরিত হও ইন্দ্রের আনন্দ বিধানের জন্য ॥ ১৬ ॥
এই সোমরস প্রস্তুত হয়েছে দেবতাদের উদ্দেশে,
এরা রথের মতো হরণ করে আনে বিপক্ষের সম্পত্তি ॥ ১৭ ॥
আর কিছু নেই সোমরসের মতো আনন্দকর পদার্থ,
প্রস্তুত হবার সময়ে শব্দ করতে লাগল তারা ॥ ১৮ ॥
এই সোমরস নিষ্পীড়িত হয়েছে প্রস্তরে,
গুণগান করা হয়েছে এর, যাচ্ছে পবিত্রের উপর ॥ ১৯ ॥
এই যে সোম নিষ্পীড়িত হয়েছেন, গুণগান করা হচ্ছে এঁরই,
ইনি হনন করেন রাক্ষসদের,
এখন পবিত্রকে অতিক্রম করে যাচ্ছেন মেষলোমে ॥ ২০ ॥
হে ক্ষরণশীল সোম, নষ্ট কর তুমি
আমার দূর ও নিকটের সমস্ত ভয় ॥ ২১ ॥
পবিত্রের মধ্য দিয়ে ক্ষরিত হয়ে পবিত্র করুন আমাদের
সেই বিশ্বনিরীক্ষণকারী সোমরস,
পবিত্র করাই তো তাঁর স্বভাব ॥ ২২ ॥

হে অগ্নি, সে পবিত্র গুণ আছে তোমার শিখায়,
তাই দিয়ে পবিত্র কর আমাদের দেহ ॥ ২৩ ॥
হে অগ্নি, তোমার শিখা দিয়ে পবিত্র কর আমাদের,
পবিত্র কর সোমরস নিষ্পীড়ন করে ॥ ২০ ॥
হে দেব সবিতা, শোধন কর আমার সর্ব ভাগ
পবিত্র ও সোম নিষ্পীড়ন এই উভয়ের দ্বারা ॥ ২৫ ॥
হে সোম, তুমিই সবিতা, অগ্নিও তুমিই,
পবিত্র কর তোমার এই তিন বিপুল ও কার্যক্ষম মূর্তিতে ॥২৬॥
আমাকে পবিত্র করুন দেবতারা,
বসুগণ তাঁদের পবিত্র করুন নিজ কাজে।
হে অশেষ দেবতা, পবিত্র কর আমাকে,
হে অগ্নি, আমাকে তুমি কর শোধন ॥ ২৭ ॥
হে সোম, তুমি প্রবহমান হও সকল ধারা সহকারে,
আমাদের আপ্যায়িত কর বিশেষ রূপে,
তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ আহার দেবতাদের ॥ ২৮ ॥
যে সোমরস সকলের প্রীতির পাত্র,
যিনি শব্দ করতে থাকেন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে,
যাঁকে বর্ধিত করতে হয় আহুতি দ্বারা,
আমরা তাঁরই নিকটে আসছি নমস্কার করতে করতে ॥ ২৯ ॥
যাতে নষ্ট হয় বিপক্ষের সর্বস্থান আক্রমণকারী কুঠার,
হে দেব সোম, তুমি ক্ষরিত হও সেই রূপে,
সংহার কর সেই পীড়াদায়ক শত্রুকে ॥ ৩০ ॥
যাঁরা অধ্যায়ন করেন ঋষিদের রসশালিনী রচনায়
পবমান সোমের এই সব শ্লোক,
তাঁরা আহার করেন সব প্রকার পবিত্র খাদ্য,
যা আহার করেছেন বায়ু ॥ ৩১ ॥
যিনি অধ্যয়ন করেন ঋষিদের রসময়ী রচনা,
পবমান সোম বিষয়ক এই সব শ্লোক,
সরস্বতী তাঁকে দোহন করে দেন
ঘৃত দুগ্ধ ও সুমধুর জল। ৯।৩৭।৩২ ॥

এই সূক্তটি মনোযোগ সহকারে পড়বার পর কোন সন্দেহ থাকে না যে বৈদিক যুগের সমস্ত বিখ্যাত ঋষিরাই সোমরসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। লতা পাথরে পিষে মেষলোমের ছাঁকনিতে ছেঁকে কলসীতে রাখা হত। যজ্ঞে ব্যবহৃত হত দেবতাদের প্রিয় খাদ্য রূপে। তাতে

দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি হত এবং মানুষকে আনন্দিত ও উন্মত্ত করত। তারা প্রার্থনা জানাত সুশ্রী নারী লাভের জন্য। শুধু যজ্ঞে নয়, শুঁড়িখানায় সুরাপানের চলও ছিল। প্রথম মণ্ডলের ১৯১ সূক্তে অগস্ত্য ঋষি বলছেন—

শৌণ্ডিকের গৃহে চর্মময় সুরাপানের ন্যায়
আমি বিষ নিক্ষেপ করছি সূর্যমণ্ডলে।। ১।১৯১।১০ ।।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সমাজে তখন ব্যাভিচারিণী কুলটা ও সাধারণী অর্থাৎ বারাঙ্গনা বা পণ্যা নারীও ছিল। ব্যাভিচারিণী নারীর উল্লেখ করা হয়েছে ২।২৯।১, ৪।৫।৫, ১৩।৩০।৪, ১০।৪০।৬ প্রভৃতি ঋকে। সপ্তম মণ্ডলে বসিষ্ঠ ঋষি উষা দেবতার উদ্দেশে বলছেন—

হে উষা. যে সব জ্যোতি প্রকাশ হয় সূর্যোদয়ের পূর্বে,
তাদের গুণে তুমি কুলটার মতো না হয়ে পরিদৃষ্ট হও
পতি সমীপগামিনী রমণীর মতো ।। ৭।৭৬।৩ ।।

প্রথম মণ্ডলের ১৬৭ সূক্তে অগস্ত্য ঋষি বলছেন—

বিদ্যুতের সাথে মিশ্রিত হচ্ছে শুভ্রবর্ণ অভিগমনশীল মরুৎগণ,
সাধারণী স্ত্রীর মতো আলিঙ্গনপরায়ণ ।। ১।১৬৭।৪ ।।

মূলে সাধারণী শব্দটিই ব্যবহৃত হয়েছে। এর থেকেই মনে হয় যে সেকালে বারাঙ্গনাকেই সাধারণী বলা হত।

দ্যূত বা অক্ষক্রীড়ায় মানুষের আসক্তি ছিল অপরিসীম। চিত্ত বিনোদনের জন্যই এই অক্ষ বা পাশা খেলার চল হয়েছিল, কিন্তু পরে তা একটি ভয়ংকর অকল্যাণকর সামাজিক ব্যসনে পরিণত হয়েছিল। পাশা খেলার জন্য একটি সভা থাকত। খেলা হত তিপ্পান্নটি ঘুঁটি নিয়ে। বিধবা স্ত্রীলোকও এই সব সভার সঙ্গে যুক্ত থাকত ধনার্জনের লোভে। প্রথম মণ্ডলের ১২৪ সূক্তে কক্ষীবাণ ঋষি বলছেন—

ভ্রাতৃ রহিতা নারী যেমন পুরুষের নিকটে আসে অভিমুখী হয়ে,
গত ভর্তৃকা যেমন গৃহে আরোহণ করে ধন লাভের জন্য,
উষাও করেন তাই।
পতি অভিলাষিণী জায়া যেমন স্মিত হাসেন সুবেশা হয়ে,
উষাও করেন তাই ।। ১।১২৪।৭ ।।

মূলে যে গর্তা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ গৃহ। কিন্তু নিরুক্ত অনুসারে গর্তার অর্থ দ্যূত ক্রীড়ার স্থান। এই ঋক থেকেই জানা যায় যে পতিহীনা নারী দ্যূত ক্রীড়ার দ্বারা অর্থলাভ করত। পাশা খেলে, না খেলা পরিচালনা করে, অথবা দ্যূত ক্রীড়ার গৃহে অন্য কোন উপায়ে, তা বলা যায় না। তবে বোঝা যায় যে সমাজে এসব এমন ভীষণ আকার ধারণ করেছিল যে দশম মণ্ডলে কবষ ঋষি অক্ষ ও দ্যূতকার দেবতার

উদ্দেশে ত্রিষ্টুপ ও জগতী ছন্দে একটি সম্পূর্ণ সূক্ত রচনা করে সেই অবস্থার হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা করেছেন। ঋষি বলছেন—

বড় বড় পাশাগুলি যখন ইতস্তত সঞ্চালিত হয় ছকের উপর,
বড় আনন্দ হয় আমার তাই দেখে।
যে চমৎকার সোমলতা জন্মে মুজবান পর্বতে,
তার রস পান করতে যেমন প্রীতি জন্মে,
আমার কাছে তেমনি প্রীতিকর সেই বিভীত কাঠের অক্ষ,
আমাকে তা উৎসাহিত করে ঠিক তেমনি করে ॥ ১ ॥
কখনও আমার প্রতি প্রদর্শন করে নি বিরাগ
আমার এই রূপবতী পত্নী,
কখনও লজ্জিত হয় নি আমার নিকটে,
বিশেষ সেবা শুশ্রূষা করেছে আমার ও বন্ধুবর্গের,
কিন্তু আমি ত্যাগ করলাম সেই অনুরাগিণী ভার্যাকে
কেবল মাত্র পাশারই অনুরোধে ॥ ২ ॥
যে পাশা খেলে, তার উপর বিরক্ত তার শ্বশ্রূ,
তাকে ত্যাগ করে তার স্ত্রী।
যাচ্ঞা করলে কারও কাছে, দেবার লোক নেই কেউ।
কেউ যেমন বৃদ্ধ ঘোটক ক্রয় করে না মূল্য দিয়ে,
তেমনি দ্যূতকারও পায় না কারও নিকটে সমাদর ॥ ৩ ॥
বিষম কঠিন এই পাশার আকর্ষণ।
যদি কারও ধনের উপরে পতিত হয় পাশার লোভ দৃষ্টি,
তাহলে তার পত্নীকে স্পর্শ করে অন্যে।
আমরা একে চিনি না, বলে তার পিতামাতা ও ভ্রাতারা,
বলে, বেঁধে নিয়ে যাও একে। ৪ ॥
আমি যখন মনে ভাবি, খেলব না আর এই পাশা,
তখন সরে যাই খেলার সঙ্গীদের দেখলে।
কিন্তু পারি না স্থির থাকতে
সুন্দর পিঙ্গল মূর্তির পাশা ছকের উপরে দেখে।
ভ্রষ্টা নারী যেমন গমন করে উপপতির নিকটে,
আমিও তেমনি যাই খেলার সঙ্গীদের ভবনে ॥ ৫ ॥
দ্যূতকার ক্রীড়া সভায় আসে বুক ফুলিয়ে
আস্ফালন করে আমি জিতব বলে।
কিন্তু কখন কি অভিলাষ পূর্ণ করে পাশা?
যা কিছু অভিপ্রায় করে বিপক্ষের প্রতি,
তাই বুঝি সিদ্ধ হয়ে যায় সকলি ॥ ৬ ॥

কখনও সেই পাশা অঙ্কুশে আকর্ষণ করে,
যেন বিদ্ধ করে বাণের মতো, কর্তন করে ছুরিকার মতো।
আর সন্তাপ দেয় তপ্ত বস্তুর মতো।
জয়ীর নিকটে পাশা যেন পুত্র জন্মের তুল্য,
যেন মধুময়, যেন সম্ভাষণ করে মিষ্ট বাক্যে।
আর যেন নিধন করে পরাজিত ব্যক্তিকে ॥ ৭ ॥
এই যে দেখছ তিপ্পান্নটি পাশার ঘুঁটি,
এরা ছকের উপরে বিহার করে মিলিত হয়ে,
সত্য স্বরূপ সূর্যদেবের বিশ্বভুবন বিহারের মতো।
যত বড় দুর্ধর্ষ হোন, এরা বশীভূত নয় কারও।
রাজাও এদের করেন নমস্কার ॥ ৮ ॥
এরা কখনও নিচে নামছে, উপরে উঠছে কখনও,
হাত নেই এদের, কিন্তু এদের কাছে পরাজিত হয় হাত,
এরা সুশ্রী, ছকের উপরে বসে জলন্ত অঙ্গারের মতো।
স্পর্শ এদের শীতল, কিন্তু দগ্ধ করে হৃদয় ॥ ৯ ॥
দ্যূতকারের স্ত্রী পরিত্যাগ করে দীনহীন বেশে,
মাতা ব্যাকুল হয় পুত্র কোথায় বেড়াচ্ছে ভেবে।
যে তাকে ধার দেয়, সে শঙ্কিত ধন ফিরে পাবার চিন্তায়।
পরের গৃহে রাত কাটাতে হয় দ্যূতকারকে ॥ ১০ ॥
দ্যূতকারের হৃদয় বিদীর্ণ হয় নিজের স্ত্রীর দুদশা দেখে,
পরিতাপ হয় অন্যের স্ত্রীর সৌভাগ্য ও গৃহ দেখে।
প্রাতে হয় গতিবিধি করে সুশ্রী ঘোটক যোজনা করে,
সন্ধ্যায় অগ্নিসেবা করে নীচের মতো শীত নিবারণে ॥ ১১ ॥
হে পাশাগণ, তোমাদের মধ্যে যে প্রধান রাজার তুল্য,
তাঁকে আমি প্রণাম করছি দশ অঙ্গুলি একত্র করে,
অর্থ চাই না আমি তোমাদের নিকটে, বলছি সত্য করে ॥ ১২ ॥
হে দ্যূতকার, কখনও খেলো না পাশা, বরং কর কৃষি কার্য,
সেই লাভেই সন্তুষ্ট হও, কৃতার্থ বোধ কর আপনাকে।
তাতে পত্নী পাবে, পাবে অনেক গাভী।
এই যে প্রভু সূর্য দেব ইনি বলে দিয়েছেন আমাকে ॥ ১৩ ॥
হে পাশাগণ, আমাদের বন্ধু হও, কল্যাণ কর আমাদের,
আমাদের প্রতি প্রয়োগ কোরো না তোমাদের দুর্ধর্ষ প্রভাব।
তোমাদের কোপ দৃষ্টিতে যেন পড়ে আমাদের শত্রু,
অপরে যেন ব্যাপৃত থাকে তোমাদের ব্যবহার করতে ॥ ১৪ ॥

সংস্কার-কুসংস্কার ও জ্ঞান-বিজ্ঞান কেমন ছিল

এই সমাজেরই একটি ভিন্ন ধরনের চিত্র দেখতে পাই সংকুসুক ঋষির সমাধি স্তোত্রে। দশম মণ্ডলের ১৮ সূক্তে তিনি মৃত্যু ধাতা ত্বষ্টা অগ্নি-সংস্কার দেবতার উদ্দেশে বলছেন—

হে মৃত্যু, তুমি ফিরে যাও অন্য পথে,
ত্যাগ কর দেবলোকে যাবার পথ।
চোখ আছে তোমার, শুনতে পাও তুমি, তাই বলছি,
তুমি হিংসা কোরো না আমাদের সন্তান ও বন্ধুকে ॥ ১ ॥
ছেড়ে দাও তোমরা মৃত্যুর পথ,
তাহলেই পাবে দীর্ঘ ও উৎকৃষ্ট আয়ু,
পূর্ণ হবে তোমাদের গৃহ ধনে ও সন্তানে।
তোমরা শুদ্ধ ও পবিত্র হও, কর যজ্ঞের অনুষ্ঠান ॥ ২ ॥
এরা জীবিত আছে, মৃতদের কাছে এসেছে ফিরে,
আজ কল্যাণকর হয়েছে আমাদের যজ্ঞ।
এসো, আমরা হাসি আর নাচি ভাল করে,
পেয়েছি আমরা দীর্ঘ ও সুন্দর জীবন ॥ ৩ ॥
জীবিতদের চারিদিক ঘিরে দিচ্ছি এই বেষ্টন,
এতে রোধ করা হবে মৃত্যুকে।
এরা বেঁচে থাক শত বৎসর,
মৃত্যু যেন পাহাড় ডিঙিয়ে কাছে আসতে না পারে ॥ ৪ ॥
দিন যায় একের পর এক,
ঋতুর পর ঋতু চলে যায় অবাধে।
যে পরে এসেছে সে মরবে না আগে,
হে বিধাতা, এই রকমই কর এদের আয়ু ॥ ৫ ॥
দীর্ঘায়ু হও তোমরা, আচ্ছন্ন হও জরায়,
ছোট-বড়র নিয়মে কাজ কর আগে ও পরে।
সুজন্মা ত্বষ্টা দিচ্ছেন তোমাদের দীর্ঘায়ু,
তাহলেই তোমরা বেঁচে থাকবে অনেক দিন ॥ ৬ ॥
এই সব নারী যেন অনুভব না করে বৈধব্য দুঃখ,
মনোমত পতি পেয়ে গৃহে যাক অঞ্জন ও ঘৃতের সাথে।
বধূরা যেন না করে অশ্রুপাত,
উত্তম রত্ন ধারণ করে সবাগ্রে গৃহে যাক অকাতরে ॥ ৭ ॥
ওঠো,সংসারের দিকে ফিরে চল, ওগো নারী।

তুমি যার পাশে শুতে যাচ্ছ সে নেই আর বেঁচে।
চলে এসো, যে তোমার গর্ভাধান করেছিল পাণিগ্রহণ করে,
তার কাছে শেষ হয়ে গেছে তোমার জায়ার কর্তব্য ॥ ৮ ॥
মৃতের হাত থেকে আমি গ্রহণ করলাম ধনু,
এতে আমাদের লাভ হবে তেজ ও বল।
হে মৃত, এখানেই থাকো তুমি,
আমরা যেন শত্রু জয় করতে পারি বীরদের সঙ্গে একত্র হয়ে ॥৯।
হে মৃত, তুমি সুন্দর পৃথিবীর কাছে যাও, সর্বব্যাপী তিনি।
তাঁর স্পর্শ পাবে যুবতী স্ত্রীর মতো পশম কোমল।
তুমি দক্ষিণা দান করেছ যজ্ঞ করে,
তিনি যেন রক্ষা করেন তোমাকে নিঋৃতি থেকে ॥ ১০॥
ওগো পৃথিবী, তুমি উন্নত করে রাখো এই মৃতকে,
ভালো জিনিষ দাও, দাও প্রলোভন, দিও না পীড়া।
মা যেমন আঁচল দিয়ে ঢাকে সন্তানকে,
তেমনি তুমিও রাখো একে আচ্ছাদন দিয়ে ॥ ১১ ॥
মৃতের উপরে স্তূপাকার হয়ে থাকুন পৃথিবী,
এর উপরে থাক সহস্র ধূলিকণা,
ঘৃতপূর্ণ গৃহের মতো হোক তারা,
তারাই এখানে থাক এর আশ্রয় হয়ে ॥ ১২ ॥
তোমার উপরে রাখছি পৃথিবীকে, রাখছি একটি ঢিল,,
তাতে মাটি নষ্ট করতে পারবে না তোমাকে।
পিতৃলোকরা ধারণ করুন এই খুঁটিকে,
এখানেই তোমার আবাস নিরূপণ করুন যম ॥ ১৩ ॥
বাণের উপর যেমন বক্র ভাবে রাখে পর্ণ
তেমনি আমি অর্পিত হলাম এই ক্লেশকর দিবসে।
যেমন রশ্মি দিয়ে রুদ্ধ করে অশ্বকে,
তেমনি আমিও রোধ করলাম দুঃখের বাক্য ॥ ১৪ ॥

এই সূক্তটি থেকে আমরা বৈদিক সমাজের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারি। সেকালে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল কিনা এই নিয়ে এক সময়ে বিতর্কের অন্ত ছিল না। এই সূক্তের সপ্তম ঋকের শেষে এই শব্দগুলি আছে, আরোহন্ত জনয়ঃ যোনিং অগ্রে। ঋগ্বেদের কোন খানে সতীদাহের উল্লেখ নেই, কিন্তু 'অগ্রে' শব্দের পরিবর্তে 'অগ্নেঃ' শব্দ পাঠ করে এক সময় পণ্ডিতরা সতীদাহ প্রথা সুসম্মত বলে বিবেচনা করেছিলেন। তাঁদের ভ্রম এখন সংশোধিত হয়েছে। অষ্টম ঋকে শ্মশানে

মৃত ব্যক্তির বিধবার প্রতি প্রবোধ বাক্য দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে সতীদাহ প্রথা তো প্রচলিত ছিলই না। বিধবাকে শ্মশান থেকে গৃহে ফিরিয়ে আনারই ব্যবস্থা ছিল, এমন কি দেবরকে বিবাহ করার প্রথাও ছিল ॥ ১০।১৮।০।২ ॥

এই সূক্তের ১০ থেকে ১২ সূক্ত পাঠ করলে মনে হয় যে মৃতদেহ মাটির নিচে সমাধিস্থ হত। সায়নের মতে মৃত ব্যক্তিকে দাহ করে অস্থি সঞ্চয়ের সময় এই তিনটি ঋক পাঠ করা হত। কিন্তু মূলে অস্থির উল্লেখ নেই। কাজেই সেকালে মৃতদেহ মাটিরে নিচে কবর দেওয়া হত ভাবলে অন্যায় হবে না।

আর একটি এই রকমের বিতর্কিত বিষয় হল নরবলি প্রথা। বৈদিক সমাজে নরবলির প্রথা প্রচলিত ছিল কি না তা জানতে হলে অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষির বরুণ স্তোত্রটি মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শুনঃশেপের কথা আছে। ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা হরিশ্চন্দ্র পণ করেছিলেন যে তিনি সন্তান লাভ করলে পুত্রকে বরুণের কাছে উৎসর্গ করবেন। রোহিত নামে তাঁর পুত্র জন্মালে তিনি নানা ছলে বিলম্ব করতে থাকেন। তারপর প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য মনস্থ করলে রোহিত অসম্মত হয়ে বনে গিয়ে ছয় বৎসর বাস করেন। সেখানে তিনি এক দরিদ্রের দ্বিতীয় পুত্র শুনঃশেপকে এক শত গাভী মূল্য দিয়ে ক্রয় করেন। নিজের পরিবর্তে এঁকে উৎসর্গ করতে চাইলে বরুণ রাজী হন। কিন্তু শুনঃশেপ বিভিন্ন দেবতার পূজা ও অর্চনা করে নিজেকে রক্ষা করতে থাকেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গেও তিনি মিলিত হন।

ঋগ্বেদের কোন স্থানে নরবলির উল্লেখ নেই। এমন কি শুনঃশেপকে বলি দেওয়া হবে এমন কথাও স্পষ্টভাবে বলা হয় নি। পণ্ডিতদের মধ্যে তাই মতবিরোধ আছে—কেউ বলেন নরবলি প্রথা ছিল, আবার কেউ তা ছিল না বলেন। বিভিন্ন সূক্তে আমরা অগ্নিতে ঘৃত এবং সোম অভিষবের কথা পাই। অন্য কোন অভিষব বা বলির প্রচলন থাকলে তার উল্লেখ নিশ্চয়ই থাকত। মনে হয় যে নরবলি প্রথা ছিল না এবং পশুর পরিবর্তে মানুষ বলি দেবার একটি ঘটনা ব্যর্থ হয়েছিল। প্রাণ রক্ষা করতে পেরে শুনঃশেপ তাঁর নিজের কথা প্রকাশ করেছেন প্রথম মণ্ডলের ২৪ সূক্তে। অগ্নি দেবতার উদ্দেশে তিনি বলছেন—

দেবতাদের মধ্যে কার জ্যোতির্ময় নাম চিন্তা করব এখন ?
কে আমাকে ফিরিয়ে দেবেন পৃথিবীতে ?
আমি কি আবার দেখতে পাব পিতা মাতাকে ? ॥ ১ ॥
উচ্চারণ করি দেবতাদের প্রথম অগ্নির চারু নাম।

তিনি আমাকে ফিরিয়ে দেন পৃথিবীকে,
দেখতে যেন পাই আমার পিতা ও মাতাকে ॥ ২ ॥
হে সদারক্ষণশীল সবিতা, সব কামনার অধীশ্বর তুমি,
আমি চাইছি তোমার কাছেই আনন্দ ভোগ করতে ॥ ৩ ॥
তোমার কাছে যা পেয়েছি আমি বন্ধনের আগে,
তা যেন আমি ধরে রাখতে পারি দূঢ় হাতে ॥ ৪ ॥
হে সবিতা, আমরা যেন ভোগ করতে পারি তোমার ধন,
ঊর্ধ্বে উঠে তোমারই সহায়ে।
আমরা পৌঁছতে চাই আনন্দের শীর্ষে ॥ ৫ ॥
যে পাখিরা উড়ছে, তারা পায় নি তোমার বল বিক্রম ও আবেগ।
যে জলধারা বইছে অনিমেষে,
তাও খর্ব করতে পারে নি তোমার প্রাণশক্তি ॥ ৬ ॥
যেখানে ছিল না কোন প্রতিষ্ঠা
সেখানে রাজা বরুণ স্থাপন করলেন এক আনন্দের স্তূপ।
তা থেকে জ্ঞানের ধারা নামছে নিচে,
উপরের মূল প্রতিষ্ঠিত আমাদের অন্তরে ॥ ৭ ॥
সূর্যের জন্য আকাশের বিস্তীর্ণ পথ
রচনা করেছেন রাজা বরুণ,
তাঁর পদক্ষেপের জন্য নির্মাণ করেছেন আশ্রয়।
আমার হৃদয় বিদ্ধ করেছে যে শত্রু,
তাকে তিনি করুন তিরস্কার ॥ ৮ ॥
তোমার শত ওষধি সহস্র হোক,
গভীর ও বৃহৎ হোক তোমার নির্দোষ মানস।
মৃত্যুর গতিকে ঠেলে দাও দূরে,
কৃত পাপ থেকে মুক্ত কর আমাদের ॥ ৯ ॥
ঐ যে আকাশে প্রতিষ্ঠিত সপ্তর্ষি নক্ষত্র,
তাদের রাতে দেখি, কিন্তু কোথায় যায় দিনে?
অপ্রতিহত বরুণের আজ্ঞায় রাতে আবার আসেন চন্দ্র ॥ ১০ ॥
স্তব ও স্তোত্রে আমি তোমার কাছে চাই পরমায়ু,
যাজকেরাও তাই চায় আহুতি দিয়ে।
হে বরুণ, বৃহতের প্রকাশক,
অনাদর না করে তুমি থাকো এইখানে,
কেড়ে নিও না আমার জীবনী শক্তি ॥ ১১ ॥
দিনে রাতে সবাই আমাকে যা বলেছে,

তাই আমি অনুভব করেছি নিজের হৃদয়ে।
আবদ্ধ হয়ে শুনঃশেপ বরুণকে করেছে আহ্বান,
সেই রাজা করুন আমাকে মুক্তি দান ॥ ১২ ॥
ধৃত ও তিন পদ কাষ্ঠে বদ্ধ হয়ে শুনঃশেপ
আহ্বান করেছিল অদিতির পুত্র বরুণকে।
বিদ্বান ও অহিংসিত বরুণ মুক্তি দিন তাকে,
মোচন করে দিন তার বন্ধন ॥ ১৩ ॥
হে বরুণ, তোমার ক্রোধ অপনয়ন কার নমস্কার করে,
হে অসুর, হে প্রচেতা, হে রাজা,
শিথিল কর আমাদের কৃত পাপ ॥ ১৪ ॥
হে বরুণ, উপর দিয়ে খুলে দাও আমার উপরের পাশ,
নিচের পাশ নামিয়ে দাও নিচে দিয়ে,
শিথিল করে দাও মাঝখানের পাশ হে অদিতিপুত্র,
আমরা নিষ্পাপ হয়ে থাকব তোমার ব্রত মেনে ॥ ১৫ ॥

জনসাধারণের মনে নানা রকমের সংস্কার ছিল, কিন্তু কোন কুসংস্কার গভীর ছিল না। পাখির ডাকে মঙ্গল ও অমঙ্গলের বিচার করত। দ্বিতীয় মণ্ডলের ৪২ সূক্তে গৃৎসমদ ঋষি কপিঞ্জলরূপী ইন্দ্র দেবতার উদ্দেশে ত্রিষ্টুপ ছন্দে বলছেন—

নৌকাকে যেমন পরিচালনা করে কর্ণধার,
তেমনি বাক্য প্রেরণ করছেন ভবিষ্যতের বক্তা
বারবার শব্দায়মান কপিঞ্জল।
হে শকুনি, তুমি হও কল্যাণসূচক,
যেন কোন দিক থেকে না আসে কোন অভিভব ॥ ১ ॥
হে শকুনি, তোমাকে যেন বধ না করে শ্যেণ পক্ষী,
সুপর্ণ পক্ষীও যেন বধ না করে,
তোমাকে যেন না পায় বলবান ধনুর্ধারী বীর।
আমাদের প্রিয়বাদী হও দক্ষিণ দিকে
বার বার শব্দ করে সুমঙ্গলশংসী হয়ে ॥ ২ ॥
হে শকুন্ত, গৃহের দক্ষিণ দিকে তুমি শব্দ কর,
সুমঙ্গল সূচক ও প্রিয়বাদী হয়ে।
তস্কর যেন প্রভুত্ব না করে আমার উপরে,
প্রভুত্ব না করে দুষ্ট ব্যক্তিও।
আমরা যেন স্তুতি করতে পারি এই যজ্ঞে
পুত্র ও পৌত্র বিশিষ্ট হয়ে ॥ ৩ ॥

তিনটি ঋকে সম্পূর্ণ এই সূক্ত। পরবর্তী ঋকে দ্বিতীয় মণ্ডল সমাপ্ত হয়েছে। তাতেও গৃৎসমদ ঋষি তিনটি ঋকে কপিঞ্জলরূপী ইন্দ্র দেবতার স্তব করেছেন জগতী অতিশক্করী ও অষ্টি ছন্দে। শকুনি পক্ষী বিশেষ, বোধ হয় Francoline partridge। সায়ন বলেছেন যে পাখিদের অমঙ্গল ধ্বনি শুনলে এই দুটি সূক্ত জপ করতে হয়।

রাক্ষসদের সম্বন্ধেও একটি সূক্ত রচনা করেছেন পায়ু ঋষি। দশম মণ্ডলের ৮৭ সূক্তটি রাক্ষসনিধনকারী অগ্নি দেবতার উদ্দেশে রচিত। এর ২ ঋকে মূঢ় দেবতা বা অপদেবতার উল্লেখ আছে। সাধারণের ধারণা ছিল যে রাক্ষসরা অপক্ক মাংস খায়, গরুর দুধ চুরি করে, আকাশ ও পৃথিবীতে বিচরণ করে, ও মানুষের হানি করে। এই বিশ্বাস এমন গভীর ছিল যে ঋষি বলছেন—

> হে মানুষ দর্শনকারী, সতর্ক হও রাক্ষসদের বিষয়ে,
> দৃষ্টি কর মানুষদের। ছেদন কর রাক্ষসদের তিন মাথা,
> শীঘ্র ছেদন কর তার পার্শ্বদেশ,
> রাক্ষসের তিনটি চরণও কর ছেদন ॥ ১০।৮৭।১০ ॥

দশম মণ্ডলের ১৬২ সূক্তে রক্ষোহা ঋষি গর্ভরক্ষণ দেবতার উদ্দেশে অনুষ্টুপ ছন্দে বলছেন—

> হে নারী, যে রাক্ষস তোমার নিকটে আসে
> তোমার ভ্রাতা পতি বা উপপতির মূর্তি ধারণ করে,
> যে নষ্ট করতে চায় তোমার সন্তানকে,
> এই স্থান থেকে দূরীভূত করি তাকে ॥ ৫ ॥
> যে রাক্ষস স্বপ্নে বা নিদ্রায় নিকটে যায় তোমাকে মুগ্ধ করে,
> নষ্ট করতে চায় তোমার সন্তানকে,
> এই স্থান থেকে দূরীভূত করি তাকে ॥ ১০।১৬২।৬ ॥

ছয় ঋকের এই সূক্তটি নারীর গর্ভ রক্ষার মন্ত্র-রূপে ব্যবহৃত হত এবং এটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলে অনেকে মনে করেন।

দশম মণ্ডলের ১৫৫ সূক্তটিও অমঙ্গল নাশের একটি আধুনিক মন্ত্র। শিরিম্বিধ ঋষি অনুষ্টুপ ছন্দে বলছেন—

> হে অলক্ষ্মী, তুমি বিপক্ষ বদান্যতার,
> বিকট তোমার আকৃতি, কুৎসিত শব্দ কর সর্বদা,
> একমাত্র কাজ তোমার আক্রোশ করা।
> তুমি যাও পর্বতে।

আমি শিরিম্বিধ, আমি করছি এমন উপায়
যাতে তোমাকে অবশ্যই করব দূর ॥ ১ ॥
সব জাতের ভ্রূণ নষ্ট করে সেই অলক্ষ্মী,
তাকে আমি দূর করলাম এই স্থান ও ঐ স্থান হতে।
হে ব্রহ্মণস্পতি তীক্ষ্মতেজা, দূর করে এসো এখান থেকে
বদান্যতার বিপক্ষ সেই অলক্ষ্মীকে ॥ ২ ॥
ঐ একখানি কাঠ ভাসছে সমুদ্রতীরের নিকটে,
ওর নেই কোন মালিক।
হে বিরূপাকৃতি অলক্ষ্মী, তুমি যাও সমুদ্রের পরপারে
আরোহণ করে ঐ কাঠের উপরে ॥ ৩ ॥
হিংসাময়ী কুৎসিত শব্দকারী অলক্ষ্মীরা,
তোমরা চলে যাবার পর নষ্ট হল ইন্দ্রের শত্রুরা,
তারা মিলিয়ে গেল জল বুদ্‌বুদের মতো ॥ ৪ ॥
গাভী উদ্ধার করেছে এই সব লোক,
অগ্নিকে স্থাপন করেছে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে,
অন্ন উৎসর্গ করেছে দেবতার উদ্দেশে,
কার সাধ্য যে আক্রমণ করে এদের ॥ ১০।১৫৫।৫ ॥

নানাবিধ বিষধর প্রাণীর অত্যাচার ছিল। এই নিয়ে অগস্ত্য ঋষি একটি ষোল ঋকের দীর্ঘ সূক্ত রচনা করেছেন প্রথম মণ্ডলে। তিনি বলছেন—

বিষে আমাকে লিপ্ত করেছে সম্পূর্ণ রূপে
অল্প বিষ মহাবিষ দাহকর জলচর ও অদৃশ্য প্রাণী ॥ ১ ॥
যে ঔষধ আসছে তা নাশ করে অদৃশ্য বিষধর প্রাণীকে,
নাশ করে তাকে প্রত্যাবর্তনের কালে,
বিনষ্ট হবার সময় ও পিষ্ট হবার সময়ে পেষণ করে ॥ ২ ॥
শৌণ্ডিকের গৃহে চর্মময় সুরা পানের ন্যায়
আমি বিষ নিক্ষেপ করছি সূর্য মণ্ডলে।
যেমন প্রাণ ত্যাগ করেন না পূজনীয় সূর্য,
তেমনি আমরাও ত্যাগ করব না প্রাণ।
অশ্বে চালিত হয়ে সূর্য অপনয়ন করেন দূরস্থিত বিষ।
হে বিষ, তোমাকে অমৃতে পরিণত করে মধুবিদ্যা ॥ ১।১৯১।১০ ॥

মধুবিদ্যা কী তা সঠিক জানা যায় না। তবে এই সূক্তেরই কয়েকটি ঋক পড়ে ওঝার মন্ত্র বলে মনে হয়। ওঝার মন্ত্র ঋগ্বেদে অল্পই আছে, বিস্তর আছে অথর্ববেদে।

রোগ নিবারণের জন্য ঋগ্বেদের একটি ওঝার মন্ত্র নিচে দেওয়া হল। দশম মণ্ডলের ১৩৭ সূক্তে ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গোতম, অত্রি, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি ও বশিষ্ঠ এই সাতজন ঋষি বিশ্বেদেবা দেবতার উদ্দেশে অনুষ্টুপ ছন্দে বলছেন—

হে দেবতাবর্গ, তোমরাই আমাকে পতিত করেছ নিচে,
তোমরাই আবার তুলে নাও উপরে।
হে দেবগণ, আমি হয়তো করেছি অপরাধ,
তবু প্রাণ দান কর পুনর্বার ॥ ১ ॥
দুই বায়ু বয়ে থাকে সমুদ্র ছাড়িয়ে আরও দূরে,
এক বায়ু আসুক তোমার বলাধান করতে করতে,
অন্য বায়ু বহমান হোক তোমার পাপ নাশের জন্য ॥ ২ ॥
হে বায়ু, এদিকে তুমি বয়ে আনো ঔষধ,
আর এদিক হতে বয়ে নিয়ে যাও যা অহিতকর।
সংসারের ঔষধ তুমি, দূত হয়ে যাও দেবতাদের ॥ ৩ ॥
হে যজমান, তোমার জন্য করেছি মঙ্গলকর স্বস্ত্যয়ন,
করেছি তোমার অমঙ্গল নিবারণের কার্যও,
করেছি এমন কার্য যাতে হয় তোমার উৎকৃষ্ট বলাধান।
এখনই দূর করে দিচ্ছি তোমার রোগ ॥ ৪ ॥
এখন রক্ষা করুন দেবতারা, মরুৎগণও করুন রক্ষা,
রক্ষা করুন সমস্ত চরাচর। নীরোগ হোক এই লোক ॥ ৫ ॥
রোগ শান্তির কারণ জল, জলই ঔষধ সকল রোগের।
সে জল যেন বিধান করে দেয় তোমার ঔষধ ॥ ৬ ॥
দুই হাতে আছে দশ অঙ্গুলি, জিহ্বা বিচলিত হয় বাক্যের আগে,
ঐ হাত দিয়ে তোমাকে স্পর্শ করছি
রোগ শান্তির জন্য ॥ ১০।১৩৭।৭ ॥

মৃতব্যক্তির আত্মাকেও ফিরিয়ে আনবার প্রার্থনা আছে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৫৮ ও ৬০ সূক্তে। বন্ধু প্রভৃতি ঋষি মৃত সুবন্ধুর মন প্রাণ প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে বলছেন—

তোমার যে মন গিয়েছে অতি দূরে বিবস্বানের পুত্র যমের নিকটে,
তাকে ফিরিয়ে আনছি আমরা,
তুমি ইহলোকে এসে বাস কর জীবিত হয়ে ॥ ১০।৫৮।১ ॥

মৃত ভ্রাতার আত্মা পৃথিবীতে না স্বর্গে, জলে না বৃক্ষলতাদিতে, সূর্যে না ঊষায়, পর্বতমালায় না দূর হতে দূরে কোন অজ্ঞাত প্রদেশে

চলে গিয়েছে, তারই কল্পনা করে ঋষি মৃতকে জীবিত করবার প্রার্থনা জানাচ্ছেন। ৬০ সূক্তে একই প্রার্থনা জানাচ্ছেন বন্ধু প্রভৃতি ঋষি—

এই যে অগ্নি এসেছেন, মাতা স্বরূপ ইনি,
পিতা স্বরূপ, প্রাণ পাবার ঔষধ স্বরূপ।
হে সুবন্ধু, তোমার এই শরীর, তুমি এসে প্রবেশ কর এতে ॥৭॥
রজ্জু দিয়ে যেমন রথে বন্ধন করে যুগকাষ্ঠ,
তেমনি তোমার মনকে ধারণ করেছেন এই অগ্নি,
তাতে তুমি হবে জীবিত ও কল্যাণসম্পন্ন,
অপগত হবে তোমার মৃত অবস্থা ॥ ৮ ॥
আমি আহরণ করছি সুবন্ধুর মন
বিবস্বানের পুত্র যমের নিকট হতে।
এতে সে হবে জীবিত ও কল্যাণসম্পন্ন,
অপগত হবে তোমার মৃত অবস্থা। ১০ ॥
বায়ু বহন করে নিচের দিকে,
উপর থেকে উত্তাপ দেয় সূর্য।
নিচের দিকে যেমন দোহন করা যায় গাভীর দুগ্ধ,
তেমনি, হে সুবন্ধু, নিচে গমন করুক
তোমার অকল্যাণ ॥ ১০।৬০।১১ ॥

সেকালের মানুষ যক্ষ্মা ও রাজযক্ষ্মা রোগের বিষয় জানতেন। দশম মণ্ডলের ১৬১ সূক্তে যক্ষ্মানাশক ঋষি বলছেন—

হে রোগী, এই যজ্ঞ সামগ্রী দিয়ে তোমাকে মোচন করে দিচ্ছি
অপরিজ্ঞাত যক্ষ্মা রোগ ও রাজযক্ষ্মা রোগ হতে।
তাহলেই রক্ষা পাবে তোমার জীবন।
যদি কোন পাপগ্রহ ধরে থাকে এই রোগীকে,
তাহলে, হে ইন্দ্র ও অগ্নি, একে মোচন করে দাও
তার হাত থেকে ॥ ১ ॥
যদিও ক্ষয় হয়ে থাকে এই রোগীর পরমায়ু,
অথবা যদি এ মরে গিয়েও থাকে,
বা এগিয়ে গিয়ে থাকে একেবারে মৃত্যুর নিকটে,
তবু তাকে ফিরিয়ে আনছি মৃত্যুদেবতা নির্ঋতির হাত হতে।
আমি একে স্পর্শ করেছি এই ভাবে
যে এ জীবিত থাকবে এক শত বৎসর ॥ ২ ॥
এই যে দিলাম আহুতি, এর এক শত চক্ষু,
দেয় একশত বৎসর পরমায়ু,

এই আহুতি দিয়েই আমি ফিরিয়ে এনেছি রোগীকে।
ইন্দ্র যেন একে জীবিত রাখেন একশত বৎসর
সমস্ত পাপ হতে একে পরিত্রাণ করে ॥ ৩ ॥
হে রোগী, জীবিত থাকো এক শত শরৎ,
সুখে স্বচ্ছন্দে এক শত হেমন্ত,
জীবিত থাকো এক শত বসন্ত।
ইন্দ্র অগ্নি সবিতা ও বৃহস্পতি
হব্যে তৃপ্ত হয়ে পরমায়ু দিন এক শত বৎসর ॥ ৪ ॥
হে রোগী, তোমাকে পেয়েছি আমি,
ফিরিয়ে এনেছি তোমাকে।
তুমি নবীন হয়ে এসেছ পুনর্বার।
আবার পেয়েছি তোমার সমস্ত অঙ্গ চক্ষু ও পরমায়ু ॥ ৫ ॥

বিবৃহা ঋষিও যক্ষা রোগের নাশ দেবতার উদ্দেশে একটি সম্পূর্ণ সূক্ত রচনা করেছেন। দশম মণ্ডলের ১৬৩ সূক্তে তিনি বলছেন—

প্রতি অঙ্গ লোম ও শরীরের প্রতি সন্ধিস্থান,
শরীরের যে কোন স্থানে জন্মেছে এই ব্যাধি,
সেখান থেকেই তাড়াচ্ছি আমি তাকে ॥ ১।১৬৩।৬ ॥

রোগ আরামের এই মন্ত্রগুলি যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রচিত তা বলা বাহুল্য।

ঔষধ ও রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে তেইশ ঋকের একটি সম্পূর্ণ সূক্ত আছে দশম মণ্ডলে। ভিষক ঋষি ওষধি দেবতার উদ্দেশে এই সূক্তটি রচনা করেছিলেন। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে সেকালে নানা রোগের জন্য নানারূপ উদ্ভিজ্জ ব্যবহৃত হত। ভিষক ঋষি বলছেন—

পুরাকালে দেবতারা যত ওষধি সৃষ্টি করেছেন তিন যুগ ধরে,
সেই সব পিঙ্গলবর্ণ ওষধির একশো সাত স্থান আছে বিদ্যমান।
এই কথাই মনে হয় আমার ॥ ১০।৯৭।১ ॥

প্রথম মণ্ডলের ১১২, ১১৬ এবং ১১৭ সূক্তগুলি পাঠ করে জানা যায় যে আরও প্রাচীনকালে অশ্বীদ্বয় চিকিৎসা শাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি বলেছেন, তারা পঙ্গু পরাবৃজকে গমনে সমর্থ করেছিলেন, অন্ধ ঋজ্রাশ্বকে দৃষ্টি দান করেছিলেন, দুর্বল জানু শ্রোণকে চলবার ক্ষমতা দিয়েছিলেন এবং বৃদ্ধ চ্যবন ঋষির জরা নাশ করেছিলেন। খেলের স্ত্রী বিশ্পলার একটি পা পাখির একটি পাখার মতো যুদ্ধে ছিন্ন হয়েছিল, অশ্বীদ্বয় রাত্রিযোগে সদ্যই তাকে গমনের জন্য এবং শত্রুন্যস্ত ধনলাভের জন্য লোহার জঙ্ঘা পরিয়ে সংগ্রামে

সমর্থ করেছিলেন। তাঁরা রেভ ঋষিকে জল থেকে তুলে পীড়িত অশ্বের মতো তাঁর বিনষ্ট অবয়ব ভিষজ কর্মে শোধন করেছিলেন. বিশ্বকায়ের বিনষ্ট পুত্র বিষ্ণাপুকে এনে দিয়েছিলেন। কক্ষীবানের দুহিতা ঘোষা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হওয়াতে তিনি বিষণ্ণ মনে পিতৃগৃহে বাস করতেন বার্ধক্য পর্যন্ত। অশ্বীদ্বয়ের অনুগ্রহেই তিনি কুষ্ঠরোগ থেকে আরোগ্য লাভ করে পতি পেয়েছিলেন। দৃষ্টি না থাকার জন্য কণ্ব চলতে পারতেন না। তারা তাঁকে চক্ষু দিয়েছিলেন। অথর্ব ঋষির পুত্র দধীচি ঋষির স্কন্ধে অশ্বের মস্তক যোজনা করে দিয়েছিলেন তাঁরা এবং তাঁর নিকটে মধু বিদ্যা লাভ করেছিলেন। এই মধু বিদ্যা ওঝার মন্ত্র, না জাদু বিদ্যা, তা জানা যায় না। কিন্তু অশ্বীদ্বয় যে সব কাজ করতেন তা জাদুর মতোই অসম্ভব বলে এখন মনে হয়। তাঁরা বধ্রিমতিকে পুত্র দিয়েছিলেন এবং তিন ভাগে বিচ্ছিন্ন শ্যাব ঋষিকে জীবিত করেছিলেন। একালে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অপরিসীম উন্নতি হয়েছে। তবু এখনও এই সব কাজের অনেক কিছু অলৌকিক বা কল্পিত বলে মনে হতে পারে। তাই মধুবিদ্যাকে শুধু ওঝার মন্ত্র বা চিকিৎসা বিজ্ঞান না ভেবে জাদু বিদ্যা বলেই মনে করেন অনেকে।

কিন্তু ঋষিদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির যে কোন অভাব ছিল না তারও প্রমাণ আছে ঋগ্বেদের নানা সূক্তে। জোতির্বিজ্ঞানে তাঁদের দখল ছিল অসাধারণ। প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তে দীর্ঘতমা ঋষি বলছেন—

সত্যাত্মক আদিত্যের দ্বাদশ অর বিশিষ্ট চক্র
পুনঃপুনঃ ভ্রমণ করছে স্বর্গের চারিদিকে,
তা জরাগ্রস্ত হয় না কদাচিৎ।
হে অগ্নি, এই চক্রে বাস করে পুত্ররূপ সাতশো কুড়ি মিথুন। ১১॥

বৎসরের তিনশো ষাট দিন ও রাত্রিকে সাতশো কুড়ি মিথুন বলা হয়েছে। মেষাদি দ্বাদশ রাশিই দ্বাদশ অর, কিংবা বারো মাসকেই দ্বাদশ অর বলা হয়েছে। আদিত্যকে পঞ্চপাদ বলা হয়েছে পরের ঋকে। যদিও ঋতু ছয়টি, তবে হেমন্ত ও শিশিরকে এক বলে পঞ্চপাদ বলা হয়েছে। সূর্য ছয় অর ও সাত চক্র বিশিষ্ট রথে চলেন। ছয় ঋতুই ছয় অর এবং সপ্ত রশ্মিই সপ্ত চক্র। এই ঋকেরই শেষাংশে সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন গমনের উল্লেখ আছে। ১৫ ঋকে মলমাসের কথা আছে। শুনঃশেপও এই কথা বলেছেন প্রথম মণ্ডলেরই ২৫ সূক্তে—

যিনি ধৃতব্রত হয়ে জানেন স্ব স্ব ফলোৎপাদী দ্বাদশ মাস,
তিনি এও জানেন যে উৎপন্ন হয় ত্রয়োদশ মাস ॥ ১।২৫।৮ ॥

এই ঋক থেকেই প্রতীয়মান হয় যে সেকালের ঋষিরা বৎসরের গণনা জানতেন এবং সৌর বৎসর ও চান্দ্র বৎসরের মধ্যে ঐক্য বিধানের জন্য প্রতি তৃতীয় বৎসর একটি মলিম্লুচ বা মলমাস ধরতে হয়।

সূর্যের দৈনিক গতির কথা আছে প্রথম মণ্ডলের ১২৩ সূক্তে। কক্ষীবান ঋষি বলছেন—

আজও যেমন কালও তেমনি, উষারা অনবদ্য।
প্রতিদিন তাঁরা ত্রিশ যোজন আগে থাকেন
বরুণের অবস্থিতির স্থান থেকে ॥ ১।১২৩।৮ ॥

এখানে বরুণ অর্থ সূর্য। সায়ন বলেন যে সূর্য প্রত্যহ ৫০৫৯ যোজন ভ্রমণ করেন, অর্থাৎ এক দণ্ডে ৭৯ যোজন। অতএব উষা যদি সূর্যের ৩০ যোজন পূর্বগামী হন, তাহলে সূর্যোদয়ের প্রায় অর্ধ দণ্ড পূর্বে উষার উদয়।

প্রথম মণ্ডলের ১৫৫ সূক্তে দীর্ঘতমা ঋষি বলছেন—

গতি বিশেষের দ্বারা বিষ্ণু চালিত করেছেন
বৎসরের চতুর্নবতি দিন চক্রের মতো বৃত্তাকারে। ১।১৫৫।৬ ॥

সায়ন ৯৪ কালাবয়ব নির্দেশ করেছেন এই ভাবে—সম্বৎসর ১, অশ্বীদ্বয় ২, পঞ্চঋতু ৫, দ্বাদশ মাস ১২, চব্বিশ পক্ষ ২৪, ত্রিশ অহোরাত্র ৩০, অষ্টপ্রহর ৮ ও দ্বাদশ রাশি ১২, মোট ৯৪। কিন্তু চতুর্নবতিকে নব্বুই-এর চার গুণ অর্থাৎ ৩৬০ ধরলেই বোধ হয় ভাল হয়। দীর্ঘতমা ঋষি এক বৎসরে তিনশো যাট দিন বলেছেন, এটাই ঠিক মনে হয়।

পৃথিবীর যে অক্ষ বা axis আছে, ঋষিরা সে কথাও জানতেন। দশম মণ্ডলের ৮৯ সূক্তে রেণু ঋষি বলছেন—

অকাতরে স্তব করা হয়েছে ইন্দ্রকে,
জল এনেছি আকাশের মস্তক হতে।
চক্র যেমন ধাবিত হয় অক্ষের দ্বারা
ইন্দ্র তেমনি দ্যুলোক ও ভূলোক রাখেন উত্তম্ভিত করে
নিজের কাষ্ঠের দ্বারা ॥ ১০।৮৯।৪ ॥

বিদেশী পণ্ডিতরাও মেনে নিয়েছেন যে এই কাষ্ঠের অর্থ axis of the earth। ষষ্ঠ মণ্ডলের ৩২ সূক্তে সুহোত্র ঋষি বলছেন—

দক্ষিণ হতে বারি রাশিকে বিমুক্ত করেন
অশ্বদের অধিপতি তেজস্বী তুরাষাট।
এই ভাবে বিসৃষ্ট বারি প্রত্যহ পড়ে ব্যপ্ত হয়ে
ক্ষোভহীন গন্তব্য স্থান সমুদ্রে,
যেখান থেকে আর সম্ভব নয় প্রত্যাবর্তন ॥ ৬।৩২।৫

সায়ন বলেছেন যে এই দেশে দক্ষিণায়নের সময়ে যে বর্ষা হয়, ঋষি সেই কথাই বলেছেন এই ঋকে।

ঋষিরা এও জানতেন যে সূর্য কিরণ চন্দ্রে প্রতিফলিত হয়ে চন্দ্রের আলোক হয়। তাই প্রথম মণ্ডলের ৮৪ সূক্তে গৌতম ঋষি বলছেন—

এই ভাবে পেয়েছিল আদিত্যের রশ্মি
গমনশীল চন্দ্র মন্ডলের অন্তর্হিত সূর্যতেজ ॥ ১।৮৪।১৫ ॥

সূর্য গ্রহণের বর্ণনা আছে পঞ্চম মণ্ডলের ৪০ সূক্তের পাঁচটি ঋকে। অত্রি ঋষি বলছেন—

তোমাকে যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন করেছিল আসুর স্বর্ভানু,
হে সূর্য, তখন ত্রিভুবনও মনে হয়েছিল
হতবুদ্ধি ব্যক্তির মতো নিজ স্থান নিরূপণে অসমর্থ ॥ ৫ ॥
হে ইন্দ্র, যখন তুমি দূরে অপসারিত করেছিলে
সূর্যের অধঃস্থিত স্বর্ভানুর মায়া অন্ধকার,
তখন চারটি ঋক দিয়ে অত্রি প্রকাশ করলেন
অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন সূর্যকে ॥ ৬ ॥
সূর্য বলছেন, অত্রি, তোমার আত্মীয় আমি,
দ্রোহকারী যেন ক্ষুধার জন্য আমাকে গ্রাস না করে অন্ধকারে।
তুমি মিত্র ও সত্য পরায়ণ,
তুমি ও রাজা বরুণ উভয়ে রক্ষা কর আমাকে ॥ ৭ ॥
তখন সেই ঋত্বিক অত্রি উপদেশ দিলেন সূর্যকে,
দেবতাদের পূজা করলেন স্তোত্র দিয়ে ও ঘর্ষণ করে প্রস্তর,
অন্তরিক্ষে সূর্যের চক্ষু সংস্থাপিত করলেন মন্ত্রের প্রভাবে।
দূরে অপসারিত করলেন স্বর্ভানুর সমস্ত মায়া ॥ ৮ ॥
সূর্যকে অন্ধকারে আবৃত করলে আসুর স্বর্ভানু,
তাঁকে মুক্ত করেছিলেন অত্রির পুত্রগণ।
আর কেউ সমর্থ হয় নি এই কাজে ॥ ৯ ॥

বেদের স্বর্ভানু পুরাণে রাহুতে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু ঋগ্বেদের কোনখানে রাহু শব্দ নেই।

এইভাবে বেদ পাঠ করলে দেখা যাবে যে ঋষিরা প্রকৃতির রূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন গভীর মনোযোগে এবং এইভাবেই তাঁরা অনেক নূতন তথ্য জানতে পেরেছেন। কৌতূহলই সমস্ত আবিষ্কারের মূলে। সভ্যতার ক্রমবিকাশে এই কৌতূহলই প্রথম পদক্ষেপ।

উপাস্য দেবতা ছিলেন কারা

বৈদিক যুগের সমাজ নিয়ে অনেক কথাই বলেছি। এই বারে বেদের দেবতা নিয়েও কিছু আলোচনা করা দরকার। প্রথমেই আমাদের 'দেবতা' শব্দটির ব্যবহার ভাল করে বুঝে দেখতে হবে।

ঋগ্বেদের প্রত্যেকটি সূক্তের আরম্ভে সূক্তের দেবতা ঋষি ও ছন্দের উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য যে এর অর্থ সূক্তে সেই দেবতার স্তব, রচয়িতা ঋষির নাম ও যে ছন্দে বা যে সব ছন্দে সূক্তটি রচিত তাই বলা হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ দেখা যাবে যে তৃণ, জল প্রভৃতি সামান্য বস্তুও সূক্তের দেবতা বলে উল্লিখিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে জানা থাকা দরকার যে দেবতা শব্দটি সর্বত্র দেবতার প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হয় নি, এই শব্দটি সূক্তের শিরোনাম অর্থাৎ তার বিষয়বস্তু বোঝাবার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। সূক্তটি যে বিষয় নিয়ে রচিত, সেই বিষয়টিই সূক্তের দেবতা।

নিরুক্তকার যাস্ক বলেছেন যে দেবতা শব্দটির ব্যবহার হয়েছে নানা অর্থে। যিনি দান করেন তিনি দেবতা, যিনি দীপ্ত বা দ্যোতিত হন তিনি দেবতা। আবার যিনি দ্যুস্থানে থাকেন তিনিও দেবতা ॥ ৭।১৫ ॥ কিন্তু এই অর্থ দিয়ে দেবতা শব্দটি সঠিক ভাবে বোঝা যায় না। কারণ যিনি দান করেন তাঁকে আমরা দেবতা বলি না, যিনি দীপ্ত বা দ্যোতিত হন তিনি জ্যোতিষ্ক এবং যিনি দ্যুস্থানে থাকেন তিনি যেমন দেবতা, তেমনি পৃথিবী বা অন্তরিক্ষেও দেবতা আছেন। যাস্কের মতেই দেবতা তিন জন—পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরিক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু এবং দ্যুস্থানে সূর্য। এই উক্তিতেও একটি গরমিল লক্ষ্য করা যায়। অন্তরিক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু দেবতা হলে দেবতার সংখ্যা তিনজন না হয়ে চার জন হয় এবং সংখ্যা তিন রাখতে হলে ইন্দ্র বা বায়ুর মধ্যে একজনকেই দেবতা বলে মানতে হয়।

কিন্তু ঋগ্বেদে তেত্রিশজন দেবতার উল্লেখ আছে। মনু ঋষি গায়ত্রী ছন্দে বলেছেন বিশ্বদেবগণের কথা—

> যে তেত্রিশজন দেবতা উপবেশন করেছিলেন বর্হিতে,
> তাঁরা জানুন আমাদের,
> প্রদান করুন দু রকমের ধন ॥ ৮।২৮।১ ॥

এই তেত্রিশ শব্দটি মনু একবারে বলেননি, বলেছেন ভেঙে ত্রিশ ও তিন এই ভাবে। জোর দিয়েছেন তিনের উপরে। এর পর আরও কয়েকটি

সূক্তের কথা বলা যেতে পারে। তৃতীয় মণ্ডলের নবম সূক্তে বিশ্বামিত্র ঋষি অগ্নিদেবতার স্তবে বৃহতী ছন্দে বলছেন—

অগ্নির পূজা করেছেন তিনহাজার তিনশো উনচল্লিশজন দেবতা,
ঘৃতে শক্ত করেছেন, তাঁর জন্য বিস্তার করেছেন কুশ,
হোতা রূপে তাঁকে উপবেশন করিয়েছেন কুশের উপরে ॥৩।৯।৯॥

এই ঋকেও তিনের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। তিন সহস্র, তিন শত, তিনের সঙ্গে নয় যোগ করে তিন হাজার তিনশো উনচল্লিশ সংখ্যা। সায়ন তাঁর ভাষ্যে বলেছেন যে দেবতা তেত্রিশ জন, তাঁদের মহিমা হল তিন হাজার তিনশো ঊনচল্লিশ। বিশ্বামিত্রের মতো একই কথা বলেছেন অগ্নি ঋষি বিশ্বদেবগণ সম্বন্ধে ত্রিষ্টুপ ছন্দে—

অগ্নির সেবা করেছেন তিন হাজার তিনশো ঊনচল্লিশ জন দেবতা,
ঘৃতে তাঁকে অভিষিক্ত করে তাঁর জন্য বিস্তার করেছেন কুশ,
উপবেশন করিয়েছেন তাঁকে হোতা রূপে ॥ ১০।৫২।৬ ॥

এখানেও একই ভাবে দেবতাদের সংখ্যার উল্লেখ। পণ্ডিতরা মনে করেন যে আসলে তেত্রিশ দেবতাকেই তিনশো তিন, তিন হাজার তিন এই ভাবে শূন্যের সংখ্যা বাড়িয়ে তা যোগ করে তিন হাজার তিনশো ঊনচল্লিশ করা হয়েছে। পুরাণে তো দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটি।

যাই হোক, শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে ঋগ্বেদের শতকরা নব্বুইটিরও বেশি সূক্ত এই দেবতাদের উদ্দেশেই রচিত। এত বেশি লেখা হয়েছে যে তা এ কালের পাঠকের নিকটে ক্লান্তিকর বলে মনে হবে। তাই বেছে বেছে কিছু দেবতার ভাল ভাল স্তবের অনুবাদ সাজিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

ইন্দ্র ও অগ্নিই ঋগ্বেদের সবচেয়ে প্রিয় দেবতা। ইন্দ্রকে নিয়ে আড়াইশোর বেশি সূক্ত আছে এবং অগ্নির স্তবও আছে দুশো। তার পর সোম। নবম মন্ডলে যে একশো চোদ্দটি সূক্ত আছে তা সবই সোমের উদ্দেশে রচিত। এই দেবতাদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমে পৃথিবীর দেবতা, তার পরে অন্তরিক্ষ বা আকাশের দেবতা এবং শেষে দ্যুলোকের বা স্বর্গের দেবতা। এই পুরাতন রীতিতে দেবতাদের আলোচনা করছি।

পৃথিবীর দেবতা

সকলের আগে অগ্নির কথা। ঋগ্বেদের আরম্ভ হয়েছে অগ্নিকে নিয়েই। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি গায়ত্রী ছন্দে অগ্নির স্তব করছেন।—

অগ্নি মীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্ন ধাতমম্ ॥ ১।১।১ ॥

অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত ও দীপ্তিমান,
অগ্নিই দেবতাদের আহ্বানকারী ঋত্বিক।
আমি স্তুতি করি এই রত্নধারী অগ্নির ॥ ১ ॥
পূর্বে তিনি স্তুতিভাজন ছিলেন ঋষিদের,
নূতন ঋষিদেরও স্তুতিভাজন তিনি।
তিনিই দেবতাদের আনুন এই যজ্ঞে ॥ ২ ॥
অগ্নির কাছে যজমান ধন লাভ করেন,
সে ধন দিনে দিনে হয় বর্ধিত ও যশোযুক্ত।
তা দিয়ে নিযুক্ত করা যায় অনেক বীর পুরুষ ॥ ৩ ॥
হে অগ্নি, তুমি বেষ্টন করে থাকো যে যজ্ঞ,
সে যজ্ঞ কেউ পারে না হিংসা করতে।
নিঃসন্দেহে তা যায় দেবতাদের নিকটে ॥ ৪ ॥
দেবতাদের আহ্বান কর তুমি,
তুমি সিদ্ধকর্ম, সত্যপরায়ণ ও কীর্তিমান,
হে দেব, তুমি এই যজ্ঞে এসো দেবতাদের সঙ্গে ॥ ৫ ॥
হে অগ্নি, তুমি যে কল্যাণ করবে হব্যদাতা যজমানের,
হে অঙ্গিরা, সে কল্যাণ তোমারই ॥ ৬ ॥
হে অগ্নি, দিনরাত আমরা
মনের সাথে নমস্কার করি তোমাকে,
আসি তোমার সমীপে ॥ ৭ ॥
হে দীপ্যমান, যজ্ঞের রক্ষক তুমি,
অতিশয় দীপ্তিকারক যজ্ঞের,
যজ্ঞশালাতেই তুমি বর্ধনশীল ॥ ৮ ॥
পিতা যেমন পুত্রের নিকটে যায় অনায়াসে,
তেমনি করেই আমাদের নিকটে এসো তুমি।
আমাদের নিকটেই বাস কর মঙ্গলের জন্য ॥ ১।১।৯ ॥

এটি ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। এই সূক্তের টীকাতেই নিরুক্ত বলেছেন, দেব তিন জন, পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরিক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু এবং আকাশে সূর্য। তাঁদের মহাভাগ্য, কারণ একজনের অনেকগুলি নাম; অথবা এটি পৃথক পৃথক বর্ণের জন্য, যথা হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা, উথাতো অথবা তাঁরা পৃথক পৃথক দেবই ছিলেন। কেননা তাঁদের পৃথক রূপে স্তুতি করা হয়েছে এবং পৃথক পৃথক নাম দেওয়া হয়েছে। সায়ন বলেছেন, অগ্নি না হলে যজ্ঞ হয় না। এজন্য ঋগ্বেদের অনেক জায়গায় অগ্নিকেই পুরোহিত বলা হয়েছে। পুরঃ হিত অর্থাৎ সম্মুখে স্থাপিত বলেই তিনি পুরোহিত।

ঋগ্বেদেব প্রথম মণ্ডলেই কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি গায়ত্রী ছন্দে অগ্নির স্তব করছেন বারোটি ঋকে।—

অগ্নি দেবদূত ও আহ্বানকারী দেবতাদের,
তিনি সর্বধনযুক্ত ও এই যজ্ঞের সুনিষ্পাদক।
আমরা বরণ করি অগ্নিকে ॥ ১ ॥
প্রজাপালক ও হব্যবাহী তিনি।
যজ্ঞের অনুষ্ঠাতারা আহ্বান মন্ত্রে
নিরন্তর আহ্বান করে এই প্রিয় অগ্নিকে ॥ ২ ॥
হে কাষ্ঠোৎপন্ন অগ্নি, দেবতাদের আনো তুমি
এই ছিন্ন কুশযুক্ত যজ্ঞস্থলে।
দেবতাদের আহ্বানকারী, তুমি স্তুতিভাজন আমাদের ॥ ৩ ॥
তুমি পেয়েছ দেবতাদের দূত-কর্মের ভার,
তাই জাগরিত কর হব্যাকাঙ্ক্ষী দেবতাদের।
দেবতাদের সঙ্গেই উপবেশন কর এই কুশযুক্ত যজ্ঞস্থলে ॥ ৪ ॥
ঘৃতে তুমি আহূত ও দীপ্যমান,
আমাদের যে বিদ্বেষীরা যুক্ত হয়েছে রাক্ষসের সঙ্গে,
তাদের তুমি দহন কর ॥ ৫ ॥
অগ্নিতেই প্রজ্বলিত হন অগ্নি,
তিনি মেধাবী গৃহপালক ও যুবা,
কাঠের জুহু মুখে তিনি বহন করেন হব্য ॥ ৬ ॥
সেই সত্যধর্মা শত্রুনাশক দেবতার নিকটে এসো,
তাঁর স্তুতি কর যজ্ঞ কর্মে ॥ ৭ ॥
হে দেব অগ্নি, দেবদূত তুমি,
তোমার পরিচর্যা করে যে হবিষ্পতি,
তুমি হও তার সম্যক রক্ষক ॥ ৮ ॥

হে হবিষ্পতি, যে তোমার পরিচর্যা করে
দেবতাদের হব্য ভক্ষণের জন্য,
হে পাবক, সুখী কর তাকে ॥ ৯ ॥
হে দীপ্যমান পাবক অগ্নি,
দেবতাদের তুমি এখানে আনো আমাদের জন্য,
আর দেবতাদের কাছে নিয়ে যাও আমাদের যজ্ঞ ও হব্য ॥ ১০ ॥
হে অগ্নি, তুমি স্তুত হও গায়ত্রী ছন্দের এই নূতন মন্ত্রে,
প্রদান কর ধন ও বীরযুক্ত অন্ন আমাদের জন্য ॥ ১১ ॥
হে অগ্নি, তুমি শুভ্র দীপ্ত যুক্ত,
দেবগণকে আহ্বানে সমর্থ
এই স্তোত্র গ্রহণ কর আমাদের ॥ ১২ ॥

এই সূক্তে এবং আরও অনেক জায়গায় অগ্নিকে যুবা এবং দেবতাদের মধ্যে যবিষ্ঠ বলা হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে বেদের এই যবিষ্ঠ নামেরই রূপান্তর Hephaistos। তিনি গ্রীক দেবতা বিশ্বকর্মা। এই সূক্তে অগ্নিকে কাষ্ঠোৎপন্ন অগ্নিও বলা হয়েছে। পুরাকালে দুটি কাষ্ঠ বা অরণি মন্থন অর্থাৎ ঘর্ষণ করে অগ্নি উৎপন্ন করা হত। এই অগ্নির নাম প্রমন্থ। পণ্ডিতরা বলেন যে এই প্রমন্থেরই গ্রীক দেবতা Prometheus. যিনি মানুষের মঙ্গলের জন্য স্বর্গ থেকে অগ্নি চুরি করে এনেছিলেন। বেদে অগ্নির আর একটি নাম ভরণ্যু। পণ্ডিতরা মনে করেন যে গ্রীকদের অগ্নিদাতা ও সদাচারনিয়ন্তা Phoroneus তারই রূপান্তর। এই ভাবে সংস্কৃত উল্কা হয়েছে রোমকদের Vulcan এবং লাতিন Vulcanus। এই সূক্তে জুহু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ কাঠের তৈরি হাতা। যজ্ঞের সময়ে এই হাতায় অগ্নিতে ঘৃত আহুতি দেওয়া হত বলে এই জুহু বা হাতাকে অগ্নির মুখ স্বরূপ বলা হয়েছে।

মেধাতিথির রচিত পরবর্তী সূক্তটি আপ্রী সূক্ত অর্থাৎ এর নিয়োগ হত পশু যজ্ঞে। এর বারোটি ঋকে বারোটি ভিন্ন নামে অগ্নির স্তুতি করা হয়েছে। এই নামগুলি হল সুসমিদ্ধ, পাবক, তনূনপাৎ অর্থাৎ ঘৃতভোজী, নরাশংস অর্থাৎ মানব প্রশংসিত, ঈলিত অর্থাৎ অগ্নির ইলা নামে স্তুত, বর্হি, দেবীদ্বার, নক্ত, ঊষা, ত্বষ্টা ও বনস্পতি। দীর্ঘতমা প্রভৃতি ঋষিদেরও অপ্রীসূক্ত ছিল, তাদের সংখ্যা দশ। প্রথম মণ্ডলের ১৩, ১৪২ ও ১৮৮ সূক্ত, দ্বিতীয় মণ্ডলের ৩ সূক্ত, তৃতীয় মণ্ডলের ৪ সূক্ত, পঞ্চম মণ্ডলের ৫ সূক্ত, ৭ম মণ্ডলের ২ সূক্ত, নবম মণ্ডলের ৫ সূক্ত এবং দশম মণ্ডলের ৭০ ও ১১০ সূক্ত আপ্রীসূক্ত নামে অভিহিত।

প্রথম মণ্ডলের ৬০ সূক্তে আমরা মাতরিশ্বা নাম পাই। গৌতমের পুত্র নোধা ঋষি ত্রিষ্টুপ ছন্দে বলছেন—

অগ্নি হব্যবাহক ও যশস্বী, যজ্ঞ প্রকাশক ও রক্ষণশীল,
দেবগণের দূত তিনি, তাদের নিকটে যান হব্য নিয়ে।
তিনি দুটি কাষ্ঠ থেকে জাত, ধনের মতো প্রশংসিত,
মিত্রের ন্যায় মাতরিশ্বা এই অগ্নিকে আনলেন
ভৃগুবংশীয়দের নিকটে ॥ ১ ॥

যাস্ক বলেছেন, মাতরিশ্বা অর্থ বায়ু। সায়নও এই রকম অর্থ করেছেন। কিন্তু বিদেশী পণ্ডিতরা এর দুটি অর্থ লিখেছেন। প্রথম অর্থ হল এই দেবতা বিবস্বানের দূত রূপে আকাশ থেকে অগ্নি এনে ভৃগুবংশীয়দের দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় অর্থ, মাতরিশ্বা অগ্নিরই গুপ্ত নাম। তাঁদের মতে বায়ু অর্থে মাতরিশ্বা বেদের আর কোথাও ব্যবহৃত হয় নি। প্রথম মণ্ডলেরই ৯৬ সূক্তে মাতরিশ্বা শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি ত্রিষ্টুপ ছন্দে বলেছেন—

অনেক বরণীয় পুষ্টি দান করেন অন্তরিক্ষস্থ মাতরিশ্বা,
তিনি স্বর্গদাতা, সমস্ত লোকের রক্ষক,
উৎপাদক দ্যাবা পৃথিবীর।
অগ্নি দেখিয়ে দিন আমার তনয়কে গমনের পথ,
দেবতা সেই ধনদাতাকে নিয়োগ করেছেন দূত রূপে ॥ ৪ ॥

সায়ন এখানে স্বীকার করেছেন যে মাতরিশ্বার অর্থ এখানে বায়ু নয়। এই শব্দটি অগ্নির বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তারপর তৃতীয় মণ্ডলের ২৬ সূক্তে মাতরিশ্বা শব্দের ব্যবহার দেখে সায়ন স্বীকার করেছেন যে অন্তরিক্ষ রূপ মাতৃক্রোড়ে বিদ্যুৎরূপে গমনাগমন করেন বলেই অগ্নির আর এক নাম মাতরিশ্বা। এই সূক্তে বিশ্বামিত্র ঋষি বলছেন —

আশ্রয় লাভের জন্য ও যজমানের যজ্ঞের জন্য
আমরা আহ্বান করি ক্ষিপ্রগামী অগ্নিকে।
তিনি শুভ, বৈশ্বানর, মাতরিশ্বা,
উকথযোগ্য যজ্ঞপতি মেধাবী শ্রোতা ও অতিথি ॥ ২ ॥

যে অগ্নি অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎ রূপে গমনাগমন করে, সেই মাতরিশ্বা অগ্নিই স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে ভৃগুবংশীয়দের নিকটে এনেছিলেন পৃথিবীর অগ্নিকে। এ যেন গ্রীকদের গল্প Prometheus স্বর্গ থেকে অগ্নি চুরি করে আনলেন মানুষের মঙ্গলের জন্য। এই কাহিনী থেকে

অনেকেই অনুমান করেন যে ভৃগু, মনু, অথর্ব, অঙ্গিরা প্রভৃতি কয়েকজন ঋষির বংশধররাই এই দেশে অগ্নির পূজা প্রচার করেছিলেন।

এই অগ্নি কী রকম দেবতা, তা বুঝতে কি কোন কষ্ট হয়? দুটি কাঠের ঘর্ষণে জন্ম হয় অগ্নির, তাঁর বৃদ্ধি হয় ঘৃতের আহুতিতে। তিনি কাঠের হাতায় দেবতাদের জন্য হবিগ্রহণ করেন। এই পার্থিব দেবতা অগ্নি কি আগুন ছাড়া অন্য কিছু! মানুষ যখন দুটি কাঠের টুকরো ঘষে আগুন জ্বালতে শিখেছিল এবং আগুনের দাহিকা শক্তি দেখে তার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছিল, সেদিন থেকেই সেই আগুন রক্ষা করার চেষ্টাকেই তারা ধর্মের কাজ বলে বিশ্বাস করেছিল। সব প্রযত্নে এই অগ্নিকে রক্ষা করতে হবে বলেই তারা গৃহে অগ্নি স্থাপন করেছিল, যজ্ঞের প্রবর্তন করেছিল। স্তব রচনা করেছিল অগ্নির এবং তাকে দেবতার স্থানে বসিয়েছিল সাদরে। ঋগ্বেদের সর্বত্র এই অগ্নিরই স্তব, কোন অপ্রত্যক্ষ দেবতার স্তব নয়।

পৃথিবীও ঋগ্বেদের ঋষিদের দেবতা। অত্রির পুত্র ভৌম ঋষি অনুষ্টুপ ছন্দে পৃথিবীর স্তব করেছেন—

হে পৃথিবী, এখানে তুমি খণ্ড ধারণ করছ পর্বতের,
তুমি শ্রেষ্ঠ ও বলশালী।
তুমি পৃথিবীর প্রীতি বিধান কর তোমার মাহাত্ম্যে ॥ ১ ॥
হে পৃথিবী বিচিত্র গমনশালিনী,
স্তোতারা তোমার স্তব করে গমনশীল স্তোত্র দিয়ে।
হে অর্জুনি, শব্দায়মান অশ্বের মতো
তুমি উৎক্ষিপ্ত কর বায়ুপূর্ণ মেঘ ॥ ২ ॥
যখন তোমার উপরে মেঘের বৃষ্টি পড়ে
দীপ্তিশালী অন্তরিক্ষ থেকে,
তখন তুমি বৃক্ষদের ধারণ করে থাকো
সবলে পৃথিবীর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে ॥ ৩ ॥

সায়ন এখানে পৃথিবীকে অন্তরিক্ষ বলে অন্য ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু ঋগ্বেদের অন্যত্র দ্যৌ ও পৃথিবী বিশ্বের পিতা মাতা রূপে কল্পিত হয়েছেন। পৃথিবী অবম: অর্থাৎ সবচেয়ে নীচের লোক এবং দ্যৌপরম অর্থাৎ সবচেয়ে উপরের লোক। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি গায়ত্রী ছন্দে বলছেন—

মহৎ দ্যৌ ও পৃথিবী রসে সিক্ত করুন
আমাদের এই যজ্ঞ।
আমাদের পূর্ণ করুন পুষ্টি দিয়ে॥ ১।২২।১৩ ॥

আকাশ আর্যদের প্রাচীন দেবতা। গ্রীকদের Zeus লাতিনে Ju বা Jupitar, জর্মানদের Tiu ও Zio এই সব দ্যৌ শব্দেরই রূপান্তর বলে মনে করেন পণ্ডিতেরা। দ্যৌ ও পৃথিবী অনেক দেবতার পিতা মাতা বলে বর্ণিত হয়েছেন। আবার দশম মণ্ডলের ৫৪ সূক্তে বৃহদুক্থ ঋষি ত্রিষ্টুপ ছন্দে ইন্দ্রকে বলেছেন—

আমাদের পূর্বতন কোন্ ঋষি পেয়েছে
তোমার অখিল মহিমার অন্ত ?
আপন দেহ থেকেই তুমি উৎপাদন করেছিলে
একই সঙ্গে তোমার পিতামাতাকে ॥ ১০।৫৪।৩ ॥

ইন্দ্রের স্তব করতে গিয়ে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে দ্যৌ ও পৃথিবীকে দেবতাদের পিতা মাতা রূপে কল্পনা করেছেন প্রাচীন ঋষিরা। তাই ইন্দ্র তাদের উৎপন্ন করেছেন বলবার পরে নিজের উক্তিকে সংশোধন না করে পূর্বতন ঋষিদের সম্বন্ধেই বলেছেন যে তাঁরা ইন্দ্রের অপার মহিমার কথা সব জানেন না। এ রকমের কথা অন্য কোন ঋষি বলেননি। ভরদ্বাজ ঋষি তো জগতী ছন্দে দ্যাবা পৃথিবীকে সকলের পিতা মাতা বলেছেন ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৭০ সূক্তে—

পিতা দ্যুলোক ও মাতা পৃথিবী অন্ন দান করুন আমাদের। ৬।

অপ্ বা জলও পৃথিবীর দেবতা। অন্তরিক্ষে উৎপন্ন হয়ে এই জল খাদে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রের দিকে যায়। বৃষ্টি পান করে জল অন্ন সঞ্চয় করে, মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে স্নেহময়ী জননীর মতো। মানুষকে দুষ্কৃতি থেকে মুক্ত করে বলেই আমরা জল মাথায় ঢালি ও স্নান করি নদীতে। এই জল নিয়ে ঋষিরা চারটি সূক্ত রচনা করেছেন। প্রথমে তাঁরা সরস্বতী নদীকেই দেবতা রূপে স্তব করেছিলেন। ভরদ্বাজ ঋষি ষষ্ঠ মণ্ডলের ৬১ সূক্তে বলছেন—

এই নদীরূপী সরস্বতী ভেঙে ফেলছেন পর্বত সানু
মৃণাল খননকারীর মতো প্রবল ও বেগবান তরঙ্গে।
রক্ষার নিমিত্ত আমরা স্তুতি করছি,
যজ্ঞ করে পরিচর্যা করছি এই উভয় কুলনাশিনী সরস্বতীর ॥২॥

প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তেও আমরা নদী অর্থেই সরস্বতীকে পাই। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা গায়ত্রী ছন্দে বলছেন—

পবিত্র অন্নযুক্ত যজ্ঞের ধনদাত্রী সরস্বতী
কামনা করুন আমাদের অন্নবিশিষ্ট যজ্ঞের ॥ ১০ ॥

সরস মানে জল এবং সরস্বতী নদী। আর্যাবর্তের সরস্বতী নদীকেই ঋষিরা প্রথমে দেবতা রূপে স্তুতি করেছিলেন। পুরাকালে

এই নদীর তীরেই যজ্ঞ হত। মন্ত্র পাঠ হত। তারপর কালক্রমে এই সরস্বতী নদীই মন্ত্রের দেবী ও বাগ্দেবীতে পরিণত হলেন। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি প্রথম মণ্ডলের ১৪২ সূক্তে বলছেন—

শুচি ও দেবতাদের মধ্যস্থা
হোম নিষ্পাদিকা ভারতী ইলা ও সরস্বতী
কুশের উপরে উপবেশন করুন যজ্ঞের উপযুক্তা হয়ে ॥১।১৪২।৯॥

সায়ন বলেছেন যে ভারতী এখানে স্বর্গের বাক, ইলা পৃথিবীর বাক ও সরস্বতী অন্তরিক্ষের বাক। এই ভাবেই পৃথিবীর নদী হয়েছেন অন্তরিক্ষের বাগ্দেবী।

এর পর সোমের কথা। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলে সবশুদ্ধ একশো চোদ্দটি সূক্ত আছে। সমস্ত সূক্তই পবমান সোম দেবতার স্তব। পবমান শব্দের অর্থ ক্ষরণশীল। অঙ্গিরা বংশের ঋষিরাই এই মণ্ডলের ঋষি। এই মণ্ডলের সূক্তগুলি থেকেই সামবেদের গানগুলি গৃহীত হয়েছে। এই সব পড়ে জানা যায় যে সেকালে সোমলতা মুজবান নামে এক পর্বতের শীর্ষে উৎপন্ন হত। তাই সোমলতাকে ঋগ্বেদে মৌজবত বলা হয়েছে। সোমরস তৈরির প্রণালীও ঋগ্বেদে আছে। সোমলতাকে প্রথমে জলে ভিজিয়ে রাখা হত। এর নাম আপ্যায়ন। তারপর সেই লতা পাথরে নিষ্পীড়িত করে দশ আঙুলে চটকে রস বার করা হত। এই রস মেষ-লোমের ছাঁকনিতে ছেঁকে পরিস্রুত সোমরস বা শুচি কলসীতে রাখা হত। তারপর তাকে সুস্বাদু করবার জন্য সিদ্ধির মতো দুগ্ধ, দধি বা যবের সঙ্গে মিলিয়ে পান করা হত। সোমলতা পেষণ করলে দুধের মতো সাদা ঈষৎ অম্লরস নির্গত হয়, তাকে মাদকে পরিণত করে যজ্ঞে ব্যবহৃত হত। প্রাচীন আর্যদের মধ্যে এই সোমপানের বহুল প্রচলন ছিল। যত দূর জানা যায়, হিন্দু আর্যরা এই সোমরস মাদক রূপে ও ইরাণী আর্যরা স্বাভাবিক অবস্থায় পান করতেন। তাঁরা একে হওমা বলতেন এবং যজ্ঞে অভিষব দিতেন। আর্য জাতির এই দুই শাখায় বিবাদের কারণ বোধ হয় এই সোম রসের মাদক রূপে ব্যবহার।

প্রথম মণ্ডলের ৮০ সূক্তে রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি পংক্তি ছন্দে বলছেন—

হে ইন্দ্র, তোমাকে হর্ষযুক্ত করেছে
শ্যেন পক্ষীর আনা সেচনযুক্ত সোমরস।
হে বজ্রী, তারই বলে তুমি অন্তরিক্ষের নিকট হতে
বৃত্রকে বিনাশ করে প্রকটিত করেছিলে নিজের প্রভুত্ব ॥ ২ ॥

শ্যেন পক্ষী যে সোম এনেছিল, তা ঋগ্বেদের আরও কয়েক জায়গায় আছে। সায়ন শ্যেনের অর্থ বলেছেন গায়ত্রী কিন্তু এ কথার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অবশ্য যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণে আছে যে গায়ত্রী বা বাগ্দেবী পক্ষীরূপে দ্যুলোক থেকে সোম আহরণ করেছিলেন ॥ ১১।৭।২।৮ ॥ Zeus-এর অমৃত বাহক ঈগলের সঙ্গে এই কাহিনীর তুলনা করা যেতে পারে।

কোন মন্ত্রে বলা হয়েছে যে গন্ধর্বরা সোমের রক্ষক ছিলেন। এই নিয়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে একটি সুন্দর উপাখ্যান আছে।

গন্ধর্বদের নিকটে ছিলেন সোমরাজা। কী ভাবে সোমকে আনা যায়, এই নিয়ে দেবতা ও ঋষিরা চিন্তা করতে লাগলেন। বাগ্ দেবতা বললেন, গন্ধর্বরা রমণী প্রিয়, আমি তাই স্ত্রীরূপ ধারণ করছি। আমার বিনিময়ে তোমরা সোমকে জয় কোরো। দেবতারা বললেন, না, তা কখনও হতে পারে না। তোমাকে ছেড়ে আমরা কীভাবে জীবন ধারণ করব? এর উত্তরে বাক্দেবতা বললেন, যেমন করে বলেছি, তেমন করেই তোমরা সোমকে ক্রয় কর। তার পরে তোমরা যখনই আমার প্রয়োজন বোধ করবে, তখনই আমি তোমাদের নিকটে চলে আসব। তাই হোক, বলে দেবতারা এ কথায় রাজী হলেন এবং তাঁরা নগ্ন স্ত্রীরূপধারী বাগ্দেবতাকে দিয়ে রাজা সোমকে ক্রয় করলেন ॥ ১।২৭ ॥

ঋগ্বেদের প্রায় সমস্ত সূক্তেই সোম লতা বা ওষধী রূপেই স্তুত হয়েছেন। পরবর্তী কালে কী ভাবে এই সোমলতা আকাশের চন্দ্রে পরিণত হলেন তা বোঝা কঠিন। সোমলতা ও চন্দ্র উভয়েই ওষধীপতি। যাস্কের নিরুক্ত গ্রন্থের টীকাকার দুর্গাচার্য লিখেছেন, ওষধি সোম পঞ্চদশচ্ছদ। তার পর্ণগুলি শুক্লপক্ষের প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত চন্দ্রকলা বৃদ্ধির সঙ্গে পুষ্ট হতে থাকে এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত চন্দ্রকলার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ ও বিশীর্ণ হয়ে পড়ে। অমাবস্যায় শুধু লতাটি থাকে। চন্দ্রকলার ক্ষয় বৃদ্ধির সঙ্গে সোমলতারও ক্ষয় বৃদ্ধির সামঞ্জস্য দেখে প্রাচীন ঋষিরা হয়তো সোমের সঙ্গে চন্দ্রের অভিন্নতা কল্পনা করে থাকবেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে এখন আর সোমলতার সন্ধান পাওয়া যায় না। বেদের সরস্বতী নদী যেমন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তেমনি সোমলতার আস্বাদ পাবারও উপায় আর নেই। বেদের সূক্তগুলিতে এই সোমলতার নানা গুণের কথা পড়ে আমরা এখন বিস্মিত হই।

অনেকের মতে ব্রহ্মণস্পতি ও বৃহস্পতিও পৃথিবীর দেবতা। প্রথম

মণ্ডলের ১৮ সূক্তে কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি গায়ত্রী ছন্দে ব্রহ্মণস্পতির স্তব করছেন—

হে ব্রহ্মণস্পতি, সোমরস দাতাকে দেবতাদের নিকটে কর প্রসিদ্ধ
উশিজ-পুত্র কুক্ষীবানের মতো ॥ ১ ॥
যিনি ধনবান ধনদাতা রোগহন্তা পুষ্টিবর্ধক ও ফলপ্রদ,
সেই ব্রহ্মণস্পতি অনুগ্রহ করুন আমাদের ॥ ২ ॥
উপদ্রবকারী মানুষের সহিংস নিন্দা যেন স্পর্শ না করে,
রক্ষা কর আমাদের, হে বনস্পতি ॥ ৩ ॥
যে মানুষকে বর্ধন করেন ইন্দ্র সোম ও ব্রহ্মণস্পতি,
বিনাশ নেই সেই বীরের ॥ ৪ ॥
হে ব্রহ্মণস্পতি, তুমি সোম ইন্দ্র ও দক্ষিণা
মানুষকে রক্ষা কর পাপ থেকে ॥ ৫ ॥

ঋগ্বেদে ব্রহ্ম অর্থে স্তুতি বা প্রার্থনা। সায়নের এই অর্থ বিদেশী পণ্ডিতরাও গ্রহণ করেছেন। ব্রহ্ম শব্দের সাতটি অর্থ হতে পারে—প্রার্থনা, মন্ত্র, পবিত্র বাক্য, জ্ঞান, সততা, পরমাত্মা ও পুরোহিত। বৃহ ধাতু থেকেই বৃহস্পতি ও ব্রহ্মণস্পতি। এই ধাতুর দুটি অর্থ হল বর্ধন ও বাক্য।

বেদে বৃহস্পতি সাধারণত পুরোহিত। অনেক জায়গায় ইন্দ্র ও বৃহস্পতির স্তব একত্রে করা হয়েছে। ইন্দ্রের অনেক কাজ বৃহস্পতির নামেও বলা হয়েছে। তিনি পণিদের গহ্বর থেকে গাভী উদ্ধার করেন, নদী প্রবাহিত করেন সমুদ্রের দিকে, তিনিই স্তোত্রের শক্তি বল নামের অসুর নিধন করেন। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে এই বৃহস্পতি তিষ্য নক্ষত্রের অধিপতি দেবতা এবং এরও পরবর্তী কালে তিনি নিজেই জ্যোতিষ্কে পরিণত হয়েছেন।

মন্ত্রের পতি বৃহস্পতিই ব্রহ্মণস্পতি। গৃৎসমদ ঋষি জগতী ছন্দে তাঁর স্তব করেছেন—

হে ব্রহ্মণস্পতি, দেবতাদের মধ্যে তুমি, গণপতি,
কবির কবি, তোমার অন্নই সর্বোৎকৃষ্ট।
তুমি মন্ত্রের স্বামী, রাজা প্রশংসনীয়দের,
তোমাকে আহ্বান করি আমরা,
এই স্তুতি শুনে তুমি উপবেশন কর যজ্ঞ গৃহে
আমাদের আশ্রয় প্রদানের জন্য ॥ ২।২৩।১ ॥

ঘোর পুত্র কণ্ব ঋষি বলছেন—

হে ব্রহ্মণস্পতি, উত্থান কর তুমি,
দেবতা কামনা করে আমরা যাচ্ঞা করছি তোমাকে।

এই বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতি উপনিষদের ব্রহ্ম নন, ব্রহ্মাও নন পুরাণের। ইনি সৃষ্টিকর্তা নন, ঈশ্বরের ত্রিমূর্তিরও এক মূর্তি নন। ইনি বাক্ দেবতা, প্রার্থনার দেবতা, মন্ত্রের দেবতা। ইনি পুরোহিত, মন্ত্র উচ্চারণ করেন ইনি। মন্ত্রেরও অধিপতি ইনি। ইনি অনুপস্থিত থাকলে যজ্ঞ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এর উচ্চারিত স্তোত্র শুনে প্রীত হন দেবতারা।

ঋগ্বেদ রচনার কালে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা রূপে এক ঈশ্বরের ধারণা ঋষিদের নিকটে স্পষ্ট ছিল না। তাঁরা প্রকৃতির রূপ দেখেই মুগ্ধ হয়েছেন। যা কিছু সুন্দর মহৎ ও উপকারী, তা ভালো লেগেছে তাঁদের। শক্তির প্রকাশ দেখে বিস্মিত হয়েছেন, আনন্দে অভিভূত হয়ে স্তব রচনা করেছেন তাঁরা। তারপর ধীরে ধীরে এসেছে এই প্রত্যক্ষ বিশ্বের পিছনে একের অস্তিত্ব চিন্তা। সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা বুঝতে পারলেন যে এই সব কিছুর কারণ কোন দেবতা নন, তিনি দেবতারও দেবতা। তাঁর কোন রূপ নেই, পরিচয় নেই, নামও নেই। ঋষিরা তাঁরই নাম দিলেন ব্রহ্ম। বেদান্ত ও উপনিষদে এই ব্রহ্মেরই অনুসন্ধান।

আকাশের দেবতা

অন্তরীক্ষের বা আকাশের দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র সর্ব প্রধান। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে দ্বিতীয় সূক্তেই তাঁর নামোল্লেখ আছে। মধুছন্দা ঋষি গায়ত্রী ছন্দে বায়ু দেবতার স্তবে বলেছেন—

হে ইন্দ্র ও বায়ু, অভিষুত হয়েছে এই সোমরস,
অন্ন আনো, সোমরস কামনা করছে তোমাদের ॥ ১।২।৪ ॥

এই দেশের সুখ সমৃদ্ধি নির্ভর করে বৃষ্টির উপরে। কৃষি প্রধান দেশের ভূমির উর্বরতা, নদীর জল, শস্য—এ সবই আসে বৃষ্টি থেকে। মানুষের জীবন ও সুখ বৃষ্টির উপরেই নির্ভরশীল বলে বৃষ্টি দাতা ইন্দ্রের গৌরবই সব চেয়ে বেশি।

এই মণ্ডলেরই ২৩ সূক্তে মেধাতিথি গায়ত্রী ছন্দে বলছেন—

যজ্ঞের পালক ইন্দ্র ও বায়ু মনের মতো বেগবান ও সহস্রাক্ষ।
মেধাবী লোকে তাঁদের আহ্বান করেন রক্ষণের জন্য ॥ ১।২৩।৩॥

মনের মতো বেগবান ও সহস্রাক্ষ ইন্দ্র ও বায়ু উভয়েরই বিশেষণ, কিন্তু আমরা সাধারণত বায়ুকেই মনের মতো বেগবান বলি এবং ইন্দ্রকেই সহস্রাক্ষ বলে জানি। অসংখ্য নক্ষত্রখচিত আকাশই সহস্রাক্ষ, ইন্দ্র এই আকাশেরই দেবতা।

অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি ত্রিষ্টুপ ছন্দে ইন্দ্রের স্তব করছেন প্রথম মণ্ডলের ৩২ সূক্তে।—

বজ্রধারী ইন্দ্র যে পরাক্রমের কাজ করেছিলেন প্রথমে,
আমি তাঁর সেই কর্মের বর্ণনা করছি।
তিনি হনন করেছিলেন অহিকে,
তারপর করেছিলেন বারি বর্ষণ,
ভেদ করে দিয়েছিলেন বহনশীল পার্বত্য নদীর পথ ॥ ১ ॥
ইন্দ্র হনন করেছিলেন পর্বতাশ্রিত অহিকে।
সুদূরপাতী বজ্র নির্মাণ করেছিলেন ত্বষ্টা ইন্দ্রেরই জন্য।
তারপর গাভী যেমন বৎসের দিকে ধায় সবেগে,
ধারাবাহী জল তেমনি করেই ছুটেছিল সমুদ্রের দিকে ॥ ২ ॥
বৃষের মতো বেগে ইন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন সোম,
তিন রকম যজ্ঞে অভিষুত সোম পান করেছিলেন তিনি।
মঘবান সায়ক গ্রহণ করেছিলেন বজ্র,
তাই দিয়েই হনন করেছিলেন অহিদের প্রথম জাতকে ॥ ৩ ॥
তুমি যখন এই প্রথম জাতকে করলে হনন,

বিনাশ করলে মায়াবীদের মায়া,
তখন প্রকাশ করলে সূর্য ঊষা ও আকাশকে,
রাখলে না তাদের কোন শত্রু ॥ ৪ ॥
ইন্দ্র বিনাশ করলেন মহাধ্বংসকারী বজ্রে,
জগতের আবরণকারী বৃত্রকে ছিন্নবাহু করে।
অহি পড়ে আছে পৃথিবী স্পর্শ করে
কুঠারে ছিন্ন বৃক্ষস্কন্ধের মতো ॥ ৫ ॥
দর্পযুক্ত বৃত্র ভেবেছিল, নেই আপনার তুল্য যোদ্ধা,
তাই যুদ্ধে আহ্বান করেছিল মহাবীর ও শত্রুজয়ী ইন্দ্রকে।
কিন্তু রক্ষা পেল না ইন্দ্রের বিনাশ কার্যে,
ইন্দ্র-শত্রু বৃত্র নদী পিষ্ট করল নদীতে পতিত হয়ে ॥ ৬ ॥
ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করল হস্তপদশূন্য বৃত্র,
তার সানুতুল্য প্রৌঢ় স্কন্দে বজ্রাঘাত করলেন ইন্দ্র।
পুরুষত্বহীন বৃত্র বৃথা যত্ন করল ইন্দ্রের সাদৃশ্য লাভে,
ভূমিতে পতিত হল বহু স্থানে ক্ষত বিক্ষত হয়ে ॥ ৭ ॥
নদী যেমন বয়ে যায় ভগ্ন কূল অতিক্রম করে,
তেমনি করেই বয়ে যাচ্ছে জল বৃত্রের দেহ অতিক্রম করে।
জীবদ্দশায় এই জল সে বদ্ধ করে রেখেছিল নিজের মহিমায়।
অহি এখন শয়ন করল সেই জলের পদের নিচে ॥ ৮ ॥
তির্যক ভাবে রইল বৃত্রের মাতা।
ইন্দ্র অস্ত্রাঘাত করলেন তার অধোভাগে,
তাতে মাতা উপরে ও নিচে রইল পুত্র,
বৎসের সাথে ধেনুর মতো বৃত্রের মাতা দনুও শুয়ে পড়ল ॥৯॥
স্থিতিহীন বিশ্রামহীন জলের মধ্যে
ইন্দ্র-শত্রু পতিত রয়েছে দীর্ঘ নিদ্রায়।
সেই নামহীন শরীরের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে জল ॥ ১০ ॥
গাভীরা যেমন গুপ্ত ছিল পণির দ্বারা,
বৃত্রের পত্নীরা তেমনি নিরুদ্ধ ছিল অহি রক্ষিত হয়ে।
রুদ্ধ ছিল জলের বহন দ্বার,
সে দ্বার খুলে দিয়েছেন ইন্দ্র বৃত্রকে হনন করে ॥ ১১ ॥
হে ইন্দ্র, সেই এক দেব বৃত্র যখন আঘাত হেনেছিল,
তুমি তা নিবারণ করেছিলে অশ্ব পুচ্ছের মতো হয়ে।
তুমি গাভী জয় করেছ, জয় করেছ সোমরস,
ছেড়ে দিয়েছ সপ্ত সিন্দুর প্রবাহ ॥ ১২ ॥

ইন্দ্র ও অহি যখন যুদ্ধ করছিলেন,
তখন ইন্দ্রকে স্পর্শ করল না অহির মেঘ গর্জন বা জলবর্ষণ।
ইন্দ্র জয় করেছিলেন তার সমস্ত মায়া ॥ ১৩ ॥
হে ইন্দ্র, তোমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল
অহিকে হনন করবার সময়।
তুমি প্রতীক্ষা করেছিলে অহির অন্য কোন হন্তার জন্য,
যে ভয়ে শ্যেনপক্ষীর মতো পার হয়ে ছিল নদী ও জল ॥ ১৪ ॥
বজ্রবাহু ইন্দ্র হলেন স্থাবর-জঙ্গম, শান্ত ও শৃঙ্গী পশুদের রাজা,
মানুষের রাজা হয়েও নিবাস করেছেন তিনি।
চক্রের নেমি যেমন ধারণ করে মাঝখানের কাঠ,
তেমনি ইন্দ্রও সকলকে ধারণ করেছিলেন নিজের মধ্যে ॥ ১৫ ॥

উপরে সম্পূর্ণ সূক্তের অনুবাদ দেওয়া হল। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে মেঘের নাম বৃত্র বা অহি এবং ইন্দ্র মেঘকে বজ্র দিয়ে আঘাত করে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, এই রকম উপলব্ধি করে ঋষি উপমা ও কল্পনায় সম্পূর্ণ কবিতা লিখেছেন। ঋগ্বেদের এই আখ্যান থেকেই নাকি পুরাণে বৃত্র নামে অসুরের সঙ্গে ইন্দ্রের যুদ্ধের গল্প রচিত হয়েছে। একথাও শোনা যায় যে প্রাচীন আর্যদের মধ্যে বৃত্র হন্তার যুদ্ধের গল্প প্রচলিত ছিল, তাই অন্যান্য আর্য জাতির মধ্যেও এই গল্প প্রচলিত দেখা যায়। ইরাণীদের 'অবস্তায়' বৃত্র হন্তার উপাসনা আছে। গ্রীকদের মধ্যেও অহির কাহিনী আছে। অহি ও বৃত্র একই। ইন্দ্র পণিকে জয় করে দেবতাদের গাভী উদ্ধার করেন, এ সম্বন্ধেও একটি গল্প আছে। অনেকে মনে করেন যে এই গল্পে প্রাতঃকালে অন্ধকার নাশ ও আলোর প্রকাশ সম্বন্ধে উপমা দেওয়া হয়েছে। যাস্কের মতে বৃত্রের অর্থ জল অবরোধকারী মেঘ মাত্র।

পণ্ডিতদের সঙ্গে আমি এক মত হতে পারি না। তাঁরা মনে করেন যে ঋগ্বেদে ইন্দ্রের বৃত্র বধ কাহিনী নিয়ে পুরাণকাররা একটি গল্প রচনা করেছিলেন। কিন্তু আসলে ব্যাপারটি ঠিক উল্টো। পুরাণে যে বৃত্র বধের কাহিনী পাওয়া যায় তা ইতিহাসের সত্য ঘটনা। ঋগ্বেদের ঋষিরা সে ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন নি, তার কারণ এটি ঘটেছিল কয়েকশো বৎসর পূর্বে। এই গল্প ঋষিরা মুখে মুখে শুনেআসছিলেন এবং বজ্র বিদ্যুতে মেঘ ছিন্ন ভিন্ন করে বৃষ্টিপাতের ঘটনাকেই তাঁরা বৃত্রের সঙ্গে ইন্দ্রের যুদ্ধ বলে বর্ণনা করলেন। মানুষ জানা ও শোনা কথাই কল্পনা করতে পারে, যা জানা বা শোনা নয় তা উপমা রূপে ব্যবহার করা অসম্ভব বলেই মনে হয়।

ইন্দ্র যে কোন কল্পিত দেবতা নন, তা কতটা নিঃসন্দেহে বলা চলে। তৃতীয় মণ্ডলের ৩৪ সূক্তে বিশ্বামিত্র ঋষি ত্রিষ্টুপ ছন্দে বলছেন—

ইন্দ্র অশ্ব দান করেছেন, দান করেছেন সূর্য,
বহু লোকের উপভোগযোগ্য গোধন দান করেছেন।
দান করেছেন সুবর্ণময় ধন,
আর্য বর্ণকে রক্ষা করেছেন দস্যুদের বধ করে ॥ ৩।৩৪।৯ ॥

এখানে বর্ণ অর্থ জাতি। আগেই বলেছি যে ঋগ্বেদ রচনা যখন চলছিল, তখন এ দেশে দুটি মাত্র জাত ছিল—আর্য এবং অনার্য বা দাস। সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবার পর যারা এ দেশে রয়ে গিয়েছিল, আর্যরা এসে তাদেরই দাস নাম দেয়। দশম মণ্ডলের ১০২ সূক্তে আমরা পেয়েছি—

হে ইন্দ্র, বজ্রপাত কর অনিষ্টকারী নিধনোদ্যত শত্রুদের উপরে।
দাস জাতীয় হোক বা আর্য জাতীয় হোক,
ওকে বধ কর অপ্রকাশ রূপে ॥ ১০।১০২।৩ ॥

এই ঋকের অর্থ অস্পষ্ট হলেও দুটি জাতির উল্লেখ আছে। অনেক সময়েই দেখা গেছে যে দাস জাতির লোক কোন আর্য জাতির পক্ষ অবলম্বন করেছে যুদ্ধের সময়ে। তাই দুই জাতিই তখন শত্রু স্থানীয়।

ইন্দ্রের আর একটি গুণ, তিনি অত্যধিক সোমরস প্রিয় ছিলেন। তাই প্রগাথের পুত্র কলি ঋষি ইন্দ্রের স্তব করছেন—

তোমরা বাধা পেলে যিনি ধন দেন বেগবান অশ্বের সাহায্যে,
সেই ইন্দ্রের পরিচর্যা কর বৃহৎ সাম গান করে।
লোকে যেমন আহ্বান করে হিতকারী কুটুম্ব পোষককে,
আমরাও তেমনি ইন্দ্রকে আহ্বান করি অভিযুত সোমযজ্ঞে ॥১॥
দুর্ধর্ষ শত্রুরা নিবারণ করতে পারে না সুন্দর-হনু ইন্দ্রকে,
স্থির দেবতারা পারে না, পারে না মানুষও।
সোমপানের আনন্দ লাভের জন্য তিনি দান করেন
প্রশংসাকারী সোমাভিষবকারী স্তোতার উদ্দেশে ॥ ২ ॥

দশম মণ্ডলের ৪২ সূক্তে কৃষ্ণাখ্য ঋষিও বলছেন—

জল যেমন নদীর দিকে যায়,
ক্ষুদ্র জল প্রবাহ পড়ে হ্রদের মধ্যে,
সোমরসও তেমনি ইন্দ্রের মধ্যে যায়।
পণ্ডিতরা তাঁর তেজ বৃদ্ধি করেন যজ্ঞস্থলে,
স্বর্গীয় বৃষ্টিপাতে যবশস্যের বৃদ্ধির মতো ॥ ১০।৪২।৭ ॥

এই জন্যই বিশ্বামিত্র ঋষি তৃতীয় মণ্ডলের ৫৩ সূক্তে বলছেন—

হে মঘবন, কিছুকাল সুখে অবস্থান কর এই যজ্ঞে,
যেও না চলে। সুন্দর অভিষুত সোমে যাগ করছি তোমার।
হে শক্তিমান, পুত্র যেমন মধুর বাক্যে ধরে পিতার বস্ত্র-প্রান্ত,
আমিও তোমার বস্ত্র প্রান্ত গ্রহণ করছি মধুর স্তুতি দিয়ে ।।২।।

এই ইন্দ্রের আসল পরিচয় আমরা জানি না। তিনি অন্তরিক্ষের দেবতা, বায়ুর সঙ্গে তাঁর নামের উল্লেখ দেখেছি। তিনি বজ্রী, বজ্রধারী দেবতা, মেঘ ছিন্ন ভিন্ন করে আকাশের জল মুক্ত করেন। বৃষ্টিপাত হয় তাঁরই চেষ্টায়। ঋগ্বেদের ঋষিরা এই প্রাকৃতিক শক্তিকেই ইন্দ্র বলেছেন। তারপর তাঁরই উপরে আরোপ করেছেন বৃত্র বধ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা, দস্যুদের হাত থেকে আর্যদের রক্ষার কথা। দেবতা জাতির রাজা ইন্দ্র প্রাকৃতিক শক্তির দেবতায় পরিণত হয়েছেন। তিনিই সোমপান করতেন, সোমরস প্রিয় ছিলেন। সোম পান করে বল বৃদ্ধি হত। আর্যদের প্রিয় পানীয় ছিল সোমরস। পৃথিবীর দেবতা সোম অন্তরিক্ষের দেবতা ইন্দ্রেরও প্রিয় পানীয়।

ইন্দ্রের সঙ্গে বায়ুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যাস্ক তাঁর নিরুক্তে বায়ুকেও অন্তরিক্ষের দেবতা বলেছেন। তিনিও আদিম আর্যদের আরাধ্য দেবতা ছিলেন। প্রাচীন ইরাণীদের জেন্দ ভাষায় লিখিত অবস্তা গ্রন্থে বায়ু দেবতার উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ২ সূক্তে মধুচ্ছন্দা ঋষি বায়ুর স্তব করেছেন—

হে দর্শনীয় বায়ু, এস, পান কর এই অভিষুত সোমরস,
শ্রবণ কর আমাদের আহ্বান ।। ১ ।।
হে বায়ু, যজ্ঞাভিজ্ঞ স্তোতাগণ সোমরস অভিষুত করে
স্তব করছেন তোমার উদ্দেশে ।। ২ ।।
হে বায়ু, হব্যদাতা যজমানের নিকটে আসছে
তোমার সোমগুণ প্রকাশক বাক্য সোমপানের জন্য,
আসছে অনেকের নিকটেই ।। ১।২।৩ ।।

এর পরেই ইন্দ্রের সঙ্গে একত্রে তাঁর স্তুতি। ঋগ্বেদের বহু সূক্তে ইন্দ্র ও বায়ু এক সঙ্গে সোমপানের জন্য আহূত হয়েছেন। দেবতাদের মধ্যে বায়ুর গতিই সবচেয়ে ক্ষিপ্র। এই নিয়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে একটি উপাখ্যান আছে ।। ২।২৫ ।। দেবতারা একবার বাজি রেখে দৌড়ে ছিলেন। তাতে বায়ু সমস্ত দেবতাকে হারিয়ে দেন। নিযুৎ নামে একটি অশ্ব বায়ুর বাহন, তিনি ত্বষ্টার জামাতা এবং তাঁর জন্ম পুরুষের প্রাণ থেকে ।। ১০।৯০।১৩ ।।

পুরুষের মন থেকে চন্দ্র হলেন, চক্ষু থেকে সূর্য.
মুখ থেকে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ থেকে বায়ু ॥ ১৩ ॥
নাভি থেকে আকাশ ও মস্তক থেকে স্বর্গ,
দুই চরণ থেকে ভূমি ও কর্ণ থেকে দিক
ও সমস্ত ভুবন নির্মাণ করা হল ॥ ১০।৯০।১৪ ॥

দশম মণ্ডলের এই বিখ্যাত সূক্তটি পুরুষ সূক্ত নামে অভিহিত।

বায়ুর আরও নাম পাওয়া যায়। এই রকমের একটি নাম বাত। বায়ুর সঙ্গে ইন্দ্রের মতো বাতের সঙ্গে পর্জন্যের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। যে বায়ুর রূপ নেই, অথচ গতি ও শব্দ আছে, তারই নাম বাত।

পর্জন্য শব্দের আদি অর্থ ছিল মেঘ। সায়নই এই কথা বলেছেন। কণ্ব ঋষির মরুৎ স্তবে আছে—

মরুৎগণ জলে ভরা পর্জন্য দিয়ে করেছেন অন্ধকার
দিনের বেলাতেও। জল-সিক্ত করছেন পৃথিবী ॥ ১৩৮।৯ ।

এরপর পর্জন্য বজ্রধারী বৃষ্টির দেবতায় পরিণত হয়েছেন ॥ ৫।৮৩ ॥ অত্রির অপত্য ভৌম ঋষি তাঁর স্তব করছেন—

হে স্তোতা তুমি প্রার্থনা কর
বলশালী পর্জন্যের অভিমুখবর্তী হয়ে।
এই সব স্তোত্রে তাঁর স্তব কর, পরিচর্যা কর হব্য দিয়ে।
গর্জনকারী দানশীল পর্জন্য
বৃষ্টিপাতে গর্ভ উৎপাদন করেন ওষধির। ২ ॥
তিনি নষ্ট করেন বৃক্ষ, বধ করেন রাক্ষস,
সমগ্র ভুবনকে ভয় দেখান বিপুল সংহার কার্যে,
পাপিষ্ঠকে সংহার করেন গর্জনকারী পর্জন্য,
ভয়ে পলায়ন করেন নিরপরাধ মানুষ ॥ ২ ॥
রথী যেমন কশাঘাতে অশ্বকে উত্তেজিত করে
দৃষ্টি পথের পথিক করেন যোদ্ধাকে,
পর্জন্যও তেমনি মেঘ অপসারিত করে
আবিষ্কার করেন বারি বর্ষণকারী মেঘ।
তিনি যখন অন্তরিক্ষে ব্যাপ্ত করেন বারিদ.
তখন দূর থেকে উদ্‌গত হয় সিংহের মতো মেঘের গর্জন ॥৩॥
পর্জন্য যখন পৃথিবী রক্ষা করেন বৃষ্টি দিয়ে,
তখন বায়ু বয় প্রবল বেগে, বিদ্যুৎ চমকায়।
ওষধি হয় অঙ্কুরিত, বিগলিত হয় অন্তরিক্ষ।
আর পৃথিবী সমর্থ হয় সমস্ত জীবের হিতসাধনে ॥ ৪ ॥

হে পর্জন্য, তোমারই কাজে পৃথিবী হয় অবগত,
পুষ্টি লাভ করে খুর বিশিষ্ট গবাদি পশু,
ওষধিরা ধারণ করে বিবিধ রূপ,
আর তুমি আমাদের প্রদান কর বিপুল সুখ ॥ ৫ ॥
হে মরুদ্‌গণ, আমাদের জন্যই বৃষ্টি দান কর অন্তরিক্ষ থেকে,
ক্ষরণ কর বর্ষণকারী ও সর্বব্যাপী মেঘের ধারা।
হে পর্জন্য, জল সেচন করে তুমি এসো মেঘের সঙ্গে,
তুমি বারি বর্ষক হও, আর রক্ষক হও আমাদের ॥ ৬ ॥
তুমি শব্দ কর পৃথিবীর উপর, গর্জন কর,
বারি বর্ষণে গর্ভবিধান কর ওষধি সমূহের,
বারিপূর্ণ রথে পরিভ্রমণ কর অন্তরিক্ষে,
দৃঢ়বদ্ধ মেঘ উন্মুক্ত করে সমতল কর উচ্চ ও নিম্ন ভূমি ॥ ৭ ॥
হে পর্জন্য. বিপুল মেঘকে তুমি উত্তোলন কর উর্ধ্বে,
তা থেকে বারি বর্ষণ কর।
নদীরা সম্মুখে প্রবাহিত হোক অপ্রতিহত বেগে।
আদ্র কর স্বর্গ ও পৃথিবীকে, ধেনুর জন্য দাও প্রচুর পানীয় ॥৮॥
হে পর্জন্য, তুমি যখন পাপকারী মেঘ কর বিদীর্ণ
গম্ভীর ধ্বনিতে গর্জন করে,
তখন হৃষ্ট হয় অখিল বিশ্ব
ও তার অন্তর্গত সকল পদার্থ ॥ ৯ ॥
হে পর্জন্য, তুমি বর্ষণ করেছ, এখন সংহরণ কর বৃষ্টি,
মরুভূমিকেও জলযুক্ত করেছ সুগম্য করবার জন্য।
মানুষের ভোগের জন্য উৎপাদন করেছ ওষধি,
স্তুতি ভাজন হয়েছ তাদের ॥ ৫।৮৩।১০ ॥

এই সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে মরুদ্‌গণ ও পর্জন্য বোধহয় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে লিথুয়ানিয়ান Perkunos-এর সঙ্গে পর্জন্যের সাদৃশ্য আছে। ঋগ্বেদে পর্জন্যকে অন্তরিক্ষের পুত্র বলা হয়েছে। সপ্তম মণ্ডলের ১০২ সূক্তে বসিষ্ঠ ঋষি ত্রিষ্টুপ ছন্দে বলছেন—

অন্তরিক্ষের পুত্র পর্জন্যদেব সেচনে সমর্থ,
তাঁর উদ্দেশে উচ্চারণ কর স্তোত্র।
তিনি ইচ্ছা করুন আমাদের অন্ন ॥ ১ ॥
তিনি গর্ভ উৎপাদন করেন ওষধির,
গো অশ্ব ও নারীগণেরও ॥ ২ ॥

তাঁরই উদ্দেশে হোম কর সরস হব্য
দেবগণের আর্যভূত অগ্নিতে।
আমাদের জন্য তিনি নিশ্চিত করেন অন্ন ॥ ৭।১০২।৩ ॥

এটি তিন ঋকের একটি সম্পূর্ণ সূক্ত। পর্জন্যকে এখানে অন্তরিক্ষের পুত্র বলে কল্পনা করা হয়েছে।

এরপর মরুদ্‌গণের কথা। প্রথম মণ্ডলের ৬ সূক্তে মধুচ্ছন্দা ঋষি গায়ত্রী ছন্দে ইন্দ্রের স্তব করছেন—

চারিদিকের মানুষ যোজনা করছে
সূর্যরূপ ইন্দ্রের প্রতাপান্বিত অশ্ব।
আকাশে দীপ্যমান রয়েছে আলোক ॥ ১ ॥
তারা রথের উভয় পার্শ্বে সংযোজিত করে
ইন্দ্রের রক্তবর্ণ হরি নামের অশ্বদ্বয় ॥ ২ ॥
হে মনুষ্যগণ, সূর্যরূপ ইন্দ্র করেন সংজ্ঞা দান
নিদ্রায় সংজ্ঞারহিতকে,
রূপরহিতকে রূপ দান করেন অন্ধকারে,
উদিত হন জ্বলন্ত রশ্মির সাথে ॥ ৩ ॥
তারপর মরুদ্‌গণ ধারণ করে যজ্ঞার্হ নাম
মেঘের মধ্যে রচনা করলেন জলের গর্ভাকার ॥ ৪ ॥
হে ইন্দ্র, অন্বেষণ করে তুমি উদ্ধার করেছিলে
গুহায় লুকানো গাভী
এই বহনশীল ও দৃঢ় স্থানভেদী মরুদ্‌দের সাথে ॥ ৫ ॥
স্তোতারা সুমন্ত্রী ইন্দ্রের মতো স্তুতি করে
এই বিখ্যাত মরুদ্‌দের দেবতা কামনা করে ॥ ৬ ॥
হে মরুদ্‌গণ, ভীতিরহিত ইন্দ্রের সাথে যেন
তোমাদের মিলিত দেখা যায়।
তোমরা নিত্য প্রমুদিত ও তাঁরই মতো দীপ্ত বিশিষ্ট ॥ ৭ ॥
এই যজ্ঞ অর্চনা করছে সবল ইন্দ্রকে
নির্দোষ স্বর্গাভিগত মরুদ্‌গণের সাথে ॥ ৮ ॥
হে চতুর্দিকব্যাপী মরুৎগণ,
এসো অন্তরিক্ষ থেকে, আকাশ থেকে, আদিত্য মণ্ডল থেকে।
ঋত্বিক এই যজ্ঞে স্তুতি করছে সম্যক রূপে ॥ ৯ ॥
ধন দানের জন্য ইন্দ্রের নিকটে করি যাচঞা
পৃথিবী থেকে, আকাশ থেকে, বা অন্তরিক্ষ থেকে ॥ ১০ ॥

মরুৎ শব্দটি মৃ ধাতু থেকে উৎপন্ন, তার অর্থ আঘাৎ করা বা হনন

করা। তাই মরুৎগণের অর্থ আঘাতকারী বা বিধ্বংসী ঝড় বায়ু। লাটিনে এই ধাতু থেকেই যুদ্ধের দেবতা Mars হয়েছে।

এই সূক্তেরই পঞ্চম ঋকে একটি উপাখ্যান সংক্ষেপে বলা হয়েছে। পণি নামের অসুরেরা দেবলোক থেকে গাভী অপহরণ করে অন্ধকারে লুকিয়ে রেখেছিল। মরুৎগণের সাথে ইন্দ্র তাদের উদ্ধার করেছিলেন। সরমা নামে এক কুকুর অসুরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে এই গাভীর সন্ধান পেয়েছিল। সায়নের এই অর্থ বিদেশী পণ্ডিতরা মানেন না। তাঁরা মনে করেন যে এই উপাখ্যানটি প্রাতঃকালের বর্ণনা। সরমা উষারই নাম। দেবতাদের গাভী অর্থাৎ সূর্যের রশ্মি অন্ধকারে আবৃত হয়েছিল, উষা তাদের সন্ধান আনলেন। তারপর আলোর দেবতা ইন্দ্র প্রকাশিত হয়ে অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ করে গাভী অর্থাৎ সূর্যরশ্মি উদ্ধার করলেন। লক্ষ্য করতে হবে যে ইন্দ্র এখানে সূর্যরূপী অর্থাৎ সূর্যই ইন্দ্র। অনেকে মনে করেন যে এই বৈদিক উপাখ্যান নিয়েই গ্রীক কবি হোমর তাঁর মহাকাব্যে ট্রয়ের যুদ্ধের কথা লিখেছেন।

দশম মন্ডলের ৭৮ সূক্তে স্যুম রশ্মি ঋষির স্তবে মরুদ্‌গণের রূপ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। —

অগ্নির মতো তাঁদের দীপ্তি,
বক্ষে যেন স্বর্ণালঙ্কারের শোভা,
বায়ুর মতো সজ্জিত হয়ে গমন করেন তৎক্ষণাৎ,
প্রধান হন অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতো,
কার্য করেন উত্তম নেতার,
সুন্দর সুখ বিধান করেন সোমরসের মতো,
যজ্ঞেও যান ॥ ২ ॥
তাঁরা যেতে যেতে কম্পিত করে যান বায়ুর মতো,
হন অগ্নি জিহ্বার মতো চাকচিক্যময়,
কবচধারী যোদ্ধার মতো করেন বীরত্ব,
আর পিতৃলোকের স্তরের মতো দান করেন সুফল ॥১০।৭৮।৩॥

এই রকমের বর্ণনা দেখে বুঝতে কোনই অসুবিধা হয় না যে ঋষিরা এক প্রাকৃতিক শক্তিরই বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে। মরুদ্‌গণও বায়ু। যে বায়ুর গর্জনে দ্যাবা পৃথিবী কম্পিত হয়, বৃক্ষ হয় উৎপাটিত, জলবর্ষী মেঘ বিদীর্ণ হয়ে জলধারা বর্ষিত হয়, বায়ুর সেই রূপই মরুৎ।

যাস্কের মতে অন্তরিক্ষে শ্বসমান বায়ু মাতরিশ্বা। ঋগ্বেদে অবশ্য মাতরিশ্বা অগ্নিরই এক নাম, এই মাতরিশ্বা অন্তরিক্ষ লোক থেকে অগ্নিকে এনেছিলেন পৃথিবীতে। কিন্তু অগ্নি প্রসূত হলেই বায়ুর

উৎপত্তি হয়। তাই পরবর্তীকালে যজুর্বেদে ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে মাতরিশ্বা বায়ু দেবতায় পরিণত হয়েছেন। ঋষিরা দাবাগ্নির ভীষণ রূপ দেখেই অগ্নির সঙ্গে মাতরিশ্বার সম্বন্ধ কল্পনা করেছেন।

মাতরিশ্বা ও অগ্নি যেমন অভিন্ন, তেমনি অগ্নি ও রুদ্রও অভিন্ন বলে মনে হয়। অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি প্রথম মণ্ডলের ২৭ সূক্তে অগ্নির স্তব করবার সময় বলছেন—

হে অগ্নি, তুমি জাগরিত হও স্তুতি দ্বারা,
যজ্ঞে প্রবেশ কর যজমানকে অনুগ্রহ করতে।
তুমি রুদ্র, সুন্দর স্তোত্রে স্তুতি করছি তোমাকে ॥ ১।২৭।১০ ॥

যাস্ক ও সায়ন দুজনেই এক মত যে রুদ্র শব্দের অর্থ অগ্নি। ৩৯ সূক্তের চতুর্থ ঋকে রুদ্রকে মরুদ্‌গণের পিতা বলা হয়েছে। রুদ্‌ ধাতুর একটি অর্থ শব্দ বা গর্জন করা, রোদন করাও এক অর্থ। রুদ্রকে তাই অগ্নিরূপী শব্দায়মান দেবতা মনে করা হয়। রুদ্রের আদিম অর্থ যে বজ্র বা বজ্রধারী মেঘ, তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে।

ঋগ্বেদে রুদ্রের তিনটি মাত্র স্বতন্ত্র সূক্ত আছে। তার মধ্যে দ্বিতীয় মণ্ডলের ৩৩ সূক্তই প্রধান। গৃৎসমদ ঋষি ত্রিষ্টুপ ছন্দে রুদ্র দেবতার স্তব করছেন—

হে মরুদ্‌গণের পিতা, আমাদের কাছে আসুক তোমার দেওয়া সুখ
তুমি আমাদের পৃথক কোরো না সূর্যের দর্শন থেকে,
শত্রুদের অভিভূত করুক আমাদের বীর পুত্রেরা,
হে রুদ্র, আমরা যেন পুত্রে পৌত্রে অনেক হয়ে উঠি ॥ ১ ॥
হে রুদ্র, আমরা যেন শতবর্ষ বাঁচি তোমার দেওয়া ওষধি খেয়ে,
তুমি বিনাশ কর আমাদের শত্রুদের,
একেবারে বিদূরিত কর আমার পাপ,
বিদূরিত কর সারা শরীরের ব্যাধিপুঞ্জকে ॥ ২ ॥
হে রুদ্র, তুমি সবার শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যে।
হে বজ্রবাহু, তুমি অতিশয় প্রবৃদ্ধ প্রবৃদ্ধদের মধ্যে,
পাপের পরপারে আমাদের নিয়ে যাও তুমি,
পাপ যেন নিকটে না আসে আমাদের ॥ ৩ ॥
হে অভীষ্টবর্ষী রুদ্র, আমরা যেন ক্রুদ্ধ না করি তোমাকে,
অন্যায় স্তুতি বা নমস্কারে,
কিংবা বিসদৃশ দেবতাদের সঙ্গে ডেকে।
ওষধি দিয়ে পরিপুষ্ট কর আমাদের পুত্রদের।
শুনেছি, সর্বশ্রেষ্ঠ তুমি ভিষকদের মধ্যে ॥ ৪ ॥

যে রুদ্র আহূত হন হব্য সম্বলিত আহ্বানে,
আমি স্তোত্রে অপগত করব তাঁর ক্রোধ।
বভ্রুবর্ণ কোমলোদর সুনাসিক শোভন রুদ্র
আমাদের যেন মনে না করেন জিঘাংসার পাত্র ॥ ৫ ॥
আমি প্রার্থনা করছি, মরুৎ বিশিষ্ট রুদ্র
দীপ্ত অন্নে তৃপ্ত করুন আমাকে।
রৌদ্রতপ্ত মানুষের কাছে ছায়ার মতো পাপ শূন্য হয়ে
আমরা পরিচর্যা করব রুদ্রের ও লাভ করব সুখ ॥ ৬ ॥
হে রুদ্র, কোথায় তোমার সেই সুখপ্রদ হাত,
যে হাতে ভেষজ তৈরি করে তুমি সুখী কর সবাইকে ?
হে অভীষ্টবর্ষী রুদ্র, শীঘ্রই আমাকে ক্ষমা কর
দৈব পাপের বিনাশক হয়ে ॥ ৭ ॥
আমি উচ্চারণ করি অতি মহৎ স্তুতি
বভ্রুবর্ণ শ্বেত আভাযুক্ত রুদ্রের উদ্দেশে,
হে স্তোতা, নমস্কার দ্বারা পূজা কর তেজোবিশিষ্ট রুদ্রের,
আমরা সংকীর্তন করি তাঁর উজ্জ্বল নাম ॥ ৮ ॥
দীপ্ত হিরণ্ময় অলংকারে হচ্ছেন শোভিত
দৃঢ়াঙ্গ বহু রূপ উগ্র রুদ্র
সমস্ত ভুবনের অধিপতি ও ভর্তা তিনি,
পৃথকক্বত হয় না তাঁর বল ॥ ৯ ॥
তুমি ধনুর্বাণধারী হে অর্চনার্হ,
পূজনীয় নিষ্ক ধারণ করেছ তুমি নানা রূপে,
রক্ষা করছ এই বিস্তীর্ণ জগৎকে।
আর কেউ নেই তোমার চেয়ে বলবান ॥ ১০ ॥
হে স্তোতা, স্তব কর উগ্র রুদ্রের,
তিনি রথস্থ যুবা, শত্রু বিনাশক ও পশুর মতো ভয়ঙ্কর।
হে রুদ্র, এই স্তবে সুখী কর আমাদের,
শত্রুকে বিনাশ করুক তোমার সেনা ॥ ১১ ॥
পুত্র যেমন পিতাকে নমস্কার করে আশীর্বাদ পেয়ে,
হে রুদ্র, আমরা তেমনি করেই করছি নমস্কার।
হে রুদ্র, তুমি বহু ধনদাতা ও সাধুর পালক,
আমাদের ঔষধ দাও তোমার স্তব করলে ॥ ১২ ॥
হে মরুৎগণ, যে নির্মল ঔষধ আছে তোমাদের,
যে ঔষধ তোমাদের সুখকর ও সুখপ্রদ,

যে ঔষধ মনোনীত করেছিলেন আমাদের পিতা মনু,
হে অভীষ্টবর্ষীগণ, আমরা চাইছি সেই ভয়হারী ঔষধ ॥ ১৩ ॥
রুদ্রের হেতি আমাদের পরিত্যাগ করে যাক,
ত্যাগ করে যাক দীপ্ত রুদ্রের দুর্মতিও,
হে রুদ্র, তোমার ধনুর জ্যা শিথিল কর যজমানের প্রতি,
সুখী কর আমাদের পুত্র ও পৌত্রদের ॥ ১৪ ॥
হে দীপ্তিমান সর্বজ্ঞ ও আহ্বান শ্রবণকারী রুদ্র,
এখানে তুমি এই আশ্বাস দাও আমাদের—
ক্রুদ্ধ হবে না, বিনাশ করবে না কাউকে।
পুত্র পৌত্র নিয়ে আমরা তোমার স্তুতি করব যজ্ঞে ॥ ২।৩৩।১৫ ॥

গৃৎসমদ ঋষির এই সূক্তে রুদ্রের নানা রূপের কথা আছে। তিনি বহুরূপ, উগ্র, শত্রু বিনাশক ও পশুর মতো ভয়ঙ্কর। আবার তাঁরই দেওয়া ঔষধি খেয়ে আমরা শতবর্ষ বাঁচতে পারি, সারা শরীরের ব্যাধি পুঞ্জকে তিনি দূর করতে পারেন। তাই যে হাতে তিনি ভেষজ তৈরি করেন, সেই হাতে দৈব পাপের বিনাশ চাইছেন। রুদ্র যেন ক্রুদ্ধ হয়ে কাউকে বিনাশ না করেন, এই তাঁর প্রার্থনা। এই স্তব কি সংহার মূর্তি শিবের নয়? পশুপতি শিব ভয়ঙ্কর, বৈদ্যনাথ শিব আরোগ্যের দেবতা, আশুতোষ শিবই ভক্তের আহ্বান শোনেন। তাই রুদ্র দেবতাই যে পরবর্তীকালের শিব, তাতে সংশয় হওয়া উচিত নয়।

পণ্ডিতেরা মনে করেন যে ঋগ্বেদের এই রুদ্র থেকেই পুরাণে শিবের কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু এই মত মেনে নেবার অন্তরায় আছে। রুদ্র যদি অগ্নি হন বা তার আদিম অর্থ হয় বজ্র বা বজ্রধারী মেঘ, তাহলে বেদের ঋষি তাঁকে বৈদ্য বলবেন কেন? ভেষজ তৈরি বা ব্যাধি দূর করার জন্য কি কেউ বজ্র বা বজ্রধারী মেঘের নিকটে প্রার্থনা করে? এর উল্টোটাই বরং সম্ভব। বেদের ঋষি শিবকে জানেন রুদ্র দেবতা বলে, তাঁর ভেষজ তৈরি করে ব্যাধি দূর করার কথাও জানেন এবং তিনি যে সংহার মূর্তি এই কথা শুনেছেন ও বিশ্বাস করেছেন বলেই বজ্র বা বজ্রধারী মেঘে এবং অগ্নির সংহার মূর্তিতে ঋষিরা রুদ্রের কল্পনা করেছেন। শিব বা রুদ্র ছিলেন পুরাকালের দেবতা। বেদের ঋষি তাঁর কথা জানেন বলেই প্রকৃতির সংহার মূর্তিতে তাঁরই রূপ দেখেছেন। অন্য কথা ভাবলে তা ঠিক হবে না বলেই আমি মনে করি।

স্বর্গের দেবতা

দ্যুলোক বলতে আমরা স্বর্গ বুঝি। দ্যুলোকের দেবতা মানে স্বর্গের দেবতা। দৌ বা দৌস্পিতা এবং পৃথিবী বিশ্বের পিতামাতা। এঁরা উভয়ে এক সঙ্গে দ্যাবা-পৃথিবী রূপে অভিহিত হয়েছেন। দ্যাবা-পৃথিবী মানে স্বর্গ ও পৃথিবী। প্রথম মণ্ডলের ১৫৯ সূক্তে দীর্ঘতমা ঋষি বলছেন—

আহ্বান মন্ত্রে আমি জেনেছি
দ্রোহ-রহিত পিতা দ্যুলোকের উদার ও সদয় মন।
মাতা পৃথিবীর মনও জেনেছি।
আপন সামর্থে সন্তানদের রক্ষা করুন পিতামাতা দ্যাবাপৃথিবী
প্রদান করুন প্রভূত ও বিস্তীর্ণ অমৃত ॥ ২ ॥

নানা দেশের পুরাতত্ত্বে আমরা আকাশ অথবা স্বর্গ ও পৃথিবীকে পিতামাতা রূপে দেখতে পাই। এঁদের মিলন না হলে প্রাণী সৃষ্টি বুঝি নষ্ট হয়ে যেত।

মিত্র ও বরুণ এই স্বর্গেরই দুই যুগ্ম দেবতা। প্রথম মণ্ডলের ২ সূক্তে মধুছন্দা ঋষি বলছেন—

আমি আহ্বান করি পবিত্র বল মিত্র
ও হিংসা পরায়ণ-শত্রু নাশক বরুণকে,
তাঁরা সাধন করেন ঘৃতাহুতি প্রদান কর্ম ॥ ৭ ॥

মিত্র ছিলেন প্রাচীন আর্যদের একজন উপাস্য দেবতা। তাই হিন্দু ও ইরাণীয় উভয় শাখার আর্যদের মধ্যে তাঁর উপাসনা আছে। ইরাণীয়রা তাঁকে মিথ্র অর্থাৎ আলোক বা সূর্য বলে এবং হিন্দুরা মিত্র অর্থাৎ আলোক বা দিবা বলে পূজা করতেন। বরুণ হল বৃ ধাতু থেকে উৎপন্ন শব্দ আবরণকারী নৈশ আকাশ। হিন্দুদের বরুণ ইরাণীয়দের বরণ ও গ্রীকদের Uranos। আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত হয় বলে আকাশ জলীয় এই বিশ্বাস থেকেই কালক্রমে বরুণ জলের দেবতায় পরিণত হয়েছেন।

তৃতীয় মণ্ডলের ৫৯ সূক্তে বিশ্বামিত্র ঋষি মিত্রের স্তব করছেন—

স্তুত হয়ে মিত্র কাজে প্রবর্তিত করছেন সকল লোককে।
তিনি ধারণ করে আছেন পৃথিবী ও দ্যুলোক,
সকলের দিকে চেয়ে আছেন অনিমেষ নেত্রে।
ঘৃতযুক্ত হব্য প্রদান কর মিত্রের উদ্দেশে ॥ ১ ॥

হে আদিত্য মিত্র, যে মানুষ তোমাকে হব্য দান করে ব্রতানুসারে,
অন্নবান হোক সে। তুমি যাকে রক্ষা কর,
কেউ তাকে পারে না বিনাশ বা অভিভব করতে।
পাপও পারে না স্পর্শ করতে নিকট বা দূর থেকে ॥ ২ ॥
আমরা রোগ বর্জিত ও হৃষ্ট হয়েছি অন্ন লাভে,
অবস্থান করছি সর্বত্রগামী আদিত্যের ব্রতের নিকট
পৃথিবীর বিস্তীর্ণ প্রদেশে জানু পেতে।
আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন মিত্র ॥ ৩ ॥
প্রাদুর্ভূত হয়েছেন এই মিত্র,
ইনি সুন্দর মুখ বিশিষ্ট নমস্কারের যোগ্য রাজা,
অত্যন্ত বলশালী বিধাতা সকলের, যজ্ঞার্হ,
আমরা যেন লাভ করি তাঁর অনুগ্রহ ও কল্যাণকর বাৎসল্য ॥৪॥
আদিত্য মহান, প্রবর্তক সকল লোকের,
তাঁর উপাসনা করা উচিত নমস্কারের দ্বারা।
তিনি প্রসন্ন মুখ স্তুতিকারীর প্রতি।
অগ্নিতে অর্পণ কর এই মিত্রের প্রীতিকর হব্য ॥ ৫ ॥
মিত্র দেব মানুষের পালক,
কীর্তিযুক্ত তাঁর অন্ন ও ভজনীয় ধন ॥ ৬ ॥
যিনি দ্যুলোক অভিভূত করেছেন নিজের মহিমায়,
কীর্তিমান হয়ে তিনিই প্রচুর অন্ন দিচ্ছেন পৃথিবীকে ॥ ৭ ॥
পঞ্চজন শত্রুজয়ক্ষম সবল মিত্রের উদ্দেশে প্রদান করেছেন হব্য,
তিনিই ধারণ করেছেন সমস্ত দেবতাকে ॥ ৮ ॥
দেবতা ও মানুষের মধ্যে যে করেছে কুশচ্ছেদ,
মিত্র তাকে অন্ন প্রদান করেন কল্যাণকর ॥ ৩৷৫৯৷৯ ॥

পঞ্চম মণ্ডলের ৬২ সূক্তে আমরা একসঙ্গে মিত্র ও বরুণকে পাই। অত্রির অপত্য শ্রুতবিদ ঋষি ত্রিষ্টুপ ছন্দে বলছেন—

আমি দর্শন করেছি ধ্রুব ও ঋত সূর্য মণ্ডল,
ঋতে আচ্ছাদিত তোমাদের আবাস।
উপাসকরা স্তোত্র দিয়ে বিমুক্ত করছেন সে স্থানের অশ্বদের,
সেখানে সমবেত আছে সহস্র রশ্মি।
আমি দেখেছি দেবতাদের মূর্তির মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ মূর্তি ॥ ১॥
হে মিত্র ও বরুণ, অতি প্রশস্ত তোমাদের এই মাহাত্ম্য,
যা দিয়ে নিরন্তর ভ্রমণকারী সূর্য দোহন করছেন
বদ্ধ জলরাশি তাঁর দৈনিক গতির সাহায্যে।

তোমরা স্বয়ং ভ্রমণ করে বর্ধিত করছ
সূর্যের প্রীতিদায়ক দীপ্তি।
নিরন্তর পরিভ্রমণ করছে তোমাদের একমাত্র রথ ॥ ২ ॥
হে মিত্র ও বরুণ, তোমাদের অনুগ্রহে রাজা হয় স্তোতারা,
নিজের সামর্থ্যে তোমরা ধারণ করে আছ পৃথিবী ও স্বর্গকে।
হে ক্ষিপ্রদানকারী, বর্ষণ কর বৃষ্টি,
বর্ধন কর ওষধি ও ধেনু ॥ ৩ ॥
হে মিত্র ও বরুণ, তোমাদের রথের অশ্ব বহন করুক তোমাদের,
অবতরণ করুক রশ্মিকে সুসংযত করে।
জলের ধারা তোমাদের অনুসরণ করছে মূর্তি ধারণ করে,
তোমাদেরই অনুগ্রহে প্রবাহিত হচ্ছে প্রাচীন নদীরা ॥ ৪ ॥
হে অন্নশালী বলশালী মিত্র ও বরুণ,
মন্ত্রে যজ্ঞ রক্ষার মতো পৃথিবীকে রক্ষা করে,
আর বর্ধিত করে শরীরের দীপ্তি,
তোমরা আরোহন কর যজ্ঞভূমির মধ্যস্থিত রথে ॥ ৫ ॥
হে মিত্র ও বরুণ, যজ্ঞভূমিতে তোমরা রক্ষা কর যে যজমানকে,
দানশীল হও সেই স্তুতিকারী যজমানের প্রতি।
কারণ তোমরা রাজা উভয়েই,
ধন ও সহস্র স্তম্ভের সৌধ ধারণ কর ক্রোধহীন হয়ে ॥ ৬ ॥
সুবর্ণে নির্মিত এঁদের রথ কীলকাদি হেমময়,
অন্তরিক্ষে এই রথ শোভা পায় বিদ্যুতের মতো।
আমরা যেন স্থাপন করতে পারি সোমরস
কল্যাণকর স্থানে অথবা যজ্ঞভূমিতে রথের উপরে ॥ ৭ ॥
হে মিত্র ও বরুণ, তোমরা আরোহণ কর সুবর্ণ রথে
প্রতিদিন প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের সময়ে।
সেখান থেকে অবলোকন কর অদিতি ও দিতিকে ॥ ৮ ॥
হে বিশ্বের রক্ষক দানশীল মিত্র ও বরুণ,
তোমরা দিতে পারো নিরতিশয় ও নিরবচ্ছিন্ন সুখ,
সেই ব্যাঘাতহীন সুখ দাও আমাদের,
আমরা যেন শত্রুজয়ী হই ও লাভ করি অভিলষিত ধন ॥৫।৬২।৯॥

এই সূক্তের অদিতি ও দিতি শব্দের নানা অর্থ করা হয়েছে। সায়ন বলেন যে অদিতি হলেন অখণ্ডনীয়া পৃথিবী এবং খণ্ডিতা প্রজাদি হল দিতি। দো ধাতু থেকে উৎপন্ন অদিতি শব্দের প্রকৃত অর্থ অখণ্ডিত অসীম অনন্ত বিশ্বজগৎ এবং আদিত্যরা অদিতির সন্তান। তাই দিতি

শব্দের প্রকৃত অর্থ সীমাবদ্ধ জগৎ। এই দুটি শব্দ ব্যবহার করে সূক্তের ঋষি বোধহয় অসীম ও সীমাবদ্ধ জগৎ বোঝাতে চেয়েছেন।

পণ্ডিতরা মনে করেন যে ঋগ্বেদে এই শব্দ দুটির ব্যবহার দেখেই পুরাণে অদিতিকে দেবতাদের ও দিতিকে দৈত্যদের মাতা রূপে কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু ঋগ্বেদের কোন স্থানে দৈত্য বা দানব শব্দের উল্লেখ নেই। এই রকম অনুমান করার পিছনে কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। তাঁরা ধরে নিয়েছেন যে পুরাণের কাহিনীগুলি কল্পিত এবং এই কল্পনা এসেছে ঋগ্বেদের উপমা থেকে। ঋগ্বেদের এই সব শব্দের ব্যবহার যে ইতিহাসের কথা থেকেও নেওয়া হয়ে থাকতে পারে, তা তাঁরা ভেবে দেখেন নি। পুরাণ রচনা যে ঋগ্বেদের অনেক পরবর্তী কালের, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেক ঘটনাই যে খুবই প্রাচীন কালের, এমন কি বৈদিক যুগের ও বহু আগের ঘটনা, তাতেও কোন সংশয় থাকা উচিত নয়। তাই ঋগ্বেদের ঋষিরা তাঁদের শোনা কথাগুলি উপমারূপে ব্যবহার করবেন, এটাই স্বাভাবিক।

মিত্র ও বরুণকে সূর্যের চক্ষুস্বরূপও বলা হয়েছে। সপ্তম মণ্ডলের ৬৩ সূক্তে বসিষ্ঠ ঋষি ত্রিষ্টুপ ছন্দে বলছেন—

উদিত হচ্ছেন দীপ্তিমান সূর্য।
তিনি সুভগ সর্বদর্শী, মানুষের সাধারণ,
মিত্র ও বরুণের চক্ষুস্বরূপ ॥ ৭।৬৩।১ ॥

এই সূক্তেরই শেষের দিকে আছে—

হে মিত্র ও বরুণ, সূর্য উদিত হলে
তোমার পরিচর্যা করব নমস্কার ও হব্য দিয়ে ॥ ৫ ॥
মিত্র বরুণ ও অর্যমা ধন দান করুন
আমাদের নিজের ও পুত্রদের জন্য।
সুগম ও সুপথ হোক আমাদের সবই।
সর্বদা আমাদের পালন কর স্বস্তি দিয়ে ॥ ৭।৬৩।৬ ॥

ঋগ্বেদে বরুণের স্তোত্র স্বতন্ত্র ভাবেও পাওয়া যায়। অজীগর্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি গায়ত্রী ছন্দে বরুণের স্তব করেছিলেন প্রথম মণ্ডলের ২৫ সূক্তে—

হে মেধাবী বরুণ, তুমি দীপ্তিমান
দ্যুলোকে, ভূলোকে ও সমস্ত জগতে,
তুমি উত্তর দাও ক্ষেমলাভের জন্য আমাদের প্রার্থনা শুনে ॥২০॥
আমাদের উপরের পাশ উপর দিয়ে খুলে দাও

খুলে দাও মধ্যের পাশ, নিচের পাশও দাও নামিয়ে।
আমরা যেন থাকি জীবিত ॥ ১৷২৫৷১১ ॥

পুরা কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি যে বলির জন্য পাশ বদ্ধ শুনঃশেপ বরুণের স্তব করে রক্ষা পেয়েছিলেন।

দ্বিতীয় মণ্ডলের ২৯ সূক্তে কূর্ম বা গৃৎসমদ ঋষিও বরুণের স্তব করছেন ত্রিষ্টুপ ছন্দে—

অদিতির পুত্র বরুণ জগতের ধারক,
তিনি জল সৃষ্টি করেছেন প্রকৃষ্ট রূপে।
নদী প্রবাহিত হয় তাঁরই মহিমায়,
বিশ্রাম করে না, নিবৃত্ত হয় না নদী।
ভূমিতে গমন করে পাখিদের মতো বেগে ॥ ২৷২৯৷৪ ॥

সপ্তম মণ্ডলের ৮৭ সূক্তে বসিষ্ঠ ঋষি ত্রিষ্টুপ ছন্দে বলছেন—

অপরাধ করলেও দয়া করেন বরুণ,
আমরা যেন সমৃদ্ধ করি অদীন বরুণের ব্রত,
অনপরাধী হই তাঁর নিকটে।
সর্বদা আমাদের পালন কর স্বস্তি দিয়ে ॥ ৭৷৮৭৷৭ ॥

পঞ্চম মণ্ডলে অত্রি ঋষিও ত্রিষ্টুপ ছন্দে বরুণের স্তব করছেন—

উচ্চারণ কর দীপ্তিশালী বরুণের প্রিয় সুমহৎ ও গভীর স্তোত্র,
পশুহন্তা যেমন বিস্তৃত করে নিহত পশুর চর্ম,
তেমনি করে তিনিও বিস্তারিত করেছেন অন্তরিক্ষকে
সূর্যের আস্তরণের জন্য ॥ ১ ॥
অন্তরিক্ষকে তিনি বিস্তারিত করেছেন বৃক্ষের উপরে,
অশ্বকে বল, ধেনুকে দুগ্ধ ও সংকল্প দিয়েছেন হৃদয়ে।
জলে অগ্নি, অন্তরিক্ষে সূর্য ও সোমলতা রেখেছেন পর্বতে ॥২॥
তিনি মেঘের নিম্নভাগ করেছেন সচ্ছিদ্র
স্বর্গ পৃথিবী ও অন্তরিক্ষের হিতার্থে।
বৃষ্টি যেমন সিক্ত করে যব ও শস্য,
তেমনি ভূমিকে আর্দ্র করেন ভুবনের অধিপতি বরুণ ॥ ৩ ॥
যখন তিনি কামনা করেন বৃষ্টি রূপ দুগ্ধ,
তখনই আর্দ্র করেন পৃথিবী অন্তরিক্ষ ও স্বর্গ।
পরক্ষণেই বারিদে আবৃত হয় পর্বতের শিখর,
বলের উল্লাসে বীর মরুৎগণ শিথিল করেন মেঘ।
আমি ঘোষণা করছি আসুর বরুণের সুমহতী প্রজ্ঞা,
তিনি অন্তরিক্ষ মেপেছেন সূর্যকে মানদণ্ড করে ॥ ৫ ॥

কেউ খণ্ডন করতে পারে না প্রকৃষ্ট জ্ঞানী বরুণের প্রজ্ঞা,
বারি দিয়ে একমাত্র সমুদ্রকে পূরণ করতে পারে না
তাঁর প্রজ্ঞায় শুভ্র বারি মোক্ষনকারী নদী সমূহ ॥ ৬ ॥
হে বরুণ, আমরা যদি কখনও করে থাকি কোন অপরাধ
দাতা মিত্র বয়স্য ভ্রাতা প্রতিবেশী বা মূকের নিকটে,
তবে নষ্ট কর সেই অপরাধ ।। ৭ ॥
হে দেবতা বরুণ, যদি আমরা অপরাধ করি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে
দ্যূতক্রীড়ায় বঞ্চনাকারী পাশা ক্রীড়কের মতো,
তবে তুমি শিথিল বন্ধনের মতো মুক্ত কর তা থেকে।
তাহলেই আমরা হব তোমার স্নেহভাজন ॥ ৮ ॥

এই সূক্তে আমরা ঋষির হৃদয়ে এক ঈশ্বরের ভাবনা দেখতে পাই। এক দেবতা যেন সূর্যকে দিয়ে অন্তরিক্ষের পরিমান নেন, নদীকে প্রেরণ করেন মহাসমুদ্রে। অথচ সেই সমুদ্র কখনও পূর্ণ হয় না এবং তিনিই মানুষের পাপ নষ্ট করেন ও খণ্ডন করেন অপরাধ। দৈব কাজের পরম্পরা দেখে বরুণকেই ঈশ্বর মনে হয়।

এই মিত্র ও বরুণ কোন্ দেবতা তা নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা হয়েছে। কখনও একাকী কখনও বা যুগ্মভাবে তাঁরা স্তুত হয়েছেন। তাঁদের সাহচর্য বড় বিচিত্র বলে মনে হয়। অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো একজন যেন আর এক জনকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। মিত্রকে কোথাও দিবা ও বরুণকে রাত্রির অধিপতি বলা হয়েছে। কোথাও বা মিত্রকে সূর্যেরই রূপান্তর বলা হয়েছে এবং বরুণ হলেন অস্তগামী সূর্য। বরুণই রাত্রির জনক। শতপথ ব্রাহ্মণে পৃথিবীকে মিত্র ও স্বর্গকে বরুণ বলা হয়েছে। অর্থাৎ দ্যাবা পৃথিবী ও মিত্রাবরুণ অভিন্ন।

পরবর্তী কালে দেখা গেছে যে যজ্ঞে মিত্রের উদ্দেশে শাদা ও বরুণের উদ্দেশে কালো প্রাণী বলি দেবার বিধান হয়েছে। তাঁরা যেন দিবা ও রাত্রির দেবতা। একজন বিদেশী পণ্ডিত বলেছেন যে বরুণ চন্দ্রেরই নামান্তর। পৌরাণিক যুগে তিনি জলের দেবতায় পরিণত হয়েছেন। মিত্রকে সূর্য বলেই মনে হয়। ঋগ্বেদের নানা স্থানে বলা হয়েছে যে মিত্র মানুষকে ডেকে তাদের নিজ নিজ কাজে প্রবর্তিত করেন। মিত্র ও বরুণের আজ্ঞাতেই বিস্তীর্ণ দ্যুলোক আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাঁরাই মেঘ থেকে বৃষ্টিকে মুক্ত করে দেন। দ্যুলোক থেকেই তাঁরা মানুষের সব কাজ নিরীক্ষণ করেন। মেঘমুক্ত বৃষ্টি ধারায়, নদীর গর্ভ পূরণ করেন বলেই বোধহয় বরুণকে সিন্ধুপতি বলা হয়েছে এবং আকাশের মেঘকে বলা হয়েছে অদৃশ্য সমুদ্র। ঋষিরা বোধহয় লক্ষ্য করেছিলেন যে চন্দ্রের

সঙ্গেই জলের সম্বন্ধ বেশি। তাই সায়নও স্বীকার করেছেন যে বরুণ জলাভিমানী দেবতা।

এর পর সূর্যের কথা। দশম মণ্ডলের ৩৭ সূক্তে অভিতপা ঋষি বলছেন—

হে পুরোহিতগণ, যে সূর্য দেখতে পান মিত্র ও বরুণকে,
যে দীপ্তিমান সকল বস্তুই দেখেন দূর থেকে,
দেবতাদের বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন যিনি,
যিনি আকাশের পুত্র স্বরূপ ও পরিস্কার করেন সব কিছু,
সেই সূর্যকে নমস্কার কর, পূজা কর, স্তব কর তাঁর ॥ ১ ॥
আকাশ ও দিবাকে অবলম্বন করে বর্তমান আছে সত্য উক্তি।
বিশ্বভুবন ও প্রাণীবর্গ যাঁর আশ্রিত,
যাঁর প্রভাবে প্রতি দিন প্রবাহিত হচ্ছে জল ও উদয় হচ্ছে সূর্যের
সেই সত্য যেন সকল বিষয়ে রক্ষা করে আমাকে ॥ ১০।৩৭।২ ॥

প্রথম মণ্ডলের ৫০ সূক্তে কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি অনুষ্টুপ ছন্দে সূর্যের স্তব করছেন—

সূর্য দীপ্তিমান, তিনি জানেন সমস্ত প্রাণীদের।
অশ্বরা তাঁকে ঊর্ধ্বে বহন করছে সমস্ত জগৎ দর্শনের জন্য ॥১॥
যখন আসেন জগতের প্রকাশক সূর্য,
নক্ষত্ররা তখন রাতের সঙ্গে পালিয়ে যায় চোরের মতো ॥ ২ ॥
দীপ্যমান অগ্নির মতো সূর্যের প্রজ্ঞাপক রশ্মি
এক এক করে দেখছে সকল লোককে ॥ ৩ ॥
হে সূর্য, তুমি ভ্রমণ কর মহৎ পথে,
সকল প্রাণীর তুমি দর্শনীয়,
তুমি জ্যোতির কারণ,
দীপ্যমান অন্তরিক্ষে তুমি বিকাশ করছ প্রভা ॥ ৪ ॥
তুমি উদয় হও দেবতাদের সম্মুখে,
মানুষদেরও সম্মুখে।
তুমি উদয় হও স্বর্গলোকের সৃষ্টির জন্য ॥ ৫ ॥
হে শোধনকারী অনিষ্টের নিবারক,
যে আলো দিয়ে তুমি জগৎকে দেখো
প্রাণীদের পোষণকারীরূপে,
সে আলো দিনকে উৎপন্ন করে রাতের সাথে,
আর অবলোকন করে প্রাণীদের।
তুমি ভ্রমণ কর বিস্তীর্ণ দিব্যলোকে ॥ ৬-৭ ॥

হে সর্ব প্রকাশক দীপ্তিমান সূর্য,
তোমাকে বহন করে হরিৎ নামে সপ্ত অশ্বের রথ।
জ্যোতিই তোমার কেশ ॥ ৮ ॥
রথ বাহক সাতটি অশ্বীকে যোজিত করলেন সূর্য,
তিনি গমন করছেন স্বয়ং যোজিত অশ্বীদ্বারা ॥ ৯ ॥
আমরা দেখি অন্ধকারের উপরে উত্থিত জ্যোতি,
তাই দেখেই যাই দেবতাদের মধ্যে দ্যুতিমান সূর্যের নিকটে।
তিনিই উৎকৃষ্ট জ্যোতি ॥ ১০ ॥
হে অনুকূল দীপ্তিমান সূর্য,
উদয় হয়ে উন্নত আকাশে কর আরোহণ,
তারপর নাশ কর আমার হরিমাণ ও হৃদ্‌রোগ ॥ ১১ ॥
আমরা এই হরিমাণ রোগ স্থাপন করি শুক ও শারিকায়,
স্থাপন করি আমাদের হরিমাণ হরিদ্রায় ॥ ১২ ॥
এই আদিত্য উদিত হয়েছেন সমস্ত তেজের সাথে,
বিনাশ করেছেন আমার অনিষ্টকারী রোগ।
আমি বিনাশ করি না সেই অনিষ্টকারীকে ॥ ১।৫০।১৩ ॥

সূর্যের রশ্মিকেই যে অশ্বের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, তাতে সংশয় নেই। সাতটি অশ্ব হল সূর্যের আলোয় সাত রঙের রশ্মি। এই আলোয় রোগ আরোগ্য হয়। জানা যায় যে প্রস্কণ্ব ঋষির এই স্তবে তুষ্ট হয়ে সূর্য তার শ্বেতী রোগ ভাল করে দিয়েছিলেন।

অঙ্গিরার পুত্র কুৎস প্রথম মণ্ডলের ১১৫ সূক্তে ত্রিষ্টুপ ছন্দে বলছেন—

বিচিত্র তেজপুঞ্জরূপ সূর্য উদয় হয়েছেন,
চক্ষু স্বরূপ তিনি মিত্র বরুণ ও অগ্নির,
নিজের কিরণে পূর্ণ করেছেন স্বর্গ পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ।
আত্মা স্বরূপ তিনি স্থাবর ও জঙ্গমের ॥ ১ ॥
পুরুষ যেমন নারীর পিছনে ধায়,
সূর্যও তেমনি ঊষার পিছনে আসছেন।
এই সময়ে দেবতাকাঙ্ক্ষী মানুষ বিস্তার করেন
বহু যুগ প্রচলিত যজ্ঞ,
সুফলের জন্য সম্পন্ন করেন কল্যাণ কর্ম ॥ ১।১১৫।২ ॥

সূর্যের ঊষাকে অনুসরণ গ্রীকদের Apollo Daphne-র কাহিনীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

ঋগ্বেদে সূর্যের অনেকগুলি নাম পাওয়া যায়। পঞ্চম মণ্ডলের ৮১ সূক্তে অত্রির অপত্য শ্যাবাশ্ব ঋষি জগতী ছন্দে বলছেন—

জ্ঞানী ঋত্বিকেরা করছেন মনোনিবেশ,
সবিতার আজ্ঞায় অভিনিষ্ট হচ্ছেন যজ্ঞে।
তিনি হোতৃবর্গকে প্রেরণ করছেন তাদের কাজে,
স্তুতির অগোচর এই দেবতা সবিতার মহিমা ॥ ১ ॥
স্বয়ং বিশ্বরূপ ধারণ করেন জ্ঞানী সবিতা,
কল্যাণ বিধান করেন দ্বিপদ ও চতুষ্পদের।
সুপ্রকাশ করেছেন স্বর্গকে, উদিত হয়েছেন উষার পশ্চাতে ॥২॥
অন্যান্য দেবতারা মহিমা ও শক্তি লাভ করেন
দীপ্তিমান সবিতার গতির পিছনে।
তিনি পৃথিবীর পরিমাণ করেন নিজেরই মাহাত্ম্যে।
সেই দেবতা সবিতা বিরাজ করছেন দীপ্তি সহকারে ॥ ৩ ॥
হে সবিতা, তুমি পরিভ্রমণ কর তিন দীপ্ত ভুবন,
অথবা সঙ্গত হও সূর্যের রশ্মি দ্বারা।
অথবা তুমি যাও উভয় পার্শ্বের রাত্রির মধ্য দিয়ে।
হে দেবতা. তুমি মিত্র হও তোমার কার্য দিয়ে ॥ ৪ ॥
হে দেবতা, তুমি শাসন কর সমস্ত জীবের কার্য।
তুমি পূষা হও গতির দ্বারা।
সমগ্র ভুবন ধারণে তুমি সমর্থ,
তোমার স্তুতি ঘোষণা করছে শ্যাবাশ্ব ॥ ৫।৮১।৫ ॥

এই সূক্তে আমরা সবিতা সূর্য পূষা ও মিত্র এই চারটি নামই পাচ্ছি। সায়ন বলেন যে উদয়ের পূর্বে যে মূর্তি তাই সবিতা, উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত যে মূর্তি তা সূর্য। যাস্ক বলেছেন যে পূষাও সূর্য। মেষ পালকরা যে সূর্য দেখে তারই নাম পূষা, অনেক সময়ই মেঘের অন্তরাল থেকে সূর্য বেরিয়ে আসে। এইজন্য পূষাকে মেঘপুত্র বলা হয়েছে। মেষপালকেরা সেকালে তৃণের অন্বেষণে নানা স্থানে ভ্রমণ করে বেড়াত বলে পূষাকে তাদের রক্ষক ও ভ্রমণে পথ প্রদর্শক বলত।

সবিতা হিরণ্যপাণি। মেধাতিথি ঋষি প্রথম মণ্ডলের ২২ সূক্তে গায়ত্রী ছন্দে বলছেন—

রক্ষণের জন্য আমি আহ্বান করি হিরণ্যপাণি সবিতাকে,
সেই দেবতাই জানিয়ে দেবেন যজমানের প্রাপ্য পদ। ॥১।২২।৫॥

সূর্য যে আদিম আর্য জাতির উপাস্য দেবতা ছিলেন তা সবাই অসংশয়ে মেনে নিয়েছেন। আর্য জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখায় সূর্যের উপাসনা দেখতে পাওয়া যায়। গ্রীকদের Helios সূর্য শব্দেরই রূপান্তর বলে মনে করা হয়। লাটিনরা বলত Sol ও টিউটনরা Tyr। প্রাচীন

ইরানীয়রা যাঁকে খোর সেদ বলত, তিনিই সূর্য। সূর্য বা সবিতার বাহু যে হিরণ্য বা সোনার, এ হল কবির কল্পনা। সোনার রঙের রশ্মি দেখেই কবিরা তাঁকে হিরণ্যপাণি বলেছেন। সূর্যোদয়ের পূর্বে সবিতারই হিরণ্যপাণি, সূর্যের নয়। এই নিয়ে একটি কাহিনী রচিত হয়েছে। কোন যজ্ঞে সবিতা নাকি অন্যায় ভাবে হব্য গ্রহণ করেছিলেন, সেই পাপে তাঁর হস্ত ছিন্ন হয়ে যায়। ঋত্বিকরা তখন তাঁকে সোনার বাহু গড়িয়ে দেন। তাই সবিতার বাহু সব সময়েই সোনার। তিনি হিরণ্যপাণি। জার্মানরাও এই রকমের একটি কাহিনী রচনা করেছিল। তাদের Tyr ছিলেন মৃগয়াপ্রিয়। একবার তিনি একটা বাঘের মুখে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। বাঘ সেই হাতটি ছিঁড়ে নেয় বলে তাঁরও সোনার হাত।

ঘোরপুত্র কণ্ব ঋষি গায়ত্রী ছন্দে পূষার স্তব করেছেন প্রথম মণ্ডলের ৪২ সূক্তে—

হে, পূষা, পার করিয়ে দাও পথ, বিনাশ কর পাপ।
হে মেঘ পুত্র. দেবতা আমার,
আগে আগে চল আমাদের। ১॥
হে পূষা, আঘাতকারী অপহরণকারী ও দুষ্টাচারী
যে কেউ দেখায় আমাদের ভুল পথ,
তাকে দূর করে দাও পথ থেকে॥ ২॥
পথ থেকে দূরে তাড়িয়ে দাও
সেই মার্গ প্রতিবন্ধক তস্কর কুটিলাচারীকে॥ ৩॥
যে কেউ হরণ করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়কে,
ইচ্ছা করে অনিষ্ট সাধন করতে,
হে পূষা, দলিত কর তোমার পায়ে
তার পর-সন্তাপক দেহ॥ ৪॥
হে শত্রু বিনাশী জ্ঞানবান পূষা,
যে রক্ষণা দিয়ে তুমি উৎসাহিত করেছিলে পিতৃগণকে,
আমি প্রার্থনা করছি তোমার সেই রক্ষণা॥ ৫॥
হে সর্বধন সম্পন্ন সুবর্ণায়ুধযুক্ত পূষা,
অনন্তর তুমি দানে পরিণত কর তোমার ধন॥ ৬॥
আমাদের নিয়ে যাও বিঘ্নকারী শত্রু অতিক্রম করে,
নিয়ে যাও সুখগম্য শোভনীয় পথে।
হে পূষা, এ পথে আমাদের উপায় কর রক্ষণের॥ ৭॥
আমাদের নিয়ে যাও শোভনীয় তৃণের দেশে

নূতন সন্তান যেন না আসে পথে।
হে পূষা, এ পথে আমাদের উপায় কর রক্ষণের ॥ ৮ ॥
যদি পার, ধনে পরিপূর্ণ কর আমাদের গৃহ,
দান কর অভীষ্ট বস্তু, তীক্ষ্মতেজা কর আমাদের,
আর পূরণ কর আমাদের উদর।
হে পূষা, এ পথে আমাদের উপায় কর রক্ষণের ॥ ৯ ॥
পূষাকে আমরা নিন্দা করি না, স্তুতি করি সূক্ত দিয়ে।
ধন যাচ্ঞা করি দর্শনীয় পূষার নিকটে ॥ ১।৪২।১০ ॥

পূষাকে সূর্যের সারথিও বলা হয়েছে। ষষ্ঠ মণ্ডলের ৫৬ সূক্তে ভরদ্বাজ ঋষি বলছেন—

চালক রথীশ্রেষ্ঠ পূষা দীপ্তিমান,
তিনি নিয়ত পরিচালনা করছেন সূর্যের হিরণ্ময় রথচক্র ॥ ৩ ॥

পূষা দেবতার উদ্দেশে ভরদ্বাজ ঋষি অনেকগুলি সূক্ত রচনা করেছেন। এই মণ্ডলের ৫৫ সূক্তে তিনি গায়ত্রী ছন্দে বলছেন—

আজ আমরা স্তব করছি ছাগ-বাহন অন্ন-সম্পন্ন পূষার,
লোকে যাঁকে তাঁর ভগিনী ঊষার প্রণয়ী বলে ॥ ৪ ॥
আমরা স্তব করছি রাত্রি মাতার পতি পূষার।
আমাদের স্তোত্র শুনুন তাঁর ভগিনীর প্রণয়ী পূষা।
ইন্দ্রের সহোদর পূষা আমাদের মিত্র হোন ॥ ৬।৫৫।৫ ॥

সূক্তের মূলে প্রণয়ী অর্থে জার শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে পূষা রাত্রির পতি ও ঊষার প্রণয়ী। তিনি ইন্দ্রের সহোদর। এই প্রসঙ্গে পুরাণের কথা এসে পড়ে। অদিতির পুত্রদের মধ্যে ইন্দ্র আছেন, পূষাও আছেন। সম্বন্ধে তাঁরা সহোদর। ভরদ্বাজ ঋষি প্রাচীন ইতিহাস জানতেন বলেই এই সম্বন্ধের কথা লিখেছেন। সূর্য ও ঊষার মধ্যে প্রণয়ের সম্বন্ধ কবি কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়।

এর পর বিষ্ণুর কথাও এসে পড়ে। প্রথম মণ্ডলের ২২ সূক্তে মেধাতিথি গায়ত্রী ছন্দে বিষ্ণুর স্তব করছেন—

সপ্ত কিরণের সাথে বিষ্ণু পরিক্রমা করেছিলেন যে ভূপ্রদেশ থেকে,
সেই প্রদেশ থেকে আমাদের রক্ষা করুন দেবতারা ॥ ১৬ ॥
বিষ্ণু পরিক্রমা করেছিলেন এই জগৎ,
পদ বিক্ষেপ করেছিলেন তিন প্রকার,
জগৎ আবৃত হয়েছিল তাঁর ধূলিলিপ্ত পদে ॥ ১৭ ॥
বিষ্ণু রক্ষক, তাঁকে আঘাত করতে পারে না কেউ,
তিনি তিন পদ পরিক্রমা করেছিলেন ধর্মকে ধারণ করে ॥১৮ ॥

যজমান ব্রত অনুষ্ঠান করেন বিষ্ণুর যে কর্ম বলে,
অবলোকন কর সেই সব কর্ম।
ইন্দ্রের উপযুক্ত সখা বিষ্ণু ॥ ১৯॥
আকাশে সর্বত্র বিচরী চক্ষু যেমন দৃষ্টি করে,
বিদ্বানরাও তেমনি দৃষ্টি করেন বিষ্ণুর পরম পদ ॥ ২০ ॥
বিষ্ণুর এই পরমপদ করেন প্রদীপ্ত
স্তুতিবাদক ও সদা জাগরূক মেধাবী লোকেরা ॥ ১।২২।২১ ॥

এই বর্ণনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে সূর্যের উদয়গিরিতে আরোহণ, মধ্য আকাশে স্থিতি ও অস্তাচলে গমন এই তিনটিই বিষ্ণুর পদ বিক্ষেপ বলে বর্ণিত হয়েছে। পণ্ডিতরা বলেন যে ঋগ্বেদের এই উপমা থেকেই পুরাণে বামন অবতারের গল্প সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তা মনে হয় না। বলির নিকটে উরুক্রমের ত্রিপাদ ভূমি যাজ্ঞা ঐতিহাসিক ঘটনা। সেই ত্রিপাদ ভূমিতে বলির রাজ্য হরণের ঘটনাটি ঋষির জানা ছিল বলেই সেটি তিনি সূর্যের পাদ বিক্ষেপ রূপে বর্ণনা করেছেন।

ঋগ্বেদের আরও দু জায়গায় আমরা বিষ্ণুর পাদ বিক্ষেপের কথা পাই। প্রথম মণ্ডলের ১৫৪ সূক্তে দীর্ঘতমা ঋষি ত্রিষ্টুপ ছন্দে বলছেন—

শীঘ্রই আমি কীর্তন করি বিষ্ণুর বীর কর্ম।
তিনি পরিমাপ করেছেন পার্থিব লোক,
উপরিস্থ জগৎ তিনি করেছেন স্তম্ভিত.
পদক্ষেপ করেছেন তিনবার।
লোকে তাঁর স্তুতি করে প্রভূত ॥ ১ ॥
সমস্ত ভুবন অবস্থিত বিষ্ণুর তিন পদক্ষেপে।
তাই লোকে প্রশংসা করে তাঁর বিক্রমের।
তা ভয়ঙ্কর হিংস্র গিরিশায়ী আরণ্য জন্তুর মতো ॥ ১।১৫৪।২ ॥

এই দীর্ঘতমা ঋষি পরবর্তী সূক্তে জগতী ছন্দে বলছেন—

মানুষ কীর্তন করে প্রাপ্ত হয় স্বর্গদর্শী বিষ্ণুর দুই পাদক্ষেপ,
তৃতীয় পাদক্ষেপ পারে না ধারণা করতে।
পাখিরা তা পায় না পাখা নিয়ে উড়েও ॥ ১।১৫৫।৫ ॥

সূর্যের তিন পদক্ষেপ এখানে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দুটি পদক্ষেপ ধারণা করা যায় উদয়গিরি থেকে অস্ত গিরি, কিন্তু মধ্য গণের পদক্ষেপ পাখিরাও ধারণা করতে পারে না। বিষ্ণু এখানে সূর্য, পুরাণের বামণ অবতার ইন্দ্রের সহোদর উরুক্রম নন। পুরাণের বিষ্ণুকে এখানে মধ্যাহ্নের সূর্য রূপে কল্পনা করা হয়েছে। ভর্গ অর্যমা প্রভৃতি সূর্যের আরও অনেক নাম আছে ঋগ্বেদে। সেগুলি তাঁর বিভিন্ন সময়ের নাম।

এঁরাও কি স্বর্গের দেবতা

পূষা বা সূর্যের সঙ্গে আমরা ঊষা ও রাত্রির সম্পর্ক পেয়েছি। ঋগ্বেদে ঊষার বর্ণনা অতি সুন্দর ও কবিত্বময়। প্রথম মণ্ডলের ১২৩ সূক্তে দীর্ঘতমার অপত্য কক্ষীবান ঋষি ত্রিষ্টুপ ছন্দে বলছেন—

রথ সংযোজিত হয়েছে দক্ষিণা ঊষার,
মরণ রহিত দেবগণ আরোহন করলেন এই রথে।
কালো অন্ধকার থেকে উদয় হলেন ঊষা।
পূজনীয়া তিনি, মানুষের রোগনাশিনী, বিচিত্র গতিমতী ॥১॥
তিনি জাগরিত হলেন সমস্ত প্রাণীর আগে,
অন্নদায়িনী তিনি, জগতের সুখদায়িনী, যুবতী,
বার বার আবির্ভূত হন তিনি।
ঊর্ধ্ব স্থিতা ঊষা আমাদের আহ্বানে আসেন প্রথমেই ॥ ২ ॥
হে সুজাতা ঊষা, পালয়িত্রী তুমি মানুষের,
তুমি তাদের প্রদান কর যে আলোকের ভাব,
সূর্যের আগমনের জন্য সেই আলো দিয়ে দানশীল সবিতা
স্বীকার করুন আমাদের পাপ রহিত বলে ॥ ৩ ॥
অহনা ঊষা নম্র ভাবে যান প্রত্যহ প্রতি গৃহ অভিমুখে,
প্রত্যহ আসেন ভোগেচ্ছাশালিনী দ্যুতিমতী,
গ্রহণ করেন হব্যরূপ ধনের শ্রেষ্ঠ ভাগ ॥ ৪ ॥
হে সুনৃতা ঊষা, ভগের ভগিনী তুমি। বরুণেরও ভগিনী,
তুমিই প্রথমা, সকলে স্তব করুক তোমাকে।
দুঃখের উৎপাদক যে, সে আসুক পশ্চাতে।
তোমাকে সহায় পেয়ে তাকে জয় করব রথ দিয়ে ॥ ৫ ॥
উচ্চারিত হোক সুনৃত বাক্য, প্রজ্ঞা উন্মেষিত হোক।
প্রজ্বলিত হোক অত্যন্ত দীপ্যমান অগ্নি।
বিচিত্র প্রভাবতী ঊষা আবিষ্কার করেছেন
অন্ধকারে আবৃত স্পৃহনীয় বসু ॥ ৬ ॥
ব্যবধান রহিত ভাবে চলছেন রূপবতী দুই দেবতা অহোরাত্র,
একজন যান, আসেন আর একজন।
পর্যায় গামিনীদের একজন গোপন করে পদার্থ,
অন্যজন তা প্রকাশ করেন দীপ্তিমান রথের দ্বারা ॥ ৭ ॥

আজও যেমন, কালও তেমনি। অনবদ্য ঊষা দেবীরা।
বরুণের ত্রিশ যোজন আগে থাকেন তাঁরা,
উদয়কালেই চলে যান এক একজন ঊষা ॥ ৮ ॥
দিনের আগমনের সময় জানেন তিনি,
স্বতোদীপ্তা ও শ্বেতবর্ণা
উদ্ভব তাঁর কৃষ্ণ বর্ণ থেকে,
আদিত্যের ধামে মিলে বৃদ্ধি করেন তাঁর শোভা ॥ ৯ ॥
দেবী, তুমি দানশীল ও দীপ্তিমান সূর্যের নিকটে যাও
কন্যার ন্যায় বিকাশ করে শরীরের অবয়ব।
যুবতীর মতো দীপ্তি বিশিষ্ট হয়ে
তাঁর সামনে বক্ষ অনাবৃত কর ঈষৎ হাস্যে ॥ ১০ ॥
মাতার দেহ মার্জনায় কন্যার শরীর যেমন উজ্জ্বল হয়,
তুমিও তেমনি করেই দর্শন দিতে প্রকাশ কর আপন শরীর।
তুমি ভদ্রা, দূর করে দাও অন্ধকার।
তোমার কাজ ব্যপ্ত করবে না অন্য ঊষা ॥ ১১ ॥
সূর্যের রশ্মির সাথে নিবৃত্ত হন
সর্বকালীনা প্রযতবতী ঊষাদেবীরা,
কল্যাণকর নাম নিয়ে আবার আসেন ফিরে ॥ ১২ ॥
সূর্যের রশ্মির অনুগমন করে কল্যাণকর প্রজ্ঞা দাও,
আমরা আহ্বান করছি তোমাকে।
নিবারণ কর অন্ধকার,
আমরা হতে চাই ধনযুক্ত, ধন হোক আমাদের ॥ ১।১২৩।১৩ ॥

যাস্ক বলেন, অহনা ঊষারই নাম। গ্রীকদের Athena এই অহনা শব্দেরই রূপান্তর। আর্যদের প্রাচীন উপাস্য দেবতা ঊষার উপাসনা বিভিন্ন শাখার মধ্যে দেখা যায়। ঋগ্বেদেই তাঁর অনেক নাম—অর্জুনী দহনা উষস সরমা সরণ্যু। এই সব নাম গ্রীকদের আর্জিনেরিস দফনা বা ডায়না এয়স হেলেন প্রভৃতি নামের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। শুধু যে নামেরই সাদৃশ্য আছে তা নয়, হিন্দু ও গ্রীক পুরাণ কাহিনীতে একই রকমের গল্প দেখতে পাওয়া যায়। গ্রীক দেবী Grynis সরণ্যুর রূপান্তর মাত্র। সরণ্যু যে ভাবে অশ্বীদ্বয়ের জন্ম দিয়েছিলেন, Grynisও সেই ভাবেই Areion ও Depoina নামে যমজ সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন ॥ ১০।১৭।২ ॥

গৌতম ঋষি প্রথম মণ্ডলের ৯২ সূক্তে ঊষাকে আকাশের দুহিতা বলেছেন ॥ ১।৯২।৭ ॥ বামদেব ঋষি চতুর্থ মণ্ডলের ৫১ সূক্তে তাঁকেই

বলেছেন আদিত্যের দুহিতা ॥ ৪।৫১।১ ॥ ঊষাকে স্বর্গের দুহিতা বলেছেন কক্ষীবান ঋষি প্রথম মণ্ডলের ১২৪ সূক্তে ॥ ১।১২৪।৩ ॥ এই সূক্তেরই অষ্টম ঋকে আছে যে ঊষা রাত্রির জ্যেষ্ঠা ভগিনী। দশম মণ্ডলের ১২৭ সূক্তে বলা হয়েছে যে রাত্রিও আকাশের কন্যা ॥১০।১২৭।৮॥ এই সব সম্পর্ক যে কবির কল্পনা, তাতে কোন সংশয় থাকা উচিত নয়। প্রথম মন্ডলের ১১৩ সূক্তে দেখা যাবে যে কুৎস ঋষি বলছেন, সূর্য অস্ত যাবার পর রাত আসে বলে রাত সূর্যের সন্তান এবং রাতের পর ঊষার আগমন হয় বলে ঊষা রাতের সন্তান। আবার ঊষার পরেই সূর্যের উদয় হয় বলে সূর্য ঊষার সন্তান। ঊষার আগমনে দেবতারা স্তুতি দ্বারা জাগরিত হন বলে ঊষাকেই তাঁদের জননী বলা হয়েছে। তাই সায়ন বলেন যে এই জন্যই ঊষা দেবগণের মাতা অদিতির প্রতিস্পর্ধিনী। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি ত্রিষ্টুপ ছন্দে এই সূক্তটি রচনা করেছেন এবং কবি কল্পনার এটি একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন—

সমস্ত জ্যোতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি ঊষা এসেছেন.
প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বিচিত্র ও জগতের প্রকাশক রশ্মি।
রাত যেমন সবিতার প্রসূত,
তেমনি রাতও কল্পনা করেছেন ঊষার উৎপত্তি স্থান ॥ ১ ॥
সূর্যের মাতা শুভ্রবর্ণা দীপ্তিমতী ঊষা এসেছেন,
নিজের স্থানে গিয়েছেন কৃষ্ণবর্ণা রাত,
রাত ও ঊষা উভয়েই সূর্যের বন্ধু, অমরও তাঁরা।
এক অন্যের পরে আসেন, বিনাশ করেন অন্যের বর্ণ,
এই ভাবেই তাঁরা বিচরণ করেন দীপ্তিমান হয়ে ॥ ২ ॥
রাত ও ঊষা এই ভগিনীদ্বয়ের অনন্ত সঞ্চরণ মার্গ
আদিষ্ট হয়েছে দীপ্তিমান সূর্যের দ্বারা,
তাঁরা সেই পথে বিচরণ করেন একের পর অন্যে।
রূপ তাঁদের ভিন্ন হলেও তারা সমান মন সম্পন্না,
তাঁরা বাধা দেন না পরস্পরকে,
কখনও স্থির হয়েও থাকেন না ॥ ৩ ॥
আমরা জানি প্রভাময়ী সুনৃত বাক্যের নেত্রী বিচিত্র ঊষাকে,
তিনি খুলে দিয়েছেন আমাদের দ্বার,
জগৎ আলোকময় করে প্রকাশ করেছেন আমাদের ধন,
তিনি প্রকাশ করেছেন সমস্ত ভুবনকেই ॥ ৪ ॥
যারা শুয়েছিল বক্র হয়ে, তিনি জাগিয়েছেন তাদের
কাউকে ভোগের জন্য, কাউকে যজ্ঞের জন্য, কাউকে ধনের জন্য,

সবাইকেই তিনি নিজ নিজ কর্মের জন্য জাগিয়েছেন।
সমস্ত ভুবনকে প্রকাশ করেছেন বিস্তীর্ণ উষা ॥ ৫ ॥
কাউকে ধনের জন্য, কাউকে অন্নের জন্য, কাউকে মহাযজ্ঞের জন্য,
কাউকে বা অভীষ্ট লাভের জন্য জাগরিত করেন উষা।
তিনি সমস্ত ভুবনকে দিয়েছেন প্রকাশ করে
ভিন্ন ভিন্ন জীবনের উপায়ের জন্য ॥ ৬ ॥
অন্ধকার দূর করে মানুষকে দর্শন দিয়েছেন
চিরযৌবনা শুভ্র বসনা আকাশ দুহিতা।
পার্থিব ধনের ঈশ্বরী, হে সুভগে,
আজ তুমি অন্ধকার দূর কর এই স্থানের ॥ ৭ ॥
অন্তরিক্ষের যে পথ দিয়ে গিয়েছেন অতীতের উষারা,
অনন্ত উষারা সেই পথই অনুধাবন করবেন ভবিষ্যতে।
অন্ধকার দূর করে উষা চৈতন্য দান করেন
সংজ্ঞাহীন মৃতবৎ মানুষকে ॥ ৮ ॥
হে উষা, তুমি প্রজ্জ্বলিত করেছ অগ্নি,
সূর্যের আলোকে দূর করেছ অন্ধকার।
অন্ধকার মুক্ত করেছ যজ্ঞরত মানুষদের,
তাই তুমি কাজ করেছ দেবতাদের উপকার জনক ॥ ৯ ॥
কত কাল উৎপন্ন হচ্ছেন উষা,
উৎপন্ন হবেন আরও কতকাল,
আজকের উষা সাগ্রহে অনুকরণ করছেন গত কালের উষাকে,
আগামী উষাও আজকের দীপ্তিমতীকে করবেন অনুকরণ ॥১০॥
যাঁরা দেখেছিলেন পূর্বকালের উষাকে আলোক প্রকাশ করতে,
তাঁরা গত হয়েছেন এক্ষণে।
আজ আমরাও দর্শন করছি উষাকে।
ভবিষ্যতে যাঁরা দেখবেন, তাঁরাও আসছেন ॥ ১১ ॥
বিদ্বেষীদের দূর করেন তিনি, পালন করেন যজ্ঞ।
সুখ ও সুনৃত শব্দ দেন যজ্ঞের জন্য আবির্ভূত হয়ে।
কল্যাণবতী উষা ধারণ করেন দেবতাদের আকাঙ্ক্ষিত যজ্ঞ।
হে উষা, আজ তুমি উৎকৃষ্ট আলো দাও এইখানে ॥ ১২ ॥
পুরাকালেও নিত্য উদয় হতেন উষা,
এখনও তিনি অন্ধকার মুক্ত করছেন জগৎ,
ভবিষ্যতেও তিনি প্রতিদিন উদয় হবেন,
স্বতেজে বিচরণ করেন তিনি অজর ও অমর হয়ে ॥ ১৩ ॥

উষা আলোকে পূর্ণ করছেন বিস্তীর্ণ আকাশ,
দূর করছেন রাত্রির কৃষ্ণ রূপ।
তিনি জাগরিত করছেন সুপ্ত প্রাণীদের,
আসছেন অরুণ অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করে ॥ ১৪ ॥
তিনি প্রকাশ করছেন বিচিত্র রশ্মি
বরণীয় ধন ও চৈতন্য দান করে।
তিনি বিগত ঊষার উপমা ও প্রারম্ভ আগামী ঊষার,
ঊষা বিকাশ করছেন আলোকের রশ্মি ॥ ১৫ ॥
ওঠো ওগো মানুষেরা,
এসেছে আমাদের জীবনের পরিচালক।
অন্ধকার গিয়ে আলোক এসেছে,
সূর্যের যাত্রাপথ রচনা করে দিয়েছেন ঊষা।
যেখানে অন্নদান করে বর্ধন করছে,
সেইখানে যাব আমরা ॥ ১৬ ॥
স্তুতিবাহক স্তোতা উচ্চারণ করছে
সুগ্রথিত বাক্যে প্রভাবতী ঊষার স্তব।
ধনবতী ঊষা, বিনাশ কর তার অন্ধকার,
তাকে দান কর সন্তান ও অর্থ ॥ ১৭ ॥
সুনৃত স্তুতি শেষ হলে যে ঊষা বিনাশ করেন
হব্যদাতা মানুষের অন্ধকার,
সেই অশ্বদাতা ঊষা প্রসন্ন হোন
সোম অভিষবকারীর প্রতি ॥ ১৮ ॥
হে ঊষা, তুমি প্রতিস্পর্ধিনী দেবমাতা অদিতির,
তুমি প্রকাশ কর যজ্ঞ, কিরণ দান কর বিস্তীর্ণ হয়ে।
এই স্তোত্র প্রশংসা করে তুমি সদয় হও আমাদের উপর,
সবার বরণীয়, আমাদের প্রাদুর্ভূত কর জনপদে ॥ ১৯ ॥
যা কিছু বিচিত্র ধন আনেন ঊষারা,
তা কল্যাণ স্বরূপ যজ্ঞ সম্পাদক স্তোতার।
আমাদের রক্ষা করুন মিত্র বরুণ,
অদিতি সিন্ধু পৃথিবী ও স্বর্গ ॥ ১।১১৩।২০ ॥

আর একটি সুন্দর কথা বলেছিলেন কক্ষীবাণ ঋষি প্রথম মণ্ডলের ১২৪ সূক্তে।—

গৃহিনী যেমন নিজে জেগে সবাইকে জাগান,

তেমনি ঊষাও জাগরিত করেন জগতের প্রাণীকে,
তিনিই সবচেয়ে বেশি আসেন অভিসারিকাদের মধ্যে ॥১।১২৪।৪॥

বহু সূক্তেই ঊষার এই রকমের বর্ণনা আছে। কিন্ত রাত্রির উদ্দেশে মাত্র একটি সম্পূর্ণ সূক্ত পাওয়া যায়। তা রাত্রি সূক্ত নামে অভিহিত। কুশিক ঋষি গায়ত্রী ছন্দে এই স্তবটি রচনা করেছেন দশম মণ্ডলের ১২৭ সূক্তে।—

রাত্রি এসে ব্যপ্ত হয়েছেন চারি দিকে।
অশেষ শোভা সম্পাদন করেছেন নক্ষত্রে ॥ ১ ॥
বিস্তার লাভ করেছেন দেবরূপিণী রাত্রি।
যারা নিচে থাকেন অথবা ঊর্ধ্বে,
সবাইকে আচ্ছন্ন করলেন তিনি।
আলোকের দ্বারা তিনি নষ্ট করেছেন অন্ধকারকে ॥ ২ ॥
রাত্রি এসে ঊষাকে পরিগ্রহ করলেন ভগিনীর মতো,
অন্ধকার করলেন দূরীভূত ॥ ৩ ॥
পাখিরা যেমন বাস করে বৃক্ষে,
তেমনি আমরা শয়ন করেছি রাত্রির আগমনে।
রাত্রি হোন আমাদের শুভকরী ॥ ৪ ॥
নিস্তব্ধ হয়েছে সমস্ত গ্রাম,
শয়ন করেছে নিস্তব্ধ হয়ে
পাদচারী পক্ষী ও শীঘ্রগামী শ্যেন ॥ ৫ ॥
হে রাত্রি, আমাদের নিকট থেকে দূরে নিয়ে যাও
বৃক ও বৃকী, চোরকেও দূরে নিয়ে যাও।
বিশিষ্টরূপে শুভকরী হও আমাদের ॥ ৬ ॥
স্পষ্ট লক্ষ্য হয়ে দেখা দিয়েছে কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার,
আমার নিকট পর্যন্ত করেছে আচ্ছন্ন।
হে ঊষা, আমার ঋণ যেমন নষ্ট কর পরিশোধ করে,
তেমনি করে নষ্ট কর অন্ধকারকেও ॥ ৭ ॥
হে রাত্রি, আকাশের কন্যা, তুমি যাচ্ছ,
তোমাকে গাভীর ন্যায় অর্পণ করলাম এই স্তব,
একে গ্রহণ কর তুমি ॥ ১০।১২৭।৮ ॥

এখানে একটি কথা বলা নিতান্তই প্রয়োজন। এই সব স্তবের দেবতা ঊষা ও রাত্রি। কিন্তু লৌকিক অর্থে এঁরা যে দেবতা নন তা বলাই বাহুল্য। ঋষিরা এখানে প্রকৃত কবি এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেরই বর্ণনা

করেছেন নানাভাবে। এই সূক্তগুলি প্রশ্নাতীতভাবে প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যেরই নিদর্শন।

এই প্রসঙ্গে অশ্বীদ্বয়ের কথাও না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই যুগ্ম দেবতাদের নিয়ে কম করেও পঞ্চাশটি সূক্ত রচিত হয়েছে। কিন্তু এঁরা কোন্ দেবতা তা নিয়ে বহু বিতর্ক আছে। যাস্ক তাঁর নিরুক্তে যা লিখেছেন, তার থেকে বোঝা যায় যে অর্ধ রাত্রির পর ও প্রাতঃকালের পূর্বে আলোক ও অন্ধকারে বিজড়িত যে সময়, তাই অশ্বীদ্বয়। কিন্তু ঊষার পূর্বের এই আলো অন্ধকারের মিশ্রিত দেবতাকে অশ্বীদ্বয় বলা হল কেন? এই বৈদিক উপমার একটি কারণ নির্দেশ করা হয়েছে। সূর্যের আলোক আকাশে ধাবমান হয়, ঊষার আলোও আকাশে ধাবমান হয়। তাই আলোক ও রশ্মিসমূহকে ঋগ্বেদে সর্বদাই অশ্ব বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সূর্য ও উষাকেও অশ্বযুক্ত বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অশ্বিন্ শব্দেরও সেই অর্থ। অশ্বযুক্ত অর্থাৎ আলোকযুক্ত।

অশ্বীদ্বয় যুগ্ম দেবতা। দ্বিতীয় মণ্ডলের ৩৯ সূক্তে গৃৎসমদ ঋষি ত্রিষ্টুপ ছন্দে বলছেন—

হে অশ্বীদ্বয়, তোমরা বাধা দাও
শত্রুর প্রতি প্রেরিত পাষাণখণ্ডদ্বয়ের মতো।
পক্ষীদ্বয় যেমন বৃক্ষে আসে,
তোমরাও তেমনি নিকটে এসো যজমানের।
উক্‌থ উচ্চারণকারী ব্রহ্মা নামের ঋত্বিকদ্বয়ের মতো,
জনপদে দূতদ্বয়ের মতো,
বহু পুরুষের আহ্বানযোগ্য তোমরা ॥ ১ ॥
হে অশ্বীদ্বয়, তোমরা প্রাতঃকালে গমনকারী রথীদ্বয়ের মতো,
বীর ছাগদ্বয়ের মতো, যমজ নারীদ্বয়ের মতো,
সুন্দর শরীর বিশিষ্ট দম্পতির মতো সঙ্গত।
সবার কর্মবেত্তা, ভক্তের নিকটে এসো তোমরা দুজনে ॥ ২ ॥
দেবগণের প্রথম, এসো এই দিকে পশুর শৃঙ্গদ্বয়ের মতো
অশ্বের খুরের মতো বেগ বিশিষ্ট হয়ে।
হে শত্রুচ্ছেদকারী স্বকর্মক্ষম অশ্বীদ্বয়।
দিবসে যেমন আসে চক্রবাকদ্বয় অথবা রথীদ্বয়,
তেমনি তোমরাও এসো আমাদের অভিমুখে ॥ ৩ ॥
হে অশ্বীদ্বয়, আমাদের পার কর নৌকার মতো,
রথচক্রের নাভি ফলকের মতো, বলয়ের মতো চক্রের।

দুটি কুকুরের মতো হিংসা থেকে রক্ষা কর আমাদের।
জরা থেকে রক্ষা কর দুটি বর্মের মতো ।। ৪ ।।
হে অশ্বীদ্বয়, বায়ুদ্বয়ের মতো অক্ষয় তোমরা।
শীঘ্রগামী নদীদ্বয়ের মতো, শক্তিমান চক্ষুদ্বয়ের মতো,
এসো আমাদের দিকে।
তোমরা সুখকর হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয়ের মতো।
আমাদের নিয়ে যাও শ্রেষ্ঠ ধনের অভিমুখে ।। ৫ ।।
হে অশ্বীদ্বয়, তোমারা মধুর বাক্য উচ্চারণ কর ওষ্ঠদ্বয়ের মতো,
জীবন ধারণের জন্য পান করাও স্তনদ্বয়ের মতো,
নাসিকাদ্বয়ের মতো রক্ষক হও শরীরের,
আমাদের শ্রোতা হও কর্ণদ্বয়ের মতো ।। ৬ ।।
হে অশ্বীদ্বয়, সামর্থ্য দাও হস্তদ্বয়ের মতো,
দ্যাবা পৃথিবীর মতো প্রেরণ কর উদক।
তোমাদের কামনা করছে এই সব স্তুতি,
শান যন্ত্রে ওদের তীক্ষ্ন কর অসির মতো ।। ৭ ।।
হে অশ্বীদ্বয়, তোমাদের বৃদ্ধি সাধনের জন্য
এই সব মন্ত্র ও স্তোত্র রচনা করেছেন গৃৎসমদ।
নেতা ও পরম প্রীতিযুক্ত তোমরা,
তোমাদের নিকটে আসুক এই সব স্তুতি।
পুত্র পৌত্র নিয়ে যেন স্তুতি করতে পারি এই যজ্ঞে ।। ২।৩৯।৮ ।।

এই দীর্ঘ বর্ণনা থেকেও বোঝা যায় না কারা এই যুগ্ম দেবতা। যাস্ক এদের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, কারও মতে এই অশ্বীদ্বয় স্বর্গ ও পৃথিবী, কারও মতে দিন ও রাত্রি, কারও মতে সূর্য ও চন্দ্র। কিন্তু ঐতিহাসিক আচার্যরা বলেন যেপ্রাচীন পুণ্যশ্লোক দুজন নরপতিই অশ্বীদ্বয় রূপে স্তুত হন। কিন্তু এই ঐতিহাসিক মতের কোন ভিত্তি নেই বলেই মনে হয়। গ্রীক দেবতা যুগল Dioscuri-র সঙ্গে অশ্বীদ্বরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লক্ষ্য করবার মতো।

ঋগ্বেদে অশ্বীদ্বয়ের দুটি রূপ খুবই স্পষ্ট। একটিতে ঊষা ও সূর্যের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক, আর একটি তাঁদের বৈদ্য রূপে অসাধারণ কৃতিত্ব। মনে হয় যে কোন প্রাকৃতিক বর্ণনার সময়ে কোন বিশেষ কারণে কোন ঋষির মনে পড়ে গিয়েছিল পুরাকালে দেববৈদ্য অশ্বিনী-কুমারদ্বয়কে। তারপর অশ্বীদ্বয়ের উপরেই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সমস্ত কীর্তি আরোপ করেছেন নির্দ্বিধায়। এরও একটা কারণ অনুমান করার চেষ্টা হয়েছে। বিদেশী পণ্ডিতরা মনে করেন নৈসর্গিক ঘটনাকেই

রূপকের ছলে বলা হয়েছে এবং অশ্বীদ্বয়ের কোন প্রাচীন কীর্তির কথা সে সব নয়। বৃদ্ধ চ্যবন ঋষির পুনর্যৌবন লাভের যে কাহিনী বলা হয়েছে, আসলে তা দিয়ে ঋতু পরিবর্তনের কথাই বলা হয়েছে—শীতকালে সূর্যের তাপ ও ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পায় এবং বসন্তের সমাগমে তা বৃদ্ধি পায়, এই ঘটনাই চ্যবনের পুনর্যৌবন লাভ। ব্যাখ্যায় তাঁরা বিভিন্ন সময়ের ও বিভিন্ন স্থানের সূর্যকেই অশ্বীদ্বয় বলেছেন। এই ব্যাখ্যা যুক্তিপূর্ণ হলেও তা গ্রহণীয় নয় এইজন্য যে, আমরা জানি দেব বৈদ্য অশ্বীদ্বয় অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং পুরাকালের ঋষিরা তাঁকে মনে রেখে সেই সব কর্মের জন্য স্তুতি আকাশের অশ্বীদ্বয়ের উপরেই আরোপ করেছিলেন।

এইবারে আর একজন দেবতা যমের সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ঋগ্বেদের যম পৌরাণিক যম নন। অথচ তাঁর পিতৃ পরিচয় পৌরাণিক অর্থাৎ তিনি বিবস্বানেরই পুত্র। কিন্তু ইনি পাপের শাস্তি বিধান করেন না। ঋগ্বেদের যম পুণ্য কর্মের পুরস্কার বিধাতা, পরকালে তিনিই সুখের বিধান করেন। দশম মণ্ডলের ১৪ সূক্তে যম ঋষি পিতৃলোক ও যম প্রভৃতি দেবতার সম্বন্ধে বলছেন—

> হে অন্তঃকরণ, হোমের দ্রব্য দিয়ে সেবা কর
> বিবস্বানের পুত্র যমকে।
> সৎ কর্মান্বিত ব্যক্তিদের তিনি নিয়ে যান সুখের দেশে,
> তিনি পরিষ্কার করে দেন অনেকের পথ।
> তাঁর নিকটেই যায় সকল লোক ॥ ১ ॥
> কোন্ পথে আমরা যাব, তা প্রথমে দেখিয়েছেন যমই।
> আর বিনষ্ট হবে না সে পথ।
> যে পথে গিয়েছেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা,
> সেই পথেই যাবে সকল জীব নিজ নিজ কর্ম অনুসারে ॥ ২ ॥
> মাতলির প্রভু ইন্দ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন
> কব্য নামে পিতৃগণের সাহায্যে,
> অঙ্গিরাদের সাহায্যে বর্ধিত হন যম।
> যারা দেবতাদের সম্বর্ধনা করে ও
> দেবতারা সম্বর্ধনা করেন যাদের,
> বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন তাঁরা সকলেই,
> কেউ স্বাহা দ্বারা আনন্দিত হন, কেউ বা স্বধা দ্বারা ॥ ৩ ॥
> হে যম, তুমি এসে উপবেশন কর এই আরব্ধ যজ্ঞে,
> তুমি জানো এই যজ্ঞ,

তোমার সঙ্গে আনো অঙ্গিরা নামের পিতৃগণদের
চলতে থাক তোমার উদ্দেশে কবিদের মন্ত্রোচ্চারণ।
হে রাজন্, তুমি আমোদ কর হোমের দ্রব্য গ্রহণ করে ॥ ৪ ॥
হে যম, তুমি এসো নানা মূর্তিধারী পিতৃগণের সঙ্গে,
আমোদ কর এই স্থানে,
উপবেশন কর এই যজ্ঞের কুশের উপরে।
আমরা আহ্বান করছি তোমার পিতা বিবস্বানকে ॥ ৫ ॥
এইমাত্র এসেছেন অঙ্গিরা অথর্বন ও ভৃগু নামে পিতৃগণ,
সোমরস পাবার অধিকারী তাঁরা।
এই যজ্ঞ ভোক্তারা যেন শুভানুধ্যান করেন আমাদের,
আমরা যেন কল্যাণভাগী হই তাঁদের প্রসন্নতা লাভ করে ॥ ৬ ॥
আমাদের পূর্ব পুরুষেরা সেখানে গিয়েছেন যে পথ দিয়ে,
তুমিও সে পথ দিয়ে যাও সেখানে।
যে দুই রাজা যম ও বরুণ আমোদ করছেন স্বধা পেয়ে,
সেখানে গিয়ে দর্শন কর তাঁদের ॥ ৭ ॥
পিতৃগণের সঙ্গে মিলিত হও চমৎকার স্বর্গধামে,
মিলিত হও যম ও তোমার ধর্ম ফলের সঙ্গে।
পাপ পরিত্যাগ করে প্রবেশ কর অস্ত গৃহে,
গ্রহণ কর উজ্জ্বল দেহ ॥ ৮ ॥
দূর হও ভূত প্রেতরা, চলে যাও, সরে যাও,
পিতৃগণ এই স্থান নির্মাণ করেছেন তাঁর জন্য।
এই স্থান শোভিত দিবা, জল ও আলোকের দ্বারা।
যম এই স্থান দিয়ে থাকেন মৃত ব্যক্তিকে ॥ ৯ ॥
হে মৃত, এই যে কুকুর, যাদের চার চোখ ও বর্ণ বিচিত্র,
শীঘ্র চলে যাও এদের নিকট থেকে।
সর্বদা যাঁরা আমোদে কালক্ষেপ করেন যমের সাথে,
তুমি তাঁদের নিকটে যাও উত্তম পথ দিয়ে ॥ ১০ ॥
হে যম, তোমার প্রহরী যে দুই কুকুর রক্ষা করে পথ,
সব মানুষকেই পড়তে হয় তাদের দৃষ্টি পথে।
এই মৃতকে রক্ষা কর তাদের কোপ থেকে।
হে রাজন্, একে নিরোগ কর, কর কল্যাণভাগী ॥ ১১ ॥
সেই যে দুই যমদূত যাদের নাসিকা বৃহৎ,
যারা শীঘ্র তৃপ্ত না হয়ে সবার পশ্চাতে যায়,

তারা যেন আজ এইখানে প্রদান করে বল ও মঙ্গল,
আমরা যেন দর্শন পাই সূর্যের ॥ ১২ ॥
সোম তৈরি কর যমের জন্য, হোম কর হোমের দ্রব্য।
এই যে যজ্ঞ, অগ্নি এর দূত,
নানা সজ্জায় শোভিত করা হয়েছে তাঁকে
যমের দিকেই যাবে এই যজ্ঞ ॥ ১৩ ॥
সেবা কর যমের, হোম কর ঘৃতসিক্ত হোমের দ্রব্যে।
যম যেন আমাদের প্রদান করেন দীর্ঘ পরমায়ু
দেবতাদের মধ্যে বহু কাল বেঁচে থাকবার জন্য ॥ ১৪ ॥
অতি মিষ্ট দ্রব্য হোম কর যমরাজার উদ্দেশে।
যে ঋষিরা আমাদের আগে জন্মে দেখিয়েছেন ধর্মের পথ,
তাঁদের নমস্কার করি আমরা ॥ ১৫ ॥
যম পেয়ে থাকেন ত্রিকদ্রুক নামে যজ্ঞ,
তাঁর গতিবিধি ছয় স্থানে ও এক বৃহৎ জগতে।
তাঁর গতিবিধি ছয় স্থানে ও এক বৃহৎ জগতে।
তাঁরই প্রতি প্রযোজ্য ত্রিষ্টুপ গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ ॥ ১০।১৪।১৬ ॥

এই সূক্তে পরকালের সুখের বর্ণনা আছে, আছে সেই সুখের বিধান-কর্তা যমের কথা। যজ্ঞকর্তার মৃত্যু হলে তাকে সম্বোধন করে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় উচ্চার্য মন্ত্রও আছে। এই সূক্ত থেকেই জানা যায় যে পুণ্যাত্মা পূর্ব পুরুষেরা দেবতাদের সঙ্গে স্বর্গবাস করেন এবং তাঁরা তাঁদের সঙ্গেই যজ্ঞের ভাগী হন। দশম মণ্ডলের এই সূক্তগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রচিত বলে মনে করা হয়। সে সময়ে পরলোকে বিশ্বাস জন্মেছিল ঋষিদের মনে। স্বর্গধামের সুখের বর্ণনা আছে নবম মণ্ডলের ১১৩ সূক্তে। কশ্যপ ঋষি পংক্তি ছন্দে বলছেন—

যে ভুবনে সর্বদাই আলোক,
যেখানে সংস্থাপিত আছে স্বর্গলোক,
হে ধারণশীল, আমাকে নিয়ে চল
সেই অমৃত ও অক্ষয় ধামে ॥ ৭ ॥
যেখানে আছেন রাজা বৈবস্বত,
স্বর্গের দ্বার আছে যেখানে,
যেখানে আছে প্রশস্ত নদী,
সেখানে নিয়ে গিয়ে অমর কর আমাকে ॥ ৮ ॥
সেই যে তৃতীয় নাগলোক তৃতীয় দিবালোক,
নভমণ্ডলের ঊর্ধ্বে স্বেচ্ছায় বিচরণ করা যায় যেখানে,

যে স্থান সর্বদাই আলোকময়,
সেখানে অমর কর আমাকে ।। ৯ ।।
সকল কামনা যেখানে পূর্ণ হয় নিঃশেষে,
প্রধ নামে দেবতার ধাম আছে যেখানে,
যেখানে লাভ হয় যথেষ্ট আহার ও তৃপ্তি,
সেখানে অমর কর আমাকে,
আর ক্ষরিত হও ইন্দ্রের জন্য ।। ১০ ।।
যেখানে বিরাজ করে বিবিধ আমোদ ও আনন্দ,
যেখানে পূর্ণ হয় অভিলাষীর সমস্ত কামনা,
সেখানে অমর কর আমাকে,
আর ক্ষরিত হও ইন্দ্রের জন্য ।। ৯।১১৩।১১ ।।

যমের সম্বন্ধে আর একটি মাত্র সূক্ত আছে দশম মণ্ডলে। দশম মণ্ডলের ১০সূক্ত, যম ও যমী দেবতা এবং তাঁরাই ঋষি। সমস্ত সূক্তটি ত্রিষ্টুপ ছন্দে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, সূক্তের দেবতা যাঁরা, তাঁরাই সূক্তের রচয়িতা ঋষি হতে পারেন কেমন করে? এই মণ্ডলেরই ১৪ সূক্তের দেবতা পিতৃলোক ও যম প্রভৃতি দেবতা এবং ঋষি যম। পূর্বেই বলেছি যে সূক্তের বিষয়কেই ঋগ্বেদে দেবতা বলা হয়েছে। তাই পিতৃলোকও দেবতা। কিন্তু এখানে স্বতই এই প্রশ্ন মনে আসে যে যম ও যমী নামে যদি কোন ঋষি এই সূক্ত রচনা করে থাকেন, তবে তাঁরা সূক্তের দেবতা যম ও যমী বোধহয় নন। মনে হয় যে কোন কবি পুরাকালের যম ও যমীকে নিয়ে এই সূক্তটি সংলাপের মতো করে রচনা করেছিলেন এবং নিজের নামটি গোপন রেখেছিলেন যম ও যমী নাম নিয়ে। এটি সেকালের সমাজের একটি সুন্দর চিত্র। তাই এই সূক্তের সম্পূর্ণ অনুবাদ নিচে দেওয়া হল।—

যমী। আমি এসেছি সখার কাছে সখ্যের জন্য
বিশাল এক সমুদ্রের মাঝে এই নির্জন দ্বীপে।
আমার সহচর তুমি জন্মাবধি।
বিধাতার সংকল্পে আমরা তাঁর নাতির জন্ম দেব পৃথিবীতে।।১।।

যম। তোমার সহচর করে না এ সম্পর্ক কামনা।
আকৃতি ভিন্ন হলেও প্রকৃতি আমাদের এক।
এ স্থান নির্জন নয়,
মহান অসুরের বীর পুত্রেরা ধারণ করে আছেন স্বর্গ,
পৃথিবীর সব কিছু দেখছেন তাঁরা ।। ২ ।।

যমী। দেবতারা যা চান
তা কি ত্যাগ করতে হবে মর্ত্যে?
তোমার মন মেলাও আমার মনে,
দেহে প্রবেশ কর পতির মতো, জনকের মতো ॥ ৩॥
যম। এ কাজ যে আমরা আগে করি নি,
সত্যবাদী হয়ে মিথ্যা বলি কেমন করে?
গন্ধর্ব ও আপ্যা ঘোষা উভয়েরই পিতামাতা,
তাই আমাদের সম্পর্ক বড় নিকট ॥ ৪ ॥
যমী। আমাদের জনয়িতা দেব ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপ,
মাতৃগর্ভেই তিনি আমাদের দম্পতী করেছেন।
তাঁর অভিপ্রায়ে বাধা দেবার ক্ষমতা নেই কারও।
আমাদের এই সম্পর্ক জানে পৃথিবী ও আকাশ ॥ ৫ ॥
যম। কে জানে প্রথম দিনের কথা!
কে দেখেছে তা! আর কে তা প্রকাশ করেছে!
মিত্র ও বরুণের ধাম এই বিশ্ব বড় বিশাল,
ওগো নারী, পুরুষকে তুমি আঘাত হেনেছ, নিয়েছ বিপথে ॥৬॥
যমী। যমী আমি, আমাতে প্রবেশ করুক যমের কামনা।
এসো আমরা শয়ন করি এক শয্যায়।
পতির নিকটে পত্নীর মতো দেহদান করছি আমি,
এসো আমরা সহকর্মী হই রথের দুই চাকার মতো ॥ ৭ ॥
যম। দেবতাদের যে চরেরা বিচরণ করে এখানে,
অবাধ তাদের গতি, বন্ধ হয় না তাদের চোখ,
হে দুঃখদায়িনী, যাও তুমি অন্যের কাছে,
রথচক্রের মতো যুগলে রত হও এক কাজে ॥ ৮ ॥
যমী। কি দিনে, কি রাতে, যমকে যেন দেওয়া হয় যজ্ঞের ভাগ,
সূর্যের চোখ যেন উন্মীলিত থাকে সারাক্ষণ।
স্বর্গ ও পৃথিবীর সম্পর্ক মিথুনের।
যমী আশ্রয় নিক তার ভাই যমের নিকটে ॥ ৯ ॥
যম। উত্তরকালে আসছে এমন যুগ
যখন সহজাত অসহজাতের কাজ করবে।
হে সুন্দরী, আর কাউকে তুমি বরণ কর পতিত্বে,
তোমাকে গ্রহণ করলে দু বাহু বাড়িয়ে আলিঙ্গন কর তাকে ॥১০॥
যমী। সে কেমন ভাই যদি তার ভগিনী অনাথ হয়!
সে কেমন ভগিনী যদি দুঃখ থাকে তার ভাই-এর!

কামনায় আকুল হয়ে আমি বলছি এত কথা,
আমার সঙ্গে মিলিয়ে দাও তোমার দেহ ॥ ১১ ॥

যম। না, আমার সঙ্গে মিলতে দিও না তোমার দেহ,
নিজের ভগিনীতে উপগত হওয়া পাপ।
মন ফেরাও অপরের সঙ্গে প্রমোদের জন্য,
হে সুন্দরী, তোমার ভাই করে না তোমাকে কামনা ॥ ১২ ॥

যমী। হায় যম, এমন দুর্বল পুরুষ তুমি!
তোমার মন আমি জানি না! বুঝি না তোমার অন্তর!
অন্য নারী বোধহয় বেঁধেছে তোমায় আলিঙ্গনে,
লতা যেমন গাছকে জড়ায় বা রজ্জু অশ্বকে ॥ ১৩ ॥

যম। যমী, তুমি আলিঙ্গন কর অন্য পুরুষকে,
লতা যেমন করে গাছকে জড়ায় তেমনি করে,
পরস্পরের মন হরণ কর তোমরা,
তারই সঙ্গে তোমার মিলন হবে মঙ্গলের ॥ ১০।১০।১৪ ॥

এই সূক্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যম ও যমী বিবস্বানের যমজ পুত্র কন্যা। বিবস্বান সূর্যেরই নামান্তর। যম বলছেন, গন্ধর্ব আমাদের পিতা এবং আপ্যা ঘোষা আমাদের উভয়ের মাতা। আমরা পুরাণে দেখেছি যে অদিতির এক পুত্রের নাম বিবস্বান, তিনি অন্তরিক্ষ প্রদেশে গন্ধর্বদের রাজা ছিলেন। যম ও যমী ছিলেন তাঁর পুত্র কন্যা। পরবর্তীকালে এই বিবস্বানই সূর্য রূপে কল্পিত হয়েছেন।

এই সূক্তে যমী তাঁর ভ্রাতা যমের নিকটে অসঙ্কোচে তাঁর কামনা প্রকাশ করছেন এবং যম ভগিনীর অভিলাষ পাপ বলে তাঁকে নিবৃত্তি করতে চাইছেন। এ কালের বিচারে এই সংলাপ নিঃসন্দেহে অশ্লীল বলে চিহ্নিত হবে। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে মানুষের আদিম সমাজে নরনারীর অবাধ মিলনের স্বাধীনতা ছিল। এই সূক্তে সমাজের নূতন চেতনার কথা বলা হয়েছে পুরাতন কাহিনী অবলম্বন করে। জ্যোতিষীদের মত অন্য। তাঁরা মনে করেন যে এই সূক্তে সূর্যের আকাশে বিচরণের চিত্রই দেখানো হয়েছে। যম ও যমী দিন রাত্রির রূপক। রাত্রির পিছনে আসে দিন, কিন্তু তাদের মিলন হয় না। আধ্যাত্মিকেরা এই সূক্তের অন্য অর্থ করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে যম ও যমীর সংলাপে প্রকৃতি ও পুরুষের রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। উপনিষদের দুই বিহঙ্গের মতো যম ও যমী একই মায়ের জঠরে জন্ম নিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের প্রকৃতি ভিন্ন। একজন দ্রষ্টা, অন্যজন ভোক্তা। এঁরাই জ্ঞান ও শক্তি অথবা পুরুষ ও প্রকৃতি। এঁরা পরস্পর বিরোধী বলে সাধারণ

মানুষের চেতনায় এঁদের মিলন সম্ভব নয়। দেবতাদের মধ্যে পতি পত্নীর ও ভাইবোনের সম্বন্ধ মিলে পূর্ণতর হতে পারে। বাইবেলে খ্রীষ্ট গির্জাকে অথবা ঈশ্বর জীবকে বলছেন, 'A garden inclosed is my sister, my spouse……' এই প্রসিদ্ধ সূক্তটি মনোযোগ দিয়ে পড়ে এমন একটি ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে হবে যা সর্বাংশে মিলে যায়।

সে অন্য কথা। এখানে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে এই সূক্তে যম একজন সাধারণ মানুষ রূপে চিত্রিত হয়েছেন, দেবতা রূপে নয়। এর পর এই যম ঋষিই বিবস্বানের পুত্র যমকে হোমের দ্রব্য দিয়ে সেবার কথা বলেছেন এই মণ্ডলেরই ১৪ সূক্তে। তারপর পরলোকের কল্পনা এসেছে, স্বর্গের কল্পনা। তা নিতান্তই কবির কল্পনা। ঋগ্বেদের ঋষি পরলোক বা স্বর্গকে আকাশ বা পৃথিবীর মতো সত্য বলে প্রচার করেন নি।

এই প্রসঙ্গের উপসংহারে বলা যায় যে ঋগ্বেদে দেবতাদের সম্বন্ধে সেকালের মানুষের দীর্ঘদিনের ধারণা ও দেবতত্ত্বের ক্রমবিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। কখনও দেখি জীব পূজা অর্থাৎ Totemism, কখনও অচেতন পূজা অর্থাৎ Fetishism দেখি, আবার একই সঙ্গে সর্বপ্রাণবাদ অর্থাৎ Animism-ও মিলে আছে দেখি। এর পর আধ্যাত্মিক চেতনা এসেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, ঋষিরা একটি দার্শনিক ধর্মমতের দিকে এগিয়েছেন। নিজেদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার কথাও অবহেলা করেন নি বলে ঋগ্বেদ শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়, বৈদিক আর্যদের চিন্তা ও জীবনযাত্রার মহাকাব্য। পরবর্তী অধ্যায়ে ঋগ্বেদে আধ্যাত্মিক চিন্তার বিষয়টি আলোচিত হবে।

দার্শনিক চিন্তার সূত্রপাত

ঋগ্বেদের দেবতাদের মধ্যে বিশ্বদেবগণও আছেন। প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তে দীর্ঘতমা ঋষি বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে বলছেন—

কে দেখেছিল প্রথম জাতকে
অস্থিরহিত যখন ধারণ করল অস্থি যুক্তকে?
ভূমি হতে প্রাণ ও শোণিত, কিন্তু কোথা হতে আত্মা?
বিদ্বানের নিকটে কে জানতে চায় এ বিষয়ে? ॥ ৪ ॥
কিছু না বুঝেই আমি জানতে চাইছি অপক্কমতি মনে।
দেবতাদের নিকটেও নিগূঢ় এ সব সন্দেহ পদ।
এক বৎসরের গোবৎসকে পরিবেষ্টনের জন্য
যে সপ্ততন্তু পেতেছেন মেধাবীরা, তা কী? ॥ ৫ ॥
আমি অজ্ঞান, জানি না কিছুই।
তাই জানবার জন্য জিজ্ঞাসা করছি জ্ঞানী মেধাবীদের॥১।১৬৪।৬॥

পঞ্চম ঋকের অর্থ আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। সায়ন বলেন যে বৎস সূর্য ও সপ্ত তন্তু সাত রকম সোম যজ্ঞ। কিন্তু এই সূক্ত তিনটি মনযোগ দিয়ে পড়লে মনে হবে যে সূক্ত রচয়িতা ঋষি আদিত্যের স্তুতি করতে গিয়ে 'প্রথম জাত' বা 'জন্ম রহিত' শব্দ দুটি ব্যবহার করে জগতের এক সৃষ্টি কর্তার কথাই ভেবেছেন। তাঁর সেই ভাবনার কথাই প্রকাশ পেয়েছে এই সূক্তে।

প্রজাপতি ঋষিও বিশ্বদেবগণের স্তব করেছেন তৃতীয় মণ্ডলের ৫৫ সূক্তে। শেষ ঋকে তিনি বলছেন—

হে ইন্দ্র, ওষধিরা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় তোমার জন্যই,
তোমা হতেই নির্গত হয় জল,
পৃথিবী ধারণ করেন ধন তোমারই জন্য।
তোমার সখা আমরা, যেন ভাগী হতে পারি তোমার ধনের।
দেবতাদের মহৎ বল একই ॥ ৩।৫৫।২২ ॥

এই সূক্তে ঋষি প্রকৃতির কার্য পরম্পরার মধ্যে ঐক্য বুঝতে পেরেছেন এবং দেবতাদের কার্যের ঐক্য ও ঐশ্বরিক বলের একতা প্রকাশ করেছেন। ঋষি ৪ ঋকে বলেছেন, অগ্নি বেদীতে বিরাজ করেন, বনে প্রজ্জ্বলিত হন, আকাশে উৎপন্ন হন, পৃথিবীতে বিকশিত হন। ৫ ঋকে বলেছেন, তিনি উত্তাপ রূপে শস্য উৎপাদন করেন। ৬ ঋকে বলেছেন, সূর্য রূপে

পশ্চিম দিকে অস্ত গিয়ে পূর্ব দিকে উদয় হন। ৭ ঋকে বলেছেন, আকাশে বিচরণ করেন ও ভূমিতে বাস করেন। ১১ ঋকে বলেছেন, দিবা ও রাত্রি পরস্পর সঙ্গত হয়ে আসছে ও যাচ্ছে। ১২ ঋকে বলেছেন, আকাশ ও পৃথিবী পরস্পরকে বৃষ্টি ও বাষ্প রূপে রস দান করছে। ১৭ ঋকে বলেছেন, যে নৈসর্গিক নিয়মে এক দিকে বজ্র হচ্ছে, সে নিয়মে অন্য দিকে বৃষ্টি হচ্ছে। ১৯ ও ২০ ঋকে বলেছেন, একই নির্মাণ কর্তা মনুষ্য ও পশু পক্ষীকে সৃষ্টি করেছেন এবং শেষ ঋকে বলেছেন, তিনিই শস্য উৎপাদন করেন, বৃষ্টি দান করেন, ধনধান্য উৎপন্ন করেন। প্রকৃতির অনন্ত কার্য পরম্পরাকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নামে স্তুতি করা হয়। সে কার্য পরম্পরায় একতা দেখেই ঋষি বলেছেন যে দেবতাদের কাজ ভিন্ন নয়, তাঁদের দৈব ক্ষমতা বা ঐশ্বরিক বল একই। এই ভাবেই মানুষের হৃদয়ে প্রকৃতির এক নিয়ন্তা বা ঈশ্বরের অনুভব উদিত হয়েছিল।

একই ভাব প্রকাশ পেয়েছে পঞ্চম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তে। অত্রি ঋষিও বরুণের স্তব করবার সময়ে দৈবকার্য পরম্পরার ঐক্য দেখেছিলেন এবং তাঁর হৃদয়েও এক ঈশ্বরের অনুভব উদিত হয়েছিল। যিনি সূর্যের দ্বারা অন্তরিক্ষের পরিমাণ নেন (৫ ঋক), তিনিই সমস্ত নদীকে এক মহাসমুদ্রে প্রেরণ করেন। অথচ সেই মহাসমুদ্র কখনও পরিপূর্ণ হয় না (৬ ঋক) এবং তিনি মানুষের পাপ বিনষ্ট করেন ও অপরাধ খণ্ডন করেন (৭ ও ৮ ঋক)।

মেধ্য কাণ্ব ঋষিও এই ভাব প্রকাশ করেছেন অষ্টম মণ্ডলের ৫৮ সূক্তে। তিনি বিশ্বদেব দেবতার উদ্দেশে বলছেন—

যাঁকে বহু প্রকারে কল্পনা করে
এই যজ্ঞ সম্পাদন করছেন সহৃদয় ঋত্বিকগণ,
যিনি কিছু না বলেও নিযুক্ত আছেন স্তুতিকারী রূপে,
তাঁর বিষয়ে কি জ্ঞান আছে যজমানের ? ॥ ১ ॥
এক অগ্নি সমৃদ্ধ হয়েছেন বহু প্রকারে,
এক সূর্যই প্রভূত হয়েছেন সমস্ত বিশ্বে,
এই সমস্তকেই প্রকাশ করেছেন একই ঊষা ॥ ৮।৫৮।২ ॥

মূলে আছে, একং বৈ ইদং বি বভূব সর্বং।

ঠিক একই কথা বলেছেন দীর্ঘতমা ঋষি প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তে। সূর্যের উদ্দেশে তিনি বলছেন, একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।—

এই আদিত্যকেই মেধাবীরা বলেন
ইন্দ্র মিত্র বরুণ ও অগ্নি।

ইনি স্বর্গীয় পক্ষবিশিষ্ট ও সুন্দর গমনশীল।
ইনি এক হলেও এঁকে বর্ণনা করে বহু বলে ॥ ১।১৬৪।৪৬ ॥

দশম মণ্ডলে ঋষিদের দার্শনিক চিন্তা আরও স্পষ্ট রূপ নিয়েছে। এরই প্রমাণ হিসাবে নাসদীয় সূক্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। ১২৯ সূক্তে প্রজাপতি ঋষি পরমাত্মা দেবতার উদ্দেশে বলছেন—

সেকালে যা নেই তা ছিল না, যা আছে ছিল না তাও।
পৃথিবী ছিল না, আকাশও ছিল না অতিদূর বিস্তৃত।
আবরণ করে এমন কী ছিল? কোথায় ছিল কার স্থান?
তখন কি ছিল দুর্গম ও গম্ভীর জল? ॥১॥
তখন মৃত্যুও ছিল না, ছিল না অমরত্বও।
প্রভেদ ছিল না রাত্রি ও দিনের।
তখন শুধু নিশ্বাস প্রশ্বাস যুক্ত হয়ে জীবিত ছিলেন
একমাত্র বস্তু আত্মা। ছিল না আর কিছু ॥ ২ ॥
সবার আগে অন্ধকারেই আবৃত ছিল অন্ধকার।
চিহ্নবর্জিত ও চারিদিকে জলময় ছিল সবই।
সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন অবিদ্যমান বস্তুতে।
তপস্যার প্রভাবেই জন্মিলেন সে এক বস্তু ॥ ৩ ॥
সকলের আগে কামের আবির্ভাব হল মনের উপর,
তা থেকেই উৎপত্তির কারণ নির্গত হল সর্ব প্রথম।
বুদ্ধিমানেরা নিরূপণ করল অবিদ্যমানে বিদ্যমানের উৎপত্তি
বুদ্ধি দিয়ে আপন হৃদয়ে পর্যালোচনা করে ॥ ৪ ॥
উদ্ভব হলেন রেতোধা পুরুষেরা,
মহিমা সকলও হলেন উদ্ভূত।
ওদের রশ্মি বিস্তৃত হল দুই পার্শ্বে, নিম্নে ও উর্ধ্বে।
নিম্নে স্বধা রইল আর উর্ধ্বে রইল প্রয়তি ॥ ৫ ॥
প্রকৃত কথা কে জানে? কেইবা করবে বর্ণনা?
কোথা হতে জন্ম হল? আর নানা সৃষ্টি হল কোথা থেকে?
দেবতারা তো হয়েছেন নানা সৃষ্টিরই পর।
কোথা থেকে যে কী হল, তা কেই বা জানে ॥ ৬ ॥
কোথা থেকে যে হল এই সব সৃষ্টি, কার থেকে হল,
কেউ সৃষ্টি করেছেন, কি করেন নি,
তা জানেন তিনিই, যিনি আছেন প্রভু রূপে পরম ধামে।
অথবা না জানতে পারেন তিনিও ॥ ১০।১২৯।৭ ॥

নাসদীয় নামের এই সূক্তটি অতি প্রসিদ্ধ। দেখা যাচ্ছে যে সৃষ্টির আদি কারণ ও প্রণালীর কথা এতে পর্যালোচনা করা হয়েছে। মানে হয় যে এটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের রচনা। প্রকৃতির সৌন্দর্য ও প্রাকৃতিক কার্য সমূহ ঋষিরা এক সময়ে দেবতা বলে স্তব করতেন। এই সময়ে তাঁদের মনে হল যে তাঁরা আদি দেবতা নন, তাঁরাও সৃষ্ট অর্থাৎ কার্য মাত্র। তবে কারণ কে? আদি কে? এই প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হয়েছে এই সূক্তে। ঋষি স্বীকার করছেন যে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। দেবতারাও জানেন না, এমন কি সৃষ্টিকর্তা পরমাত্মাও জানেন কিনা সন্দেহ।

দশম মণ্ডলের ৩১ সূক্তে কবষ ঋষি বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে বলছেন—

দ্যুলোক ও ভূলোক শেষ নন এঁরাই,
আরও এক আছে উপরে এঁদের।
প্রজার সৃষ্টি কর্তা, তিনিই ধারণ করেন দ্যুলোক ও ভূলোক,
সূর্যকে যখন বহন শুরু করে নি তাঁর ঘোটকেরা,
অন্নের প্রভু তাঁর শরীর নিয়েছিলেন সেই সময়ে ॥ ১০।৩১।৮ ॥

এখানেও দেখা যায় যে সূক্তের ঋষি দ্যুলোক ও ভূলোকের উপরেও একজনকে কল্পনা করছেন। তিনিই দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণ করে আছেন, তিনি প্রজার সৃষ্টিকর্তা ও অন্নের প্রভু। সূর্যের আকাশ পরিক্রমা আরম্ভ হবার আগে থেকেই তিনি আছেন। এখন প্রশ্ন হল, এই স্বয়ম্ভূ কে? দেবতাদের উপরে অবস্থিত ও সবার পূর্বস্থ এক ঈশ্বরকেই কবষ ঋষি বিশ্বদেব নামে স্তুতি করছেন। তিনি স্বয়ম্ভূ ও সর্বশ্রেষ্ঠ, কোন কিছুই তাঁর সমতুল্য নয়।

দশম মণ্ডলের ৮১ ও ৮২ সূক্তে বিশ্বকর্মা ঋষি এই দেবতাকেই বিশ্বকর্মা বলেছেন। ত্রিষ্টুপ ছন্দে তিনি বলছেন—

সৃষ্টিকালে তাঁর অধিষ্ঠান ছিল কোথায়?
কোন্ স্থান থেকে তিনি আরম্ভ করেছিলেন সৃষ্টির কার্য?
কোন্ স্থান থেকে সেই বিশ্বদর্শনকারী বিশ্বকর্মা
পৃথিবী নির্মাণ করে তার উপরে বিস্তার করলেন আকাশ?
সে এক প্রভু, সকল দিকে তাঁর চোখ,
সকল দিকে মুখ ও সকল দিকেই হাত পা।
ইনি নির্মাণ করেন দু হাতে ও বিবিধ পক্ষ সঞ্চালন করে,
তাতেই রচনা হয় বৃহৎ দ্যুলোক ও ভূলোক ॥ ১০।৮১।৩ ॥

পরের সূক্তে ঋষি যা বলেছেন, তা আজকের মানুষও সত্য বলে ভাবছে। এই সূক্তের সম্পূর্ণ অনুবাদ এই রকম—

সেই সুধীর পিতা দৃষ্টিপাত করলেন উত্তম রূপে,
আলোচনা করলেন মনে মনে,
তারপর পরস্পর সম্মিলিত করলেন জলাকৃতি,
সৃষ্টি করলেন স্বর্গ ও পৃথিবী।
যখন দূর হয়ে উঠল এর চার দিকের সীমা,
তখন পৃথক হয়ে গেল দ্যুলোক ও ভূলোক ॥ ১ ॥
বিশ্বকর্মার মন বৃহৎ, নিজেও বৃহৎ তিনি।
তিনি নির্মাণ করেন, ধারণ করেন তিনি।
সর্বশ্রেষ্ঠ তিনি, অবলোকন করেন সবই।
সপ্তর্ষিরও পরে তিনি একাকী আছেন, বলেন বিদ্বানরা।
তাঁদের সকল অভিলাষ পূর্ণ হয় অন্নের দ্বারা ॥ ২ ॥
যিনি আমাদের জন্মদাতা পিতা, বিধাতা যিনি,
যিনি অবগত আছেন বিশ্বভুবনের সকল ধাম,
একমাত্র যিনি, অথচ নাম ধারণ করেন সকল দেবের,
তাঁর বিষয়ে জিজ্ঞাসু হয় অন্য সকল ভুবনের লোক ॥ ৩ ॥
যে সব ঋষি প্রাণী সৃষ্টি করেছিলেন
এই বিশ্বভুবন গঠিত হবার পর,
সেই প্রাচীনেরা অনেক ধন ব্যয় করেছিলেন যজ্ঞে
প্রভূত স্তব করতে করতে ॥ ৪ ॥
যা আছে দ্যুলোকের পরপারে পৃথিবী অতিক্রম করে,
যা অতিক্রম করে আছে অসুর দেবগণকে,
এমন কোন্ গর্ভ ধারণ করেছিলেন জনগণ,
যার মধ্যে তাবৎ দেবতা পরস্পরকে দেখছে মিলিত ? ॥ ৫ ।
যে সৃষ্টি সংস্থাপিত হয়েছিল
সেই অজাত পুরুষের নাভি দেশে,
তাতেই অবস্থিত আছে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড,
এই জনগণ ধারণ করেছিল আপন গর্ভ স্বরূপ,
দেবতারা পরস্পর সাক্ষাৎ করেন এরই মধ্যে ॥ ৬ ॥
এই সৃষ্টি করেছেন যিনি, তাঁকে বুঝতে পার না তোমরা.
তা বোঝবার ক্ষমতা পায় নি তোমাদের অন্তঃকরণ।
নানা প্রকার কল্পনা করে কুজ্ঝটিকার আচ্ছন্ন হয়ে,
আপন প্রাণের তৃপ্তির জন্যেই আহারাদি করে তারা,
বিচরণ করে স্তব স্তুতি উচ্চারণ করে ॥ ১০।৮২।৭ ॥

এই সূক্তের শেষ ঋকে যা বলা হয়েছে, তার চেয়ে বড় সত্য বোধহয় আর কিছু হতে পারে না। সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার কথা মানুষ আজও বুঝতে পারে না, কুজ্‌ঝটিকায় আচ্ছন্ন এই সত্য। মানুষ তাই নানা প্রকার জল্পনা করে। হাজার হাজার বছর অতীত হবার পরেও সৃষ্টি-কর্তাকে আবিষ্কার করা আজও সম্ভব হয় নি।

দশম মণ্ডলের ৩৭ সূক্তে অভিতপা ঋষি বলছেন—

সে যে সত্যবাক্য,
যাকে অবলম্বন করে বর্তমান আছে আকাশ ও দিবা,
আশ্রিত যার বিশ্বভুবন ও প্রাণীবর্গ
যার প্রভাবে প্রতিদিন প্রবাহিত হচ্ছে জল,
উদয় হচ্ছে সূর্য,
সেই সত্য বাক্যই যেন সকল বিষয়ে রক্ষা করে আমাকে ॥ ২ ॥

সৃষ্টি কর্তা নয়, বিশ্বদেব বা বিশ্বকর্মা নয়, সত্যবাক্যই অভিতপা ঋষির ঈশ্বর। সত্যে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্বভুবন।

এর পর দার্শনিক চিন্তার উপরে কয়েকটি বিখ্যাত সূক্তের অনুবাদ দেওয়া হচ্ছে। প্রথমেই হিরণ্যগর্ভ ঋষির হিরণ্যগর্ভ সূক্ত ঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেয় ঃ কোন্ দেবতাকে আমরা হবি দিয়ে পূজা করব ? এটি ত্রিষ্টুপ ছন্দে রচিত দশম মণ্ডলের ১২১ সূক্ত।

সবার আগে বিদ্যমান ছিলেন শুধু হিরণ্যগর্ভ
জাত মাত্রেই অদ্বিতীয় অধীশ্বর হলেন সর্বভূতের,
স্বস্থানে স্থাপন করলেন পৃথিবী ও আকাশকে,
কোন্ দেবতার পূজা করব আমরা হব্য দিয়ে ? ॥ ১ ॥
যিনি জীবাত্মা দিয়েছেন, দিয়েছেন বল,
যাঁর আজ্ঞা মান্য করে সকল দেবতা,
ছায়া যাঁর অমৃত স্বরূপ ও মৃত্যু যাঁর বশ,
কোন্ দেবতার পূজা করব আমরা হব্য দিয়ে ? ॥ ২ ॥
নিজের মহিমায় যিনি হয়েছেন অদ্বিতীয় রাজা
যাবতীয় দৃষ্টি ও গতি শক্তি যুক্ত জীবের,
প্রভু যিনি সমস্ত দ্বিপদ ও চতুষ্পদের,
কোন্ দেবতার পূজা করব আমরা হব্য দিয়ে ? ॥ ৩ ॥
যাঁর মহিমায় উৎপন্ন হয়েছে হিমাচ্ছন্ন পর্বত,
সসাগরা ধরা যাঁর সৃষ্টি বলে গণ্য,
যাঁর বাহু স্বরূপ সকল দিক বিদিক,
কোন্ দেবতার পূজা করব আমরা হব্য দিয়ে ? ॥ ৪ ॥

যিনি স্থাপন করেছেন দৃঢ় ভাবে
এই আকাশ ও পৃথিবীকে তাদের স্বস্থানে,
স্বর্গ ও নাক লোক স্তম্ভিত করে পরিমান করেছেন অন্তরিক্ষের,
কোন্‌ দেবতার পূজা করব আমরা হব্য দিয়ে ? ॥ ৫ ॥
যাঁর দ্বারা স্তম্ভিত ও উল্লসিত হয়েছিল সশব্দে স্বর্গ ও পৃথিবী,
সেই দীপ্তিশীল যাঁকে মহিমান্বিত বলে বুঝল মনে মনে,
যাঁকে আশ্রয় করে সূর্য হন উদয় ও দীপ্তি যুক্ত,
কোন্‌ দেবতার পূজা করব আমরা হব্য দিয়ে ? ॥ ৬ ॥
বিশ্বভুবন আচ্ছন্ন করেছিল অপরিমিত জল,
তারাই গর্ভ ধারণ করে উৎপন্ন করল অগ্নিকে,
তা থেকেই আবির্ভূত হলেন দেবতাদের একমাত্র প্রাণ ।
কোন্‌ দেবতার পূজা করব আমরা হব্য দিয়ে ? ॥ ৭ ॥
জল যখন অগ্নিকে উৎপন্ন করল বল ধারণ করে,
তখন যিনি নিজ মহিমায় নিরীক্ষণ করেছিলেন জলের উপরে,
তিনিই অদ্বিতীয় হলেন দেবতাদের উপরে ।
কোন্‌ দেবতার পূজা করব আমরা হব্য দিয়ে ? ॥ ৮ ॥
পৃথিবীর জন্মদাতা যিনি, ধারণ ক্ষমতা যাঁর অপ্রতিহত,
যিনি আকাশের জন্ম দিলেন, সৃষ্টি করলেন আনন্দদায়ী জল,
আমাদের যেন হিংসা না করেন তিনি।
কোন্‌ দেবতার পূজা করব আমরা হব্য দিয়ে ? ॥ ৯ ॥
হে প্রজাপতি, আর কেউ আয়ত্তে রাখতে পারে নি
এই সমস্ত উৎপন্ন বস্তুকে ।
আমরা তোমার হোম করছি যে কামনা নিয়ে,
তা যেন সিদ্ধ হয়, আমরা যেন অধিপতি হই ধনের ১০।১২১।১০

কোন্‌ দেবতার পূজা করতে হবে, কার উদ্দেশে হবি আহুতি দিতে হবে যজ্ঞে, সেই প্রশ্ন করছেন হিরণ্যগর্ভ ঋষি এবং যতদূর সম্ভব এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন তিনি। প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভ নামে এক সৃষ্টিকর্তার অনুভব এই সূক্তে প্রকাশ পেয়েছে। সূক্তটি অপক্ষাকৃত আধুনিক বলে অনেকেই মনে করেন।

দশম মণ্ডলের ৯০ সূক্ত পুরুষ সূক্ত নামে বিখ্যাত। এটিও অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রচিত বলে বিশ্বাস করা হয়। এর রচনা কালে ঋক, সাম ও যজুর্বেদের মন্ত্রগুলি পৃথক করা হয়েছিল এবং যে চতুবর্ণের উল্লেখ ঋগ্বেদের আর কোনখানে নেই, তারও উল্লেখ তাছে এই সূক্তে। ঋগ্বেদ রচনার কালে যে আর্য জাতির মধ্যে কোন জাতি ভেদ ছিল না তা

সর্বজন স্বীকৃত। তাই সমাজে এই জাতিভেদ প্রচলিত হবার পরেই পুরুষ সূক্তটি রচিত হয়েছে। ভাষাবিদ পণ্ডিতরা বলেন যে এই সূক্তের ভাষা বৈদিক নয়, সূক্তটি আধুনিক সংস্কৃত ভাষায় রচিত। তবু ঋগ্বেদের অন্তর্ভুক্ত এই সূক্তটির অনুবাদও নিচে দেওয়া হল।

নারায়ণ ঋষি অনুষ্টুপ ও ত্রিষ্টুপ ছন্দে পুরুষ দেবতার স্তব করছেন।—

পুরুষের সহস্র শীর্ষ সহস্রাক্ষ ও সহস্রপাদ।
পৃথিবীকে ব্যপ্ত করে তিনি দশ অঙ্গুলি অতিরিক্ত ॥ ১ ॥
যা হয়েছে বা যা হবে, সবই সেই পুরুষ।
অন্নে অতিরোহণ করেন তিনি, তাই অমরত্বের অধিকারী ॥ ২ ॥
তাঁর এই মহিমা, কিন্তু বৃহত্তর তিনি।
বিশ্ববীজ তাঁর এক পাদ, তিনপাদ আকাশের অমর অংশ ॥ ৩ ॥
তিন পাদ নিয়ে তিনি উপরে উঠলেন, চতুর্থ রইল এ স্থানে।
তারপর তিনি ব্যপ্ত হলেন চেতন ও অচেতন সকল বস্তুতে ॥৪॥
তিনি হতে বিরাট জন্মিলেন, বিরাট হতে সেই পুরুষ।
জন্মেই পৃথিবীকে অতিক্রম করলেন পশ্চাতে ও পুরোভাগে ॥৫॥
পুরুষকে হব্য করে দেবতারা যখন আরম্ভ করলেন যজ্ঞ,
তখন বসন্ত ঘৃত হল, গ্রীষ্ম কাঠ ও শরৎ হল হব্য ॥ ৬ ॥
অগ্রে জাতকে বর্হিতে পূজা দেওয়া হল যজ্ঞীয় পশুরূপে,
তার দ্বারাই যজ্ঞ করলেন দেবতা ঋষি ও সাধ্যগণ ॥ ৭ ॥
সেই হোমযুক্ত যজ্ঞ থেকে উৎপন্ন হল দধি ও ঘৃত।
তিনি নির্মাণ করলেন সে বায়ব্য পশু, বন্য এবং গ্রাম্য ॥ ৮ ॥
সেই হোম সম্বলিত যজ্ঞ থেকে উৎপন্ন হল ঋক ও সাম,
ছন্দ সকল আবির্ভূত হল, জন্মগ্রহণ করল যজুঃ ॥ ৯ ॥
জন্ম নিল ঘোটক দন্ডপংক্তিধারী পশুগণ,
গাভী ছাগ ও মেষও তা থেকে জন্ম নিল ॥ ১০ ॥
খন্ড খন্ড করা হল পুরুষকে, কয় খন্ড করা হয়েছিল ?
এর মুখ কী হল, দুই হস্ত, দুই ঊরু ও দুই চরণ ? ॥ ১১ ॥
এর মুখ হল ব্রাহ্মণ, রাজন্য হল দুই বাহু,
যা ঊরু ছিল তা বৈশ্য হল, দুই চরণ থেকে হল শূদ্র ॥ ১২ ॥
মন হতে চন্দ্র হলেন, চক্ষু হতে সূর্য,
মুখ হতে ইন্দ্র ও অগ্নি, বায়ু প্রাণ হতে ॥ ১৩ ॥
নাভি হতে আকাশ, স্বর্গ মস্তক হতে,
নির্মিত হল চরণ হতে ভূমি, কর্ণ হতে দিক ও ভুবন ॥ ১৪ ॥
যজ্ঞের সময় যখন পুরুষ পশুকে বন্ধন করলেন দেবতারা।

তখন তৈরি হল সাতটি বেদী, যজ্ঞকাঠ হল তিন সপ্ত ॥ ১৫ ॥
দেবতারা যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞ করলেন।
তাই হল প্রথম অনুষ্ঠান ধর্মের।
যে স্বর্গে আছেন প্রধান দেবতা ও সাধ্যেরা,
মহিমান্বিত দেবতারা প্রতিষ্ঠা করলেন সেই স্বর্গধাম ॥ ১০।৯০।১৬ ॥

পণ্ডিতরা বলেন যে বিশ্বজগতের নিয়ন্তাকে বলি স্বরূপ অর্পণ করা, এই অনুভবটি ঋগ্বেদের সময়ের নয়; ঋগ্বেদের আর কোথাও এ রকম কথা পাওয়া যায় না। এ অনেক পরবর্তী কালের অনুভব বলে তাঁরা মনে করেন। সমাজে তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণভেদ হয়ে গেছে এবং বেদও বিভক্ত হয়েছে। অর্থাৎ মহাভারতেরও পরবর্তী কালে এই সূক্তটি রচিত হয়ে ঋগ্বেদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এর পর দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্ত। বাক্ ঋষি পরমাত্মা দেবতার উদ্দেশে সূক্তটি রচনা করেছেন। এটি দেবী সূক্ত নামে পরিচিত। বাক্ যে এই সূক্তের রচয়িতা, সূক্তের মধ্যে তার কোন নিদর্শন নেই। বক্তা নিজেকে সর্বনিয়ন্তা ও সর্ব-নির্মাতা বলে পরিচয় দিয়েছেন। ফলে একমাত্র ঈশ্বরের সঙ্গেই তুলনীয়, অর্থাৎ তিনিই ঈশ্বর। তাই বাগ্‌দেবীকে এই সূক্তের বক্তা বা ঋষি বলে নির্দেশ করা হয়েছে এবং সূক্তটি দেবীসূক্ত নামেই বিখ্যাত। নিচে এর সম্পূর্ণ অনুবাদ দেওয়া হল—

আমি বিচরণ করি রুদ্র ও বসুগণের সঙ্গে,
আমি থাকি আদিত্য ও সকল দেবতার মধ্যে,
আমি ধারণ করি মিত্র ও বরুণ উভয়কে,
আমি অবলম্বন করি ইন্দ্র অগ্নি ও অশ্বীদ্বয়কে ॥ ১ ॥
আঘাতে উৎপন্ন হয় যে অগ্নি,
আমি ধারণ করি তাকে, ত্বষ্টা পূষা ও ভগকেও।
যে যজমান দেবতাদের তুষ্ট করে সামগ্রী ও সোমরসে,
আমিই তাকে দান করি ধন ॥ ২ ॥
রাজ্যের অধিকারী আমি, উপস্থিত করেছি ধন,
আমি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান সম্পন্ন ও যজ্ঞোপযোগী বস্তুর মধ্যে।
দেবতারা আমাকে সন্নিবেশিত করেছেন নানা স্থানে,
বিস্তর আমার আশ্রয়, আবিষ্ট আমি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে ॥৩॥
যিনি ধারণ করেন প্রাণ, দেখেন, শোনেন ও খান অন্ন,
তিনি সে সমস্তই করেন আমারই সহায়তায়।
যারা মানে না আমাকে, ক্ষয় হয়ে যায় তারা।
হে বিদ্বান, শ্রদ্ধার যোগ্য আমার কথা তুমি শোন ॥ ৪ ॥

যাঁর শরণাগত হয় দেবতা ও মানুষেরা,
আমিই উপদেশ দিই তাঁর বিষয়ে।
যাকে ইচ্ছা তাকেই আমি করতে পারি বলবান,
স্তোতা অথবা ঋষি, অথবা বুদ্ধিমান ॥ ৫ ॥
রুদ্র যখন উদ্যত হন বধ করতে স্তোত্রদ্বেষী শত্রুকে,
তখন আমিই বিস্তার করে দিই তাঁর ধনু।
আমিই যুদ্ধ করি লোকের জন্য,
আমিই আবিষ্ট হয়ে আছি দ্যুলোকে ও ভূলোকে ॥ ৬ ॥
আমি পিতা, প্রসব করেছি আকাশকে,
জগতের মস্তক স্বরূপ সেই আকাশ।
সমুদ্রে থাকি জলে, সেখান থেকে আসি ভুবনে,
আপনার উন্নত দেহে স্পর্শ করি দ্যুলোককে ॥ ৭ ॥
আমিই বায়ুর মতো বহমান হই
নির্মাণ করতে করতে সকল ভুবন,
এমন বৃহৎ হয়েছে আমার মহিমা
যে অতিক্রম করেছে দ্যুলোক ও পৃথিবী ॥ ১০।১২৫।৮ ॥

এখন দেখা যায় যে চণ্ডীপাঠের পর এই দেবীসূক্ত পাঠের বিধান হয়েছে। চণ্ডী পাঠ আরম্ভের পূর্বে রাত্রি সূক্তও পাঠ করা হয়। এটি দশম মণ্ডলের ১২৭ সূক্ত, গায়ত্রী ছন্দে কুশিক ঋষি রচনা করেছেন রাত্রি দেবতার উদ্দেশে। এর অনুবাদও যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

এই অধ্যায়টি শেষ করার পূর্বে আর একটি আধুনিক সূক্তের অনুবাদ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। এটি দশম মণ্ডলের ১৭৭ সূক্ত। মায়া দেবতার উদ্দেশে পতঙ্গ ঋষি জগতী ও ত্রিষ্টুপ ছন্দে এই সূক্তটি রচনা করেছেন। নিচে এর অনুবাদ দেওয়া হল।—

বিদ্বানেরা মনে মনে আলোচনা করে
একটি পতঙ্গের দর্শন পান মানস চক্ষে,
দেখেন যে তাকে আক্রমণ করেছে অসুরের মায়া।
পণ্ডিতরা বলেন যে তা ঘটেছে সমুদ্রের মধ্যে,
ওঁরা চান বিধাতার কিরণের ধামে যেতে ॥ ১ ॥
পতঙ্গ মনে মনে ধারণ করেন বাক্যকে,
সে বাক্য গন্ধর্ব তাঁকে শিখিয়েছে গর্ভের মধ্যে,
সে বাণী দিব্যরূপিনী, স্বর্গসুখদায়িনী, বুদ্ধির অধিশ্বরী।
সে বাণীকে সত্যের পথে রক্ষা করেন বিদ্বানেরা ॥ ২ ॥

দেখলাম, এক গোপাল তার পতন নেই কখনও,
নানা পথে ভ্রমণ করছে, কখনও নিকটে, কখনও দূরে।
কখনও অনেক বস্ত্র পরিধান করছে একত্রে,
কখনও পরিধান করছে পৃথক ভাবে।
এই ভাবেই বারবার যাতায়াত করছে বিশ্ব সংসারে ।।১০।১৭৭।৩।।

তিনটি ঋকেই সম্পূর্ণ হয়েছে এই সূক্তটি। এটি জীবাত্মা সম্বন্ধে একটি নূতন কথা। সায়ন বলেন যে জীবাত্মা মায়ায় আচ্ছন্ন, এই চিন্তা জানা যায়। সমুদ্রবৎ পরব্রহ্মের মধ্যেই এই জীবাত্মা বিদ্যমান আছেন, পরমাত্মার ধাম আলোকময়, সেখানে গেলেই মায়া হতে মুক্তি। এই জীবাত্মার মনেই বীজরূপে সকল শব্দ বিদ্যমান থাকে। গন্ধর্ব অর্থাৎ দেবতা তার মনে গর্ভাবস্থায় সে বীজ আধান করে রাখেন। বাক্যের শক্তি অসীম, বুদ্ধিমানগণ বাক্যকে কখনও মিথ্যার দিকে নিয়ে যান না। এই জীবাত্মার ধ্বংস নেই, নানা যোনি ভ্রমণ করেন, কোন জন্মে নানা গুণ ধরেন, কোন জন্মে দুটি একটি ধরেন। নিকৃষ্ট যোনিতে অল্পই গুণ থাকে, উৎকৃষ্ট যোনিতে অনেক গুণ প্রদর্শন করা হয়। উপরের সূক্তে এই ভাবটিই রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে একটি অতি পরিচিত ঋকও আছে প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তে। দীর্ঘতমা ঋষি বলছেন—

দুটি পক্ষী এক বৃক্ষে বাস করে বন্ধু ভাবে,
তাদের মধ্যে একটি ভক্ষণ করে স্বাদু পিপ্পল,
অন্যটি করে না ভক্ষণ, করে শুধু অবলোকন ।। ১।১৬৪।২০।

সায়ন বলেন যে জীবাত্মা কর্মফল ভোগ করেন এবং পরমাত্মা কেবল মাত্র অবলোকন করেন। অন্যে মনে করেন যে দিবারাত্রি বা চন্দ্র সূর্যকেই পক্ষী বলে বর্ণনা করা অসম্ভব নয়।

দশম মণ্ডলের ১১৪ সূক্তে সধ্রি ঋষিও সুপর্ণ অর্থাৎ পক্ষী শব্দটি ব্যবহার করেছেন কতকটা একই ভাব ব্যক্ত করতে। তিনি বলছেন—

পক্ষী একই আছেন,
তাঁকে নানা প্রকারে বর্ণনা করেন বুদ্ধিমান পণ্ডিতেরা।
যজ্ঞের সময়ে তাঁরা উচ্চারণ করেন নানা ছন্দ,
আর সংস্থাপন করেন দ্বাদশ সোমপাত্র ।। ১০।১১৪।৫ ।।

এই পক্ষীকেও সায়ন পরমাত্মা বলেন। পরমাত্মা এক, তাঁকে কল্পনা করা হয় নানারূপে। বলাবাহুল্য যে পণ্ডিতরা এই জটিল সূক্তটিকেও অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের রচনা বলে মনে করেন। অর্থাৎ বৈদিক যুগের একেবারে শেষ দিকে এই ভাবনার উদয় হয়েছিল ঋষিদের মনে।

বৈদিক সাহিত্য কী ?

বেদ শব্দটি এসেছে বিদ্‌ ধাতু থেকে, জানা অর্থে এই ধাতুর ব্যবহার। বলা বাহুল্য যে বেদ নামে কোন গ্রন্থ রচিত হয় নি। কোন এক সময়ে প্রাচীনকালের ঋষিদের রচিত সূক্তগুলির একটি সাধারণ নামকরণের প্রয়োজন দেখা দিলে তার 'বেদ' নাম দেওয়া হয়েছিল। সূক্তগুলি কণ্ঠস্থ করে রাখতে হত বলে একে শ্রুতিও বলা হত। আর্য সমাজের জ্ঞানী মানুষরা যখন একাকী বসে ভাবতে শিখলেন, তখন তাদের মনে নানা রকম ভাবের উদয় হত। প্রকৃতির রূপ দেখে তাঁরা আনন্দ অনুভব করতেন, কল্পনা করতেন নানা বিষয়ের কথা, নিজের কথা এবং সমাজের কথা ভাবতেন, ভাবতেন ভাল মন্দ সুখ দুঃখের কথাও। যা দেখেছেন যা বুঝেছেন বা যা শুনে ভাল লেগেছে তাঁদের, সেই সব কথা ছন্দে বন্ধ করে শিখিয়ে গিয়েছেন উত্তর পুরুষকে। শ্রুতি দিয়ে বংশ পরম্পরায় তাঁরা এই জ্ঞানের কথা ধরে রেখেছিলেন। একদিন এই সব কথারই নাম হয়ে গেল বেদ। বলা হল, বেদ মানুষের রচনা নয়, ভগবান স্বয়ং এই জ্ঞানের কথা সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের দিয়েছিলেন তাঁদের ধ্যানের সময়ে। প্রাচীন কালের এই চিন্তা ভাবনাই নানা ভাবে সংরক্ষিত হয়েছে, কোন এক সময়ে লিপিবদ্ধও হয়েছে। আর্য জাতির দীর্ঘকালের জ্ঞান সাধনার মহৎ ফসলকে এখন আমরা বৈদিক সাহিত্য বলে অভিহিত করি।

বৈদিক যুগের একেবারে গোড়ার দিকের রচনা ঋগ্বেদ নামে গ্রথিত কবিতার সংগ্রহ। একে ধর্মগ্রন্থ বলে মনে করলে ভুল হবে বলে আমি মনে করি। ধর্ম শব্দটির জন্ম তখনও হয় নি। ধর্মের সম্বন্ধে কোন ধারণারই সৃষ্টি হয় নি সে যুগে। মানুষের জীবন যাত্রা ছিল সহজ সরল অনাড়ম্বর। ঋষিরাও অত্যন্ত সহজ ভাবে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করেছেন অকপটে। যা ভেবেছেন, তাই বলেছেন। তাঁদের মনে কোন পাপ ছিল না বলে তাঁরা যা বলে গেছেন, এখন তা ধর্মের কথা বলেই মনে হতে পারে।

অনেক পরবর্তী যুগে সমাজে ভাল মন্দ পাপ পুণ্য বা ধর্ম ও অধর্মের ধারণা জন্মেছিল। তারপর যজ্ঞ নামে এক রকমের উৎসব করার বাসনা যখন জাগল, তখনই দরকার হল স্তব স্তোত্র মন্ত্র ও গানের। সে সব কোথায় পাওয়া যাবে? অমনি মনে পড়ে গেল প্রাচীন ঋষিদের রচিত সূক্তের কথা। হ্যাঁ, আছে। ইন্দ্র অগ্নি সূর্য বরুণ বায়ু—এই রকমের অনেক দেবতার নাম আছে এই সব সূক্তে। তাঁরা দেবতা—কেউ

স্বর্গের, কেউ আকাশের, কেউ বা পৃথিবীর। কেউ তাঁদের দেখে নি, কিন্তু তাঁরা ছিলেন, এখনও হয়তো আছেন। তাঁদের নিমন্ত্রণ করতে হবে, যজ্ঞে আহ্বান করতে হবে, যজ্ঞের ভাগ দিতে হবে। যদি না আসেন তাঁরা? তবে তাদের অংশ দিতে হবে। কোথায়, কাকে দিতে হবে তাঁদের অংশ? অগ্নিকে, তিনিই যজ্ঞের পুরোহিত। তাঁকে হবি দিলে তিনি প্রজ্বলিত হয়ে সমস্ত দেবতাদের জন্যে সেই হবি গ্রহণ করবেন, অগ্নি শিখায় ও ধূমে বহন করে নিয়ে যাবেন উপরে আকাশ থেকে স্বর্গে।

বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি গায়ত্রী ছন্দে অগ্নি দেবতার স্তব করলেন ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তে—

অগ্নিই যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান,
তিনিই দেবতা আহ্বানকারী ঋত্বিক ও রত্নধারী।
অগ্নির স্তব করছি আমি।
পুরাতন ঋষিদের স্তুতিভাজন ছিলেন তিনি,
নূতন ঋষিদেরও তিনি স্তুতিভাজন।
তিনিই দেবতাদের এই যজ্ঞে আনুন ॥ ১।১।১-২ ॥

এইখান থেকেই শুরু হল বৈদিক সাহিত্যের প্রসার। যজ্ঞের সময় কোন্ মন্ত্রগুলি পাঠ করা হবে তা আলাদা করা হল, সুর যোজনা করে গান গাইবার মন্ত্রগুলিও আলাদা করা হল। গানের সুর নির্দিষ্ট করবার জন্য সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যবহার আরম্ভ হল। তার পর যজ্ঞ ক্রিয়ার জন্য বিধি নিষেধ রচিত হল। সে সবের নাম ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণও বেদেরই অন্তর্ভুক্ত।

বেদ শব্দে শুধু জ্ঞানই বোঝায় না, ত্রয়ী বিদ্যাও বোঝায়। অমরকোষের মতে এর পর্যায় তিনটি—শ্রুতি বেদ আম্নায়। উপদেশ দেয় এই অর্থে আম্নায়। গদ্য পদ্য ও গানে বেদ রচনা হয়েছে বলে এর ত্রয়ী নাম। পদ্যাংশ ঋক্, গদ্যাংশ যজু ও গানের অংশ সাম নামে অভিহিত হয়েছে। এই নাম তিনটি বৈদিক রচনা প্রণালীর নাম এবং এই ভাবেই বেদের মন্ত্রগুলি সংহিতা রূপে সঙ্কলিত হয়েছিল। এই অর্থে বেদের ব্রাহ্মণ ভাগকে ত্রয়ী বলা যায় না। ব্যবহারিক অর্থে ব্রাহ্মণকেও ত্রয়ী বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে বেদের মন্ত্র ভাগই ত্রয়ী, শ্রুতি বা আম্নায়।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুয়ে মিলে বেদ। যা বিনিয়োগের বিষয় তা মন্ত্র এবং যা বিধি ও স্তুতিকর তা ব্রাহ্মণ। বিনিয়োগের মন্ত্র ত্রিবিধ—যা পদবদ্ধ তা ঋক, গীতময় অংশ সাম ও গদ্যাংশ যজুঃ। বর্তমান বিভাগের

মূল প্রণালী হল যাতে পদ্যাংশ বেশি তা ঋক, যাতে গানের অংশ বেশি তা সাম এবং যাতে গদ্যাংশ বেশি তা যজুর্বেদ নামে অভিহিত।

শুক্ল যজুর্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখায় বেদ শব্দের উল্লেখ দেখা যায় ॥ ১৯।৭৮ ॥ তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও বেদ শব্দ পাওয়া যায় ॥ ৫।১১।২ ॥ আবার অথর্ব সংহিতাতেও বেদ শব্দের ব্যবহার আছে ॥ ৪।৭।৫৬ ॥ এই সব স্থানে ত্রয়ী অর্থেই বেদ শব্দের ব্যবহার। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতেও ত্রয়ী অর্থে বেদ শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। এর পর যখন আপস্তম্ব প্রভৃতি সূত্র রচনা আরম্ভ হয়, তখন দেখা যায় যে ব্রাহ্মণ গ্রন্থ গুলিকেও বেদ বলা হচ্ছে। অর্থাৎ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ দুইই বেদ।

শ্রুতি শব্দটি বেদেরই নামান্তর। যা পুরুষানুক্রমে শ্রুত হয়ে আসছে তাই শ্রুতি। সমাজে তখনও বর্ণমালা বা লিপির প্রচলন হয় নি। কিছু লিখে রাখার কথা হয়তো ভাবাই যেত না। যা জানবার বা শেখবার তা শুনেই শিখতে বা জানতে হত। তাই গুরুগৃহে বাস ছিল অপরিহার্য। শিক্ষা আরম্ভ করবার একটা নির্দিষ্ট বয়স ছিল। সেই বয়সে গুরুর নিকটে গিয়ে অধ্যয়ন আরম্ভ করতে হত। গুরুরা নিজেরা যা শুনে শিখতেন তাই শেখাতেন নিজের শিষ্যদের। এই শিষ্যদের মধ্যেই কেউ আবার গুরু হয়ে বসতেন। এই শুনে শিক্ষার নামই শ্রুতি। আর শোনবার বিষয় ছিল একটিই—বেদেরই সূক্ত গুলি। আর কিছু শেখবার বা জানবার ছিল না। নূতন সূক্ত রচিত হত, আর গুরুরা সে সব শিখে শিষ্যদের শেখাতেন। সূক্তগুলি কত দিন আগে থেকে রচিত হয়ে আসছে তা—কেউ জানতেন না, জানাবার চেষ্টাও বোধহয় করতেন না। কালের হিসাব রাখাও সে যুগে বোধহয় একটা বড় সমস্যা ছিল। তাই তাঁরা বলতেন, বেদ অনাদি, বেদ অপৌরুষেয়। বেদ পাওয়া গিয়াছিল সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্মার মুখ থেকে, তার পরেই বংশ পরম্পরায় বা গুরু পরম্পরায় তা শ্রুতি রূপে চলে আসছে। এর উৎপত্তির বিষয়ে আর কোন প্রশ্ন করা চলবে না, এ কথা বিশ্বাস না করলে নাস্তিক বলা হবে।

এই শ্রুতি শব্দটি কত প্রাচীন তা সঠিক জানা যায় না। কোন মন্ত্রে এই শব্দের প্রয়োগ নেই। বোধহয় মনু সংহিতাতেই প্রথম এই শব্দটি বেদ অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় ॥ ২।৯-১০, ২।১৫ ॥ লৌকিক প্রবাদকেও শ্রুতি বলে।

বেদ বাচক আর একটি শব্দ আম্নায়। সমাম্নায় এর একটি প্রতিশব্দ। অম্নায় ও সমাম্নায় এই দুটি শব্দেই বেদকে বোঝায়। জৈমিনীর মীমাংসা দর্শনে বেদ অর্থে আম্নায় শব্দের প্রয়োগ আছে। আম্নায় যে বেদ তা বাজসনেয় সংহিতার প্রতিশাখ্য সূত্রের ব্যাখ্যায়

পাওয়া যায়। অথর্ব বেদের কৌশিক সূত্রে বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণকে আম্নায় বলা হয়েছে। নিরুক্তকার বেদাঙ্গকেও আম্নায় বলেছেন ॥ ১।৬।৫॥ অনেকে বলেন যে অভ্যাস অর্থে ম্না ধাতু থেকে আম্নায় শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। বার বার উচ্চারণ করে তা স্মরণ রাখার চেষ্টাকেই অভ্যাস বলে। এই অর্থে বেদ অভ্যাসকে আম্নায় ও সাঙ্গ বেদ অভ্যাসকে সাম্নায় বলা হয়। এই ভাবেই এই শব্দের ব্যাপ্তি হয়েছিল।

বৈদিক সাহিত্যের কাল বিভাগ করা হয় পাঁচ রকমে—প্রথম মন্ত্রের কাল, দ্বিতীয় যজ্ঞাদিতে মন্ত্র ব্যবহারের কাল, তৃতীয় এই প্রবাদের শ্রুতি কাল, চতুর্থ গাথার কাল এবং পঞ্চম ব্রাহ্মণের কাল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেই এই কাল বিভাগের আভাষ পাওয়া যায় ॥ ৭।৪।৮ ॥ কিন্তু এই সব কালের পরিমান জানা এখন আর সম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গে বেদের আরও কয়েকটি প্রাচীন নামের উল্লেখ করা যেতে পারে। বেদকে এক সময়ে ছন্দ বলা হত। এর সর্ব প্রথম উল্লেখ অথর্ব-বেদ সংহিতায় ॥ ১৮।১।২।৭ ॥ এখানে ছন্দের মানে জগৎ বন্ধন এবং বন্ধন অর্থে ছাদন বা ছন্দ। অতি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বিষয় বন্ধন ও পৃথিবী প্রভৃতি অর্থেই ছন্দ শব্দের ব্যবহার হত। তাঁর পর ছন্দ শব্দে অক্ষর বোঝাত। ছন্দ শব্দে মন্ত্রও বোঝায়। কিন্তু অনেক জায়গায় সামবেদীয় চর্চাকেই ছন্দ বলা হয়েছে ॥ অথর্ব বেদ ॥ ১১।৪।২।৫ ॥ সামবেদ সংহিতা গান ও ছন্দ এই দুভাগে বিভক্ত। গানেরও চারটি শ্রেণী আছে—গেয় আরণ্যক উহ ও উহ্য। ছন্দের যোনি ও উত্তরা এই দুই ভাগ। উভয়কেই আর্চিক বলে।

স্বাধ্যায়ও বেদের একটি নাম। বেদাধ্যয়ন ব্রাহ্মণদের অবশ্য কর্তব্য বলে বেদের নামই স্বাধ্যায় হয়েছে। শ্রুতি ও স্মৃতি গ্রন্থে স্বাধ্যায় শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

আগম ও নিগমও বেদের নামান্তর। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে বেদ অর্থে আগম শব্দের ব্যবহার আছে। নিগম শব্দ তো বেদেই পাওয়া যায় ॥ ঋগ্বেদ ২।১।৩, ৮।১৬।২ ॥

এখন আমরা একমাত্র বেদ শব্দটিই বেশি ব্যবহার করি। ধর্মশাস্ত্র অর্থাৎ স্মৃতি গ্রন্থে শ্রুতি ও স্বাধ্যায় শব্দেরও ব্যবহার আছে। এ ছাড়া আম্নায় সমাম্নায় ছন্দ আগম ও নিগম শব্দের ব্যবহার এক সময়ে থাকলেও এ কালে এই নামগুলি অপ্রচলিত হয়ে গেছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে পদ্য গদ্য ও গান এই তিন রচনা রীতি অনুসারে ঋগ্বেদ যজুর্বেদ ও সামবেদ সংহিতা সঙ্কলিত হয়েছিল। এ কথাও অনুমান করা হয়েছে যে এই ত্রয়ী ভিন্ন অন্য কোন বেদ সে সময়ে

প্রচলিত হয় নি। অর্থাৎ অনেকেরই মতে অথর্ব বেদ অনেক পরবর্তী-কালের সংকলন। কিন্তু এই মত অনেকেই মানেন না। তাঁরা বলেন যে অথর্ব বেদও সমান প্রাচীন। যে অথর্ব ঋষির নামে এই বেদের নামকরণ হয়েছে, তিনি অতি প্রাচীন কালের ঋষি। অথর্ব ঋষির হাতেই অগ্নির জন্ম, তিনিই যজ্ঞের আবিষ্কর্তা এবং যজ্ঞ ক্রিয়ার সূত্রপাত করেন। এই সময়েই যে যজ্ঞ কার্যের সৌকর্যের জন্য বেদ বিভাগের প্রয়োজন হয়, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ঋক্ দিয়ে হোত্র, যজুঃ দিয়ে অধ্বর্যু এবং সাম দিয়ে উদ্গাথ ক্রিয়ার বিধান হয়। অথর্ব বেদে হোতা অধ্বর্যু ও উদ্গাতার ব্যবহারের উপযোগী মন্ত্র ছাড়াও অনেক ঋক্ ও যজুমন্ত্র আছে। অথর্ব বেদীই ব্রহ্মা হয়ে থাকেন এবং যজ্ঞ রক্ষা করেন তিনিই। কেন জানি না আমার মনে হয় যে এই অথর্ব বেদ সর্ব সাধারণের অধিগম্য ছিল না, কোন বিশেষ স্থানে বিশেষ ব্যক্তির কুক্ষিগত ছিল। তাই দীর্ঘ দিন ত্রয়ী বলতে ঋক, যজুঃ ও সামবেদই বোঝাত, অথর্ববেদ এর বহিভূর্ত ছিল। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ যখন বেদ বিভাগ করেন তখনও হয়তো অথর্ববেদ তাঁর হস্তগত হয় নি, কিংবা সেটি বিভাগ করবার প্রয়োজন হয় নি।

বেদ বিভাগ মানে নিশ্চয়ই পদ্য গদ্য ও গান অনুসারে বিভাগ নয়, যজ্ঞের হোত্রাদি কাজ অনুসারেই বিভাগ। বেদের যে সব সূক্ত বিনিয়োগের যোগ্য তা মন্ত্র এবং যাতে যজ্ঞের বিধান আছে তা ব্রাহ্মণ, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। এরই ফলে বেদ চার ভাগে বিভক্ত হয়। হোতা অধ্বর্যু উদ্গাতা ও ব্রহ্মা এই চার জন যজ্ঞের পুরোহিত। হোতা যে মন্ত্র ব্যবহার করবেন তার সমস্তই ঋক; এই মন্ত্রগুলি একত্র করেই ঋক সংহিতা হয়েছে। ঋক ব্রাহ্মণে ঋক মন্ত্রেরই বিনিয়োগের কথা। অধ্বর্যু যে সব মন্ত্র ব্যবহার করেন তার অধিকাংশই যজুঃ, কিছু ঋক্‌ও আছে। এই সব যজুঃ ও ঋক্ মন্ত্র যজুঃ সংহিতায় সঙ্কলিত হয়েছে, বিনিয়োগের বিধান যজুর্ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। এই উভয় গ্রন্থকে একত্রে যজুর্বেদ বলা হয়। এইভাবে উদ্গাতার ব্যবহার্য মন্ত্র ঋক্ যজুঃ ও সাম সাম-সংহিতায় এক সঙ্গে সঙ্কলিত হয়েছে। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ একত্র করে নাম হয়েছ সামবেদ সংহিতা।

যাঁরা ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করান এবং ঋগ্বেদের কার্য করেন, তাঁরা ঋগ্বেদী। যাঁরা যজুর্বেদ অধ্যয়ন করান ও যজুর্বেদ মন্ত্রে কার্য করেন তাঁরা যজুর্বেদী এবং যাঁরা সামবেদ অধ্যয়ন করান ও সামবেদের কার্য করেন তাঁরা সামবেদী। যজুর্বেদে ঋক ও যজুর্বেদের মন্ত্র আছে বলে যজুর্বেদীরা দ্বিবেদী বা দুবে নামে অভিহিত এবং

সামবেদে তিনবেদের মন্ত্র আছে বলে সামবেদীরা ত্রিবেদী বা ত্রিপাঠী নামে পরিচিত।

অবশিষ্ট মন্ত্রগুলি অথর্ববেদ সংহিতায় সঙ্কলিত হয়েছে। এতে ঋক ও যজুঃ উভয়ই আছে। অর্থব মন্ত্রের প্রয়োগ ও অভিধায়ক গ্রন্থের নাম অথর্ব ব্রাহ্মণ। দুয়ে মিলে অথর্ববেদ সংহিতা। যজ্ঞের ব্রহ্মত্ব কার্যে অথর্ব মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের জ্ঞান থাকা দরকার। হোতার কাজে যেমন ঋগ্বেদের জ্ঞান, অধ্বর্যুর কাজে যজুর্বেদের জ্ঞান ও উদ্‌গাতার কাজে সামবেদের জ্ঞান প্রয়োজন, তেমনি ব্রহ্মার কাজে অথর্ববেদের জ্ঞান অপরিহার্য। এইজন্য অথর্ববেদকে ব্রহ্ম বেদ বলা হয় এবং যাঁরা অথর্ব বেদ অধ্যয়ন করেন তাঁরা চতুর্বেদী বা চোবে নামে পরিচিত।

সায়ন চার বেদের কথাই বলেছেন এবং নানা প্রমাণ উদ্ধৃত করে অনেকে বলেন যে ত্রয়ী বলতে শুধু ঋক, সাম ও যজুর্বেদই বোঝায় না এই শব্দে অথর্ববেদও বোঝায়। ত্রয়ী শব্দে তিন বেদ নয়, চার বেদেরই রচনা রীতি অর্থাৎ পদ্য গদ্য ও গান এই তিন রীতির কথা বোঝায়। তাই বেদব্যাসের বেদ বিভাগের সময় তিন বেদ ছিল এবং অথর্ব বেদ পরবর্তী কালের রচনা এ কথাও ঠিক নয়। তাঁদের মতে প্রথম থেকেই চার বেদেরই অস্তিত্ব ছিল।

এই নিয়ে বাদানুবাদের প্রয়োজন আর নেই। এখন বেদ বলতে চার বেদই বোঝায় এবং বৈদিক সাহিত্য বলতে বেদাঙ্গ প্রভৃতি আরও অনেক কিছুই বোঝায়। এই অধ্যায়ে আমরা একে একে সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের কথাই সংক্ষেপে আলোচনা করতে পারি।

একটা কথা সহজেই অনুমান করা যায়। বেদের পাঠ মুখে মুখেই চলে আসছিল দীর্ঘ দিন ধরে। দেশ কাল ও আচার্যদের উচ্চারণ ভেদে পাঠেরও নানা ভেদ হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রয়োগের ভেদও হয়েছে একই কারণে। আমরা তাই বেদের সংহিতাগুলি বহু শাখায় বিভক্ত দেখতে পাই। শোনা যায় যে ঋগ্বেদের একুশটি শাখা, যজুর্বেদের একশো ও সাম বেদের সহস্র শাখা। অথর্ব বেদের শাখা নটি, কারও মতে পনেরটি। ঋগ্বেদের শাকল বাস্কল আশ্বলায়ন সাংখ্যায়ন ও মাণ্ডুক এই পাঁচটি শাখাই প্রাধান। এঁরা ঋষি ছিলেন না, এঁরা ছিলেন আচার্যদের মধ্যে প্রধান। শাকলই প্রথম আচার্য বলে স্বীকৃত। এ ছাড়াও ঐতরেয় কৌষীতক প্রভৃতি যে সব শাখা আছে, তা প্রধান শাখা নয়। প্রাতিশাখ্য মতে সে সব উপশাখা। যজুর্বেদেরও বহু শাখার নাম পাওয়া যায়। কিন্তু সামবেদের সহস্র শাখা আর নেই। পুরাণে আছে যে ইন্দ্র বজ্রাঘাতে

সে সব ধ্বংস করেছিলেন। কৌথুম প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র শাখা অবশিষ্ট আছে। বাঙলায় সামবেদের শুধু কৌথুম শাখাই প্রচলিত। অথর্ব বেদের নয়টি শাখারই নাম পাওয়া যায়। কিন্তু সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

বেদের এতগুলি শাখা কী ভাবে হল, সে সম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। ব্রহ্মার আদেশে পরাশরের পুত্র ব্যাস বেদ বিভাগ করবার জন্য চার জন শিষ্য নিয়েছিলেন। তিনি পৈলকে ঋগ্বেদের, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদের, জৈমিনীকে সামবেদের ও সমন্তুকে অথর্ববেদের কর্তা রূপে নিযুক্ত করেন। এই চার জনের শিষ্য প্রশিষ্যরা চার বেদকে নানা শাখায় বিভক্ত করেন। কিন্তু প্রত্যেক শাখার ব্রাহ্মণ গ্রন্থ ভিন্ন নয়, আবার সমস্ত শাখার ব্রাহ্মণ গ্রন্থ একখানিও নয়। যেমন ঋগ্বেদের বাস্কল আশ্বলায়ন প্রভৃতি পাঁচটি শাখার ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় এবং কৌষীতকী বাকি ষোলটি শাখার ব্রাহ্মণ। কৌষীতকীর অপর নাম সাঙ্খায়ন বা শাঙখায়ন। যজুর্বেদের ঊনিশটি শাখার ব্রাহ্মণ মৈত্রায়ণী। একে অধ্বর্যু ব্রাহ্মণও বলে। বাজসনেয় প্রভৃতি সতেরটি শাখার ব্রাহ্মণ শতপথ। তৈত্তিরীয় প্রভৃতি ছয়টি শাখার জন্য তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। এখন সামবেদের কৌথুম জৈমিনী ও রাণায়ণীয় এই তিনটি মাত্র শাখাই অধ্যয়ন করা হয় এবং ছান্দোগ্য এই তিনটি শাখারই ব্রাহ্মণ। সামবেদের আরও আটখানি ব্রাহ্মণের নাম শোনা যায়, তাদের মধ্যে তলবকার ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ সুপরিচিত। অথর্ব বেদের গোপথ ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সব ব্রাহ্মণ লুপ্ত হয়েছে বলে মনে করা হয়।

আরণ্যক বেদের অন্তর্গত ব্রাহ্মণের অংশ বলে স্বীকৃত হলেও অনেকেই আরণ্যককে বেদের অন্তর্ভুক্ত বলে মানতে রাজী নন। এর একটি কারণ এই যে বিদেশী পণ্ডিতরা আরণ্যককে অনেক আধুনিক কালের রচনা বলে মনে করেন এবং এই জন্যই বেদের সঙ্গে সম্পর্ক মানতে চান না। দ্বিতীয় কারণ এই যে পাণিনির গ্রন্থে আরণ্যকের উল্লেখ নেই বলে একে পরবর্তী কালের রচনা বলে মনে করেন। এই সব যুক্তি ঠিক বলে মনে হয় না। বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করলেই দেখা যাবে যে বেদের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বেদের মন্ত্র ও স্তোত্রের সংকলনকে যেমন সংহিতা বলে, তেমনি সেই সব মন্ত্র ও স্তোত্র ব্যবহারের জন্য বিশাল গদ্য সাহিত্যের নাম ব্রাহ্মণ। এই সব বিধিনিষেধ গৃহস্থ আশ্রমের জন্য। তখন বানপ্রস্থ আশ্রমে যাবার নিয়ম ছিল। তাই অরণ্যে আচরণীয় বিধিনিষেধ আরণ্যকের অন্তর্গত হয়েছিল। এর দুটি দিক আছে—এক, যাঁরা গৃহত্যাগ করে বনে এসেছেন তাঁরা যাগযজ্ঞে বিরত হয়ে কী ভাবে ধর্ম-

জীবন যাপন করবেন তারই নির্দেশ এবং দুই, গৃহস্থাশ্রমে যে সব গুরু-তত্ত্বের আলোচনা সম্ভব নয় এবং অরণ্যের মতো নির্জন পরিবেশেই তা করা সম্ভব, সেই চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়েছে আরণ্যকে। আরণ্যক গৃহীর জন্য নয়, এই গ্রন্থ অধ্যয়নের উপযুক্ত স্থান অরণ্য। অরণ্যেই গুরু শিষ্যকে নূতন ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করবেন, নির্দিষ্ট পথে চলবার পর শিষ্য নূতন পথের সন্ধানে প্রবৃত্ত হবেন। তার পরই আসবে উপনিষদ, বিশাল বৈদিক সাহিত্যের চতুর্থ পদক্ষেপ এবং সুচিন্তিত জ্ঞানের পরিপক্ক ফসল।

বেদের সংহিতা অংশের সঙ্গে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের পার্থক্য বেশ স্পষ্ট হলেও ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষদের মধ্যে ব্যবধান এমন যে তা সব সময় স্পষ্ট নয় এবং কোন গণ্ডি টেনে তা ভাগ করাও সম্ভব নয়। বৈদিক সাহিত্যের নিয়ম অনুসারে ব্রাহ্মণের অংশ আরণ্যক এবং উপনিষদগুলি আরণ্যকের অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে বিষয়বস্তুর পার্থক্য থাকলেও ভাবের একটি ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি বেদ সংহিতার সঙ্গে তার ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সংযুক্ত এবং ব্রাহ্মণের সঙ্গে আরণ্যক ও উপনিষদ গুলিও যেন একই সূত্রে গ্রথিত। এদের বিচ্ছিন্ন করে দেখার উপায় নেই, সংহিতা ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষদ নিয়েই একটি বেদ তার সামগ্রিক রূপ লাভ করেছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। বৈদিক সাহিত্যের এই চারটি অঙ্গ থেকে আমরা দুটি ধারার উদ্ভব হতে দেখি। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির মূল বিষয়বস্তু হল বৈদিক মন্ত্রে যাগযজ্ঞ বা কর্ম এবং উপনিষদ গ্রন্থ গুলির প্রধান বিষয়বস্তু দার্শনিক চিন্তা বা জ্ঞান। আরণ্যকগুলি এই কর্ম ও জ্ঞানের মধ্যে একটি সেতু রচনা করে আছে। আরণ্যকে আমরা কর্ম ও জ্ঞান এই দুই বিষয়ের কথাই পাই, ব্রাহ্মণের কর্মকাণ্ডের জের টেনে এনে উপনিষদের চিন্তা ধারার সূচনা করে। তবে বৈদিক সাহিত্যে আরণ্যক তেমন প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ পায় নি। তার কারণ দার্শনিক ঋষিরা কর্মকাণ্ড ত্যাগ করে খুব তাড়াতাড়ি জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করেছেন এবং আরণ্যকের অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে উপনিষদ চর্চাতেই গভীর ভাবে মনোনিবেশ করেছেন।

উপনিষৎ শব্দটির উৎপত্তি গমন অর্থে, এর মানে নিকটে গমন অর্থাৎ যার দ্বারা ব্রহ্মের নিকটে যাওয়া যায় তারই নাম উপনিষৎ। প্রাচীন আচার্যরা এই শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের ব্যাখ্যা করেছেন—ব্রহ্মবিদ্যার নিকটে উপস্থিত হয়ে নিশ্চয়ের সঙ্গে অনুশীলন করলে অবিদ্যার বিনাশ হয় বলেই ব্রহ্মবিদ্যার নাম উপনিষৎ। উপনিষদ শব্দের সঙ্গে আর

কয়েকটি শব্দের তুলনা করা যেতে পারে। লোকে এক সঙ্গে বসলে তাকে সম্ সদ বা সংসদ বলে, চারি দিকে বসলে পরি সদ্ বা পরিষদ বলে। উপনিষদ শব্দটিও একই ভাবে এসেছে। শিষ্যরা গুরুর নিকটে উপস্থিত হয়ে বৈঠকে বসতেন বলেই উপনিষদ এবং এই বৈঠকে ব্রহ্ম-বিদ্যার আলোচনা হত বলে ব্রহ্মবিদ্যাকেও উপনিষদ বলা হত।

উপনিষদের অন্য নাম বেদান্ত। বেদের অন্ত অর্থাৎ শেষ ভাগ বলেই এই নাম। উপনিষদের ভাব অবলম্বন করে যে দার্শনিক মত প্রচারিত হয়, তার নামও বেদান্ত বা বেদান্ত দর্শন। তাই উপনিষদ অর্থে বেদান্ত শব্দটির ব্যবহার এখন আর বিশেষ প্রচলিত নয়।

অনেকে ব্রাহ্মণ শব্দটিরও একটি ব্যুৎপত্তি গত অর্থ আছে বলে মনে করেন। ব্রহ্ম বা ব্রহ্মণ শব্দের অর্থও বেদ এবং ব্রহ্মণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলেই ব্রাহ্মণ বলা হয়। ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ ঐতরেয় কৌষীতকী, সামবেদের ব্রাহ্মণ পঞ্চবিংশ বা তাণ্ড্য, ষড়বিংশ ও জৈমিনীয়। যজুর্বেদের কৃষ্ণ ও শুক্ল এই দুটি ভাগ আছে। কৃষ্ণ যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ কঠ ও তৈত্তিরীয়, শুক্ল যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ শতপথ এবং অথর্ব বেদের ব্রাহ্মণ গোপথ।

এই ভাবে ঋগ্বেদের দুটি ব্রাহ্মণের একই নামে দুটি আরণ্যক আছে, কৃষ্ণ ও শুক্ল যজুর্বেদেরও তাই। সামবেদের আরণ্যকের নাম আরণ্যক সংহিতা, আরণ্যক গান ও জৈমিনীর উপনিষদ ব্রাহ্মণ। অথর্ব বেদের কোন আরণ্যক নেই। অনেক উপনিষদ আরণ্যকেরই অন্তর্গত এবং অরণ্যেই রচিত। সমস্ত উপনিষদই যে আরণ্যকের অন্তর্গত তা নয়। সব চেয়ে বড় ব্যতিক্রম হল ঈশ বা ঈশা উপনিষদ। এটি মূল শুক্ল যজুর্বেদেরই চল্লিশতম অর্থাৎ সর্বশেষ অধ্যায়। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে মূল বেদেই দার্শনিক চিন্তার নিদর্শন আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদও শুক্ল যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ শতপথের শেষ চতুর্দশ খণ্ড।

সাধারণ ভাবে বৈদিক উপনিষদ বারোখানি বলে স্বীকৃত। এগুলি হল ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয় ও কৌষীতকী, সামবেদের কেন ও ছান্দোগ্য, কৃষ্ণ যজুর্বেদের কঠ তৈত্তিরীয় ও শ্বেতাশ্বতর, শুক্ল যজুর্বেদের ঈশ ও বৃহদারণ্যক এবং অথর্ব বেদের প্রশ্ন মুণ্ড ও মাণ্ডুক্য। অনেকে মৈত্রী বা মৈত্রায়ণীয় উপনিষদকে কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্গত বলে মনে করেন। কিন্তু এই উপনিষদখানি তেমন প্রচলিত নয়। উপনিষদের সংখ্যা অসংখ্য, কিন্তু সেগুলি বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত নয় বলেই সকলে স্বীকার করেন।

কিন্তু এখানেই বৈদিক সাহিত্যের শেষ নয়। বেদ পাঠ ও যাগ-

যজ্ঞে সাহায্য করবার জন্য যে শাস্ত্র রচিত হয়েছিল, তার নাম বেদাঙ্গ। ব্যবহারিক প্রয়োজনে রচিত বেদাঙ্গও বেদের পরিপূরক গ্রন্থ। বেদের অঙ্গ বলেই বেদাঙ্গ। শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও কল্প এই ছয়টি বেদাঙ্গ। বেদকে যদি শরীর মনে করা যায় তো তাকে যথাযথ ভাবে জানতে হলে উপরোক্ত ছয়টি বেদাঙ্গকে আগে জানতে হবে। কাজেই বেদাঙ্গ বৈদিক সাহিত্যেরই অঙ্গ। মুণ্ডক উপনিষদে আছে, ব্রহ্মবিদ্‌রা বলেন যে অপরা ও পরা এই দুই বিদ্যাই আয়ত্ত করতে হবে। ঋক সাম যজুঃ ও অথর্ব বেদ এবং শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গকে অপরা বিদ্যা বলে এবং যে বিদ্যায় অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায় তার নাম পরা বিদ্যা ॥ ১।১।৪-৫ ॥ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ সংহিতার আকারে গ্রথিত হবার পর ষড়ঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই ষড়ঙ্গের পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া হচ্ছে।

প্রথমে শিক্ষার কথা। এই গ্রন্থে স্বর বিজ্ঞানের বিষয়ে আলোচনা। বৈদিক মন্ত্র কী ভাবে উচ্চারণ করতে হবে, তারই বিবরণ দেওয়া হয়েছে শিক্ষায়। উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিন স্বরে বৈদিক মন্ত্র গান করা হত। বেদের সূক্তগুলিতে স্বর যোজনার পদ্ধতি দেখে মনে হয় যে উচ্চারণের বা স্বরের বিভিন্নতায় যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান সিদ্ধ বা অসিদ্ধ বলে মনে করা হত। এ কালের সঙ্গীত যে সপ্ত স্বরের ব্যবহার, বৈদিক যুগে তা ছিল না। উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিনটি স্বরেই বৈদিক মন্ত্র গান করতে হত। উদাত্ত হল উচ্চ স্বর, মৃদু স্বর অনুদাত্ত এবং এই দুই স্বরের মাঝে কোমল ও কঠোরে মিশ্রিত স্বরের নাম স্বরিত। অনেকে অনুমান করেন যে এ কালের উদারা মুদারা ও তারা এই তিন রকম উচ্চারণ স্থানের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য ছিল। রোদন বা আহ্বানের সময়ে যে স্বর ব্যক্ত হয় তার নাম এক শ্রুতি স্বর। উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরের মিশ্রণে এর উৎপত্তি। বর্তমানে প্রচলিত সপ্ত স্বর যে সেকালের তিনটি স্বর থেকেই উৎপন্ন হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। শিক্ষাগ্রন্থে এই স্বর বিজ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যাবে। উদাত্ত থেকে নিষাদ ও গান্ধার, অনুদাত্ত থেকে ঋষভ ও ধৈবত এবং স্বরিত থেকে ষড়জ মধ্যম ও পঞ্চম স্বর উৎপন্ন হয়েছে। লিপি আবিষ্কারের পর তিন স্বরের উচ্চারণ ভেদ বোঝাবার জন্য বৈদিক গ্রন্থে বর্ণের উপরে ও নিচে তিন রকমের পরিচয় চিহ্ন ব্যবহৃত হত। এই চিহ্ন দেখে বুঝতে হত ঋকের কোন্ অংশ কী রকম স্বরে উচ্চারণ করতে হবে। উদাত্ত স্বর বোঝাতে হলে বর্ণের উপরে একটা দাঁড়ি চিহ্ন দিতে হত, আর এই রকমের দাঁড়ি চিহ্ন বর্ণের নিচে থাকলে তা অনুদাত্ত স্বর বুঝতে হত। স্বরিত স্বর

বোঝাতে হত শব্দের নিচে শায়িত রেখা টেনে। বৈদিক যুগেও এ দেশ যে স্বর বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, শিক্ষা গ্রন্থে তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক থেকেই এই শিক্ষা গ্রন্থগুলি সংকলিত হয়েছিল। সব বেদেরই সমস্ত শাখার উচ্চারণের জন্য শিক্ষা গ্রন্থের প্রচলন ছিল এবং তা প্রতিশাখা বা প্রতিশাখ্য নামে অভিহিত হত। সবগুলি পাওয়া না গেলেও তিন বেদের তিনটি প্রতিশাখা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের প্রতিশাখা সনকের রচিত। কাত্যায়ন শুক্ল-যজুর্বেদের যে প্রতিশাখা প্রণয়ন করেছিলেন, তা এখন লুপ্ত। কোন বাল্মীকির নামে কৃষ্ণ যজুর্বেদের একখানা প্রতিশাখা প্রচলিত হয়েছিল। অথর্ব বেদের প্রতিশাখাও এখন প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। সামবেদের প্রতিশাখা আর পাওয়া যায় না।

শিক্ষা বা স্বর বিজ্ঞানের পর ছন্দ। ছন্দের জ্ঞান না হলে বেদাধ্যায়ন বা যজ্ঞ কর্ম সঠিক ভাবে সম্ভব নয়। তাই ছন্দের গ্রন্থ বেদাঙ্গেয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আজও আমরা মানি যে ছন্দ জ্ঞান না থাকলে কাব্য পাঠে রসবোধ হয় না, অর্থবোধও ব্যাহত হয়। কিন্তু বেদে বেশি ছন্দের ব্যবহার নেই। গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুভ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ ও জগতী এই সাতটি ছন্দই ঘুরে ফিরে ব্যবহৃত হয়েছে। চব্বিশ অক্ষরে বা স্বরবর্ণে তিনটি চরণে নিবন্ধ যে ছন্দ, তারই নাম গায়ত্রী। উষ্ণিক ছন্দে আটাশ, অনুষ্টুভে বত্রিশ, বৃহতীতে ছত্রিশ, পংক্তিতে চল্লিশ, ত্রিষ্টুভে চুয়াল্লিশ এবং জগতী ছন্দে আটচল্লিশটি অক্ষর আছে। এই সাতটি বৈদিক ছন্দ। কাত্যায়ন তাঁর সর্বানুক্রমণিকা গ্রন্থে এই সাতটি বৈদিক ছন্দের উল্লেখ করেছেন। কবি বাল্মীকিকেই লৌকিক ছন্দের আবিষ্কারক মনে করা হয়। সংস্কৃত কাব্যে দুশোরও বেশি ছন্দের ব্যবহার আছে, তার মধ্যে পঞ্চাশটির বেশি প্রচলিত। ঋগ্বেদের প্রতিশাখার শেষ ভাগে বৈদিক ছন্দের উপরে কয়েকটি অধ্যায় আছে, সামবেদের অন্তর্গত নিদান সূত্রেও আছে ছন্দের আলোচনা।

ব্যাকরণ আর একটি বেদাঙ্গ। অনেকে এই ব্যাকরণকে ছন্দের চেয়েও বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। সেকালে যখন বেদাধ্যয়ন নিত্য কর্ম ছিল এবং যজ্ঞে বেদ পাঠ হত, তখন বেদ দু ভাবে পাঠ করা হত। পরস্পর সন্নিবদ্ধ অবস্থায় পাঠকে বলত অব্যাকৃত এবং পদ বিচ্ছিন্ন করে পাঠকে বলত ব্যাকৃত পদ পাঠ। এই ব্যাকৃত পদ পাঠে ব্যাকরণের সন্ধি প্রভৃতি জানতে হত। কিন্তু বৈদিক যুগে প্রচলিত ব্যাকরণ এখন আর পাওয়া যায় না। অনুমান করা হয় যে তখন সন্ধি সুবন্ত কৃদন্ত তদ্ধিত প্রভৃতি শিক্ষার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থ দেখতে হত। পাণিনিই প্রথম এই সব সূত্র

একত্র করে লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর রচনাতেই পূর্বাচার্যদের নাম পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে প্রধান হলেন যাস্ক, পারস্কর, শাকটায়ন, ব্যাস এবং তাঁদের শিষ্য প্রশিষ্য নিয়ে প্রায় চৌষট্টি জন। পাণিনি খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর মানুষ। তাঁর পূর্বে যাঁরা ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন কাশ্যপ, গার্গেয়, গালব, ভারদ্বাজ, শাকল্য প্রভৃতি। কাত্যায়ন ভাগুরি পতঞ্জলি প্রভৃতি বৈয়াকরণের নামও পাওয়া যায়। প্রাচীন কালের ব্যাকরণের মধ্যে পাণিনি, মুগ্ধবোধ ও কলাপ প্রভৃতি এখনও প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই সব ব্যাকরণের প্রভাবে বৈদিক ভাষার অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং এখন এই ভাষারই নাম হয়েছে সংস্কৃত। বৈদিক সাহিত্যের পরিচয়ের জন্য পুরাকালে যে প্রতিশাখাগুলি রচিত হয়েছিল, তাকেই এখন বৈদিক ব্যাকরণ বলা যেতে পারে।

নিরুক্তও বেদাঙ্গের অন্তর্গত। নিরুক্ত বলতে এখন আমরা যাস্কের নিরুক্ত গ্রন্থ বুঝি। এতে আছে বেদের সমস্ত দুরূহ শব্দের ও ব্যাক্যের ব্যাখ্যা। বিদেশী পণ্ডিতরা মনে করেন যে যাস্ক খ্রীষ্ট পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু পাণিনির মতো যাস্কও প্রথম নিরুক্তকার নন। তাঁর আগেও যে বেদের অনেক ব্যাখ্যাকার ছিলেন তা যাস্কের নিরুক্ত থেকেই জানা যায়। শাকপূর্ণি বা শাকপুণি, ঔর্ণনাভ বা উর্ণনাভ, স্থলাষ্ঠিবী বা স্থুলোষ্টিবি প্রভৃতি যে নিরুক্তকার ছিলেন তা জানা যায়, কিন্তু তাঁদের রচনা আর পাওয়া যায় না। সে সব পাওয়া গেলে বেদের অনেক ঋকের আদি অর্থ জানা সম্ভব হত। এখন আমরা যাস্কের নিরুক্ত ও সায়নের ভাষ্য থেকেই বেদের অর্থ বুঝবার চেষ্টা করি। সায়ন তো বলতে গেলে এ যুগেরই মানুষ। তিনি খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন বিজয়নগর রাজ্যে। বৈদিক ভাষার অর্থ উদ্ধার তখন এক রকম দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল।

এই প্রসঙ্গে নিঘণ্টুর কথাও বলা দরকার। নিঘণ্টু বৈদিক শব্দের সংগ্রহ বলে নিরুক্তের সঙ্গে তার মিল আছে। বৈদিক যুগে নিঘণ্টুর মতো শব্দ সংগ্রহ যে আরও ছিল তাতে সংশয় নেই, কিন্তু এখন আর সে সব পাওয়া যায় না। যাস্ক তাঁর নিরুক্তে নিঘণ্টুর শব্দেরও ব্যাখ্যা করেছেন। নিরুক্ত শব্দটির অর্থ হল ভেঙে বলা। ব্যাকরণে শব্দকে ভাঙা হয়। নিরুক্তে ভাঙা হয় পদকে। পদ ভাঙলেই তার ব্যাখ্যা সম্ভব। এই জন্য বেদাঙ্গ রূপে ব্যাকরণের পরেই নিরুক্তের স্থান।

জ্যোতিষও বেদাঙ্গ। বৈদিক যাগ যজ্ঞের জন্য তিথি নক্ষত্র নির্ণয়ের প্রয়োজন হত। যজ্ঞের ঋত্বিকরা উত্তরায়ণ ও শুক্লপক্ষাদি বিচার করে যজ্ঞের দিন স্থির করতেন। এই জন্য তাদের জ্যোতিষ চর্চার প্রয়োজন

হত। বৈদিক সাহিত্যেই নাকি জ্যোতিষের বীজ নিহিত আছে এবং ঋষিরা সেই অনুসারে কাল গণনা করতে পারতেন। বেদাঙ্গ জ্যোতিষ নামে একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। এটি লগধের বেদাঙ্গ জ্যোতিষ নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে ভাস্করাচার্য বরাহ-মিহির প্রভৃতি ব্যক্তিরা জ্যোতিষের গ্রন্থ রচনা করেন।

কল্প ষড় বেদাঙ্গের শেষ হলেও তার প্রাধান্য কম নয়। উপনিষদের চিন্তার ফলে বৈদিক ক্রিয়াকর্মে যখন ভাঁটা পড়েছিল, ঋষিরা সেই সময়েই বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের সার সংগ্রহ করে সূত্র গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। এই সূত্রগ্রন্থগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—শ্রৌত ধর্ম ও গৃহ্য। শ্রৌত সূত্রে যাগ যজ্ঞে শ্রুতির বিধান, ধর্ম সূত্রে গৃহীর আচার নিয়ম এবং গৃহ্য সূত্রে জাত কর্মাদি সংস্কারের বিধান। এই তিন সূত্রকেই একত্রে কল্পসূত্র বলে। আপস্তম্বের কল্পসূত্র এখনও পাওয়া যায়। এর প্রথম দিকে শ্রৌত বা যাগযজ্ঞের কথা আছে, তারপর গৃহ্য বা গৃহ ধর্মের কথা এবং পরে ধর্ম বা সামাজিক নিয়মের কথা আছে। সব শেষে যজ্ঞের বেদী নির্মানের বিধিও আছে। একেই সুলভ সূত্র বা শূল্ব সূত্র বলে। এই অংশ থেকেই সেকালের ঋষিদের জ্যামিতির জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে সাতটি হবির্যজ্ঞ ও সাতটি সোম যাগের কথা আছে। হবির্যজ্ঞে ঘৃতাহুতি ও সোম যাগে সোমরস আহুতি দিতে হয়। এগুলির নাম শ্রৌত যজ্ঞ। এ ছাড়াও হোম, বৈশ্বদেব প্রভৃতি আরও সাতটি স্মার্ত যজ্ঞ আছে। শ্রৌত সূত্রে শ্রৌত যজ্ঞের বিধান এবং স্মার্ত যজ্ঞের বিধান আছে গৃহ্য সূত্রে, তারই সঙ্গে জাত কর্মাদি ক্রিয়ার বিধি। ধর্ম সূত্রে সামাজিক কর্তব্য অকর্তব্য, দেশাচার লোকাচারের কথা। অনেকে ধর্ম সূত্রকেই সাময়াচারিক সূত্র বলেন। এর অর্থ সর্বসম্মত অনুশাসন ও আচরণের উপদেশ। যজ্ঞ বেদীর নির্মাণ বিষয়ক বলে সুলভ সূত্র বা শূল্ব সূত্র কল্পসূত্রেরই অঙ্গ বলে মনে করা হয়। শূল্ব শব্দের অর্থ ভূমি পরিমাপের দড়ি। প্রত্যেকটি বেদের সূত্রগ্রন্থ আলাদা।

অনুক্রমনী নামে এক শ্রেণীর গ্রন্থও বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এতে ছন্দ দেবতা ও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির আলোচনা আছে।

শুধু চারখানি বেদ নিয়েই বৈদিক সাহিত্য নয়, বেদ অধ্যয়ন ও হৃদয়ঙ্গম করার জন্য ষড় বেদাঙ্গও বৈদিক সাহিত্যের অন্তভুক্ত। এর বিস্তার শুরু হয়েছিল ব্রাহ্মণ গ্রন্থে, আরণ্যক ও উপনিষদে তার পরিণতি। এই সাহিত্য দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। একটি কর্ম কাণ্ডের ধারা—যাগ যজ্ঞ এবং সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবন চর্চা,

অন্যটি জ্ঞান কাণ্ডের প্রবাহ—জ্ঞানের চরম উৎকর্ষে পেঁছিবার প্রচেষ্টা। বেদে যা প্রাকৃতিক শক্তি বলে স্তুত, উপনিষদে সেই শক্তির আধার ব্রহ্মের অনুসন্ধান। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যকে ব্রহ্মবিদরা দুভাগে ভাগ করেছেন। এক ভাগে সমগ্র বেদ ও বেদাঙ্গ নিয়ে অপরা বিদ্যা, অন্য দিকে পরাবিদ্যায় শুধু ব্রহ্মকে জানার প্রচেষ্টা। পদ্যে গদ্যে ও গানে ঋষিরা বিশ্বের আদিম সভ্যতার নিদর্শন রেখে গেছেন এই বিশাল বৈদিক সাহিত্যে। এই সাহিত্যের আস্বাদ যারা পান নি বা নেবার চেষ্টা করেন নি, তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ কিনা তা তাঁরা নিজেরাই বিচার করে দেখবেন।

সংক্ষেপে চার বেদের কথা

বেদের বিষয় বস্তু নিয়ে অনেক কথাই বলেছি। কিন্তু একটি কথা এখনও বলা হয় নি। বেদকে শ্রুতি বলা হয় বলে সাধারণের ধারণা যে এই বেদ পুরুষ পরম্পরায় মুখে মুখে চলে এসেছে। কিন্তু এ কথা ঠিক বলে আমার মনে হয় না। হয়তো কিছু দিন এই ভাবেই মুখে মুখে চলে এসেছিল। তারপর এক সময়ে লিপিবদ্ধ হয় এবং সেও বহুদিন আগে।

অনেকেই বলেন যে বৈদিক যুগে কোন বর্ণমালা বা লিপি প্রচলিত ছিল না এবং ঋষিদের রচিত সূক্তগুলি কণ্ঠস্থ করেই রক্ষা করা হত। এ রকম মনে করার প্রধান কারণ হল ঋগ্বেদেরই একটি কথা। ঘোর পুত্র কণ্ব ঋষি বলছেন গায়ত্রী ছন্দে—

> মুখে রচনা কর শ্লোক, তা বিস্তার কর পর্জন্যের মতো।
> পাঠ কর গায়ত্রী ছন্দে রচিত সেই উকথ স্তুতি ॥ ১।৩৮।১৪ ॥

যাঁরা বলেন যে সেকালে লিপি ছিল না, তাঁরা এই ঋকটির যুক্তি দিয়েই বলেন যে তা থাকলে মুখে শ্লোক রচনার কথা হত না, লেখার কথাই হত। কিন্তু এ কালেও কি মুখে মুখে ছড়া রচনা হয় না? না, কিছু দিন আগে মুখে মুখে গান রচনা করে কবির লড়াই হত না? স্মৃতি শক্তির সাহায্যে বেদের সাড়ে দশ হাজার শ্লোক বা মন্ত্র নির্ভুল ভাবে সংরক্ষিত হয়েছে, এ একেবারেই অবিশ্বাস্য কথা। কোন বর্ণমালা বা লিপি ছিল না, এ কথা অনুমান না করে কোন রকমের লিপি ছিল, এ কথা মেনে নিতে আপত্তি কী?

আর্যরা যখন ভারতে এসেছিল, তার আগেই তো এ দেশের সিন্ধু উপত্যকায় একটা উন্নততর সভ্যতার অস্তিত্ব মেনে নেওয়া হয়েছে। যারা নগর ও বন্দর নির্মাণ করে দেশে বিদেশে বাণিজ্য করত, তারা লিখতে

পড়তে জানত না ভাবতেও বিস্ময়বোধ হয়। লিপির কোন নিদর্শন নেই, এর মানে এই নয় যে কোন লিপি ছিল না। কাগজ ভূর্জপত্র বা চামড়ার উপরে লেখা পুঁথি তো হাজার হাজার বছর রক্ষা করা সম্ভব নয়। ধাতু বা পাথরের উপরে লেখার রীতি হয়তো ছিল না। অশোকের শিলা লিপি দেখে এ কথা বলা অন্যায় হবে যে অশোকের আমলেই লিপি প্রচলিত হয়েছিল। মনে হয় যে আমরা খুব সঙ্গত কারনেই মেনে নিতে পারি যে বৈদিক যুগেও বর্ণমালা ও লিপির ব্যবহার ছিল। অন্ততপক্ষে এই যুগেরই শেষের দিকে বেদ লিপিবদ্ধ করে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল।

সামবেদের গান অংশে সুরের যে স্বরলিপি রাখা হত সে কথা আগেই বলা হয়েছে। লিপি না থাকলে স্বরলিপি হত কী ভাবে!

কিন্তু এই দীর্ঘ আলোচনায় মূল গ্রন্থ ও রচনার আস্বাদ কিছুই পাওয়া গেল না। শাখা-প্রশাখা সমন্বিত বেদ সমূহ সম্বন্ধে যেমন একটা ধারণা থাকা দরকার, তেমনি মূল রচনার সামান্য আস্বাদ গ্রহণেরও সার্থকতা আছে। এই দুরূহ কাজ অতি সংক্ষেপে করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে তবে চেষ্টা করতে বোধহয় দোষ নেই।

ঋগ্বেদ

প্রথমে ঋগ্বেদের কথাই বলি।

সমগ্র ঋগ্বেদ দশটি মণ্ডলে বিভক্ত। দুই পংক্তির একটি শ্লোককে ঋক্ বা মন্ত্র বলা হয়। কয়েকটি ঋকের সমষ্টি একটি সূক্ত। সব মণ্ডলে সূক্তের সংখ্যা সমান নয়, আবার সব সূক্তে ঋকের সংখ্যাও সমান নয়। প্রথম ও দশম মণ্ডলে ১৯১ টি করে সূক্ত আছে। আবার দ্বিতীয় মণ্ডলে মাত্র ৪৩ টি সূক্ত। সমগ্র ঋগ্বেদে মোট ঋকের সংখ্যা ১০৫৫২। ঋগ্বেদকে দশটি মণ্ডলে ভাগ করার সময় যে নীতি অনুসৃত হয়েছে তা হল এক এক বংশীয় ঋষিদের রচনা এক একটি মণ্ডলে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা। শুধু প্রথম ও দশম মণ্ডলে বিভিন্ন ঋষিদের রচনা স্থান পেয়েছে।

ঋগ্বেদের দুখানি ব্রাহ্মণ গ্রন্থ আছে—ঐতরেয় এবং শাঙখায়ন বা কৌষীতকী ব্রাহ্মণ। এই দুই ব্রাহ্মণ গ্রন্থে যথাক্রমে চল্লিশ ও তিরিশটি অধ্যায়। এতে বহু প্রকার আখ্যান আছে। কী ভাবে মন্ত্রের অবির্ভাব হল, তাও আখ্যান দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই দুই ব্রাহ্মণেরই আরণ্যক আছে এবং উপনিষদও আছে দুখানি—ঐতরেয় ও কৌষীতকী।

ঋগ্বেদের ভাষা কী রকম ছিল তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। প্রথম মণ্ডলের ১ সূক্তে নয়টি ঋক আছে। তার প্রথম দুটি ঋক এই রকম—

১ সূক্ত ॥ অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্
হোতারং রত্ন ধাতমম্ ॥ ১
অগ্নিঃ পূর্বেভি ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত।
স দেবাঁ এহ বক্ষতি ॥ ২

এর অর্থ—

অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত ও দীপ্তিমান,
দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক ও প্রভূত রত্নধারী।
আমি স্তুতি করি অগ্নির ॥ ১ ॥
অগ্নি পূর্ব ঋষিদের স্তুতিভাজন ছিলেন,
নূতন ঋষিদেরও স্তুতিভাজন।
তিনি এই যজ্ঞে আনুন দেবগণকে ॥ ২ ॥

প্রথম মণ্ডল থেকে আর একটি উদাহরণ।—

৯০ সূক্ত ॥ বহু দেবতা দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ।

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বী র্নঃ সন্ত্বোষধীঃ ॥ ৬ ॥
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥ ৭ ॥
মধুমান্নো বনস্পতি র্মধুমাঁ অস্ত সূর্যঃ।
মাধ্বী র্গাবো ভবন্তু নঃ ॥ ৮ ॥

এর অর্থ—

যজমানের জন্য মধু বর্ষণ করে বায়ু, মধুক্ষরণ করে নদী।
মাধুর্যময় হোক সব ওষধি ॥ ৬ ॥
মধুর হোক আমাদের রাত্রি ও ঊষা, মধুর হোক পার্থিব জনপদ।
সকলের পালয়িতা আকাশও হোক মধুময় ॥ ৭ ॥
আমাদের প্রতি মধুর হোক বনস্পতি, মধুর হোক সূর্যও।
ধেনুরাও হোক মধুর ॥ ৮ ॥

দশম মণ্ডলের বহু সূক্তকেই পণ্ডিতরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলেন। এদের মধ্য থেকে শেষ দুটি সূক্তের সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে।—

১৯০ সূক্ত। সৃষ্টি দেবতা। অঘমর্ষণ ঋষি। অনুষ্টুপ ছন্দ।
ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোহধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্নবঃ॥ ১॥
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী॥ ২॥
সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥ ৩॥

এর অর্থ—
ঋত ও সত্য জন্ম গ্রহণ করল প্রজ্বলিত তপস্যা থেকে।
পরে রাত্রি জন্মাল, তারপর জলপূর্ণ সমুদ্র॥ ১॥
জলপূর্ণ সমুদ্র থেকে জন্মাল সংবৎসর।
রাত্রি দিন সৃষ্টি করলেন তিনি, দেখছে সকল লোক॥ ২॥
যথাসময়ে সূর্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করলেন সৃষ্টি কর্তা।
সৃষ্টি করলেন স্বর্গ পৃথিবী ও আকাশ॥ ৩॥

১৯১ সূক্ত। প্রথম ঋকের অগ্নি দেবতা। অবশিষ্টগুলির সংজ্ঞান অর্থাৎ ঐক্যমত দেবতা। সংবনন ঋষি। অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ ছন্দ।
সংসমিদ্যুবসে বৃষন্নগ্নে বিশ্বান্যর্য আ।
ইলস্পদে সমিধ্যসে স নো বসূন্যা ভর॥ ১॥
সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে॥ ২॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি॥ ৩॥
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥ ৪॥

এর অর্থ
হে অগ্নি, তুমি প্রভু, অভিলষিত ফলদাতা,
তুমি মিশ্রিত আছ সকল প্রাণীর সাথে।
তুমি জ্বলছ যজ্ঞ বেদীতে, ধনদান কর আমাদের। ১
হে স্তবকর্তাগণ, মিলিত হও তোমরা, একত্রে কর স্তব উচ্চারণ।
পরস্পর এক মত হোক তোমাদের মন।
একালের দেবতারাও যজ্ঞভাগ নিচ্ছেন
প্রাচীন দেবতাদের মতো এক মত হয়ে॥ ২
পুরোহিতদের মন্ত্রোচ্চারণ এক রকম হোক, সমাগত হোন এঁর সঙ্গে।

এঁদের মন চিত্ত ও সকলই হোক এক রকম।
হে পুরোহিতগণ, আমি তোমাদের মন্ত্রিত করছি একই মন্ত্রে,
হোম করছি তোমাদের সর্ব সাধারণ হবির দ্বারা ॥ ৩ ॥
তোমাদের অভিপ্রায় এক হোক, এক হোক অন্তঃকরণ,
মনও এক হোক, এক মত হও সর্বাংশে ও সম্পূর্ণরূপে ॥৪॥

এই স্থানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে দশম মণ্ডলের ১৯০ সূক্তকে সৃষ্টি সূক্ত বলে এবং ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা আহ্নিকের সময়ে এই সূক্তটি পাঠ করতে হয়। এই ভাবেই অগ্নিমীলে পুরোহিতং বা মধুবাতা ঋতায়তে এই মন্ত্রগুলি পাঠ করা হয় যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের সময়ে। ১৯১ সূক্তের দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ ঋকে সুর যোজনা করে এখন বেদগান রূপে পরিবেশিত হয়

সামবেদ

গীতায় কৃষ্ণ বলেছেন, বেদানাং সামবেদোঽস্মি অর্থাৎ বেদের মধ্যে আমি সামবেদ। মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন যে সামবেদ মাধুর্যে অতি রমণীয়। আসলে ঋগ্বেদের কিছু সুরসংযোগে গাইবার যোগ্য ঋক্ই সামবেদে গৃহীত হয়েছে। দেখা গেছে যে ঋগ্বেদের নবম মণ্ডল থেকে প্রায় এক তৃতীয়াংশ ঋক সামবেদে গৃহীত হয়েছে এবং মাত্র পঁচাত্তরটি মন্ত্র নূতন, বাকি সবই ঋক্ মন্ত্র। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে ঋগ্বেদের নানা সূক্ত থেকে এই মন্ত্রগুলি গৃহীত হলেও সেগুলি এমনভাবে সাজানো যে মন্ত্রের ধারাবাহিকতা সুন্দরভাবে রক্ষিত হয়েছে। সামবেদ বিভিন্ন ঋষির রচিত গানের যোগ্য মন্ত্র সংকলন, এক কথায় গানের বই। এই সব গান গাওয়া হত বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে। যজ্ঞের উদ্গাতারা এই সামগান গাইতেন।

আর্চিক ও গান নামে সামবেদের দুটি ভাগ আছে বলা হয়। আর্চিক গানের সংকলন, তারও দুটি ভাগ পূর্বার্চিক ও উত্তরার্চিক এবং গান অংশে এই সব গানের স্বরলিপি আছে। পূর্বার্চিকের মন্ত্রগুলি দেবতার নামে সাজানো হয়েছেঅগ্নির পর ইন্দ্রের স্তুতি, তারপর পবমান সোমের স্তুতি। আরণ্যক কাণ্ডে নানা দেবতার স্তুতি আছে। মহানাম্নী আর্চিকে ত্রিলোকের আত্মা ইন্দ্রের স্তুতি। উত্তরার্চিকের অনেক মন্ত্র পূর্বার্চিকেও আছে।

সামবেদের স্বরলিপি অংশকে গান বলে। এই গান অংশের আবার চারটি ভাগ—গ্রামগেয়, অরণ্যগেয়, উহ ও উহ্য।

সামবেদের দুখানি ব্রাহ্মণ গ্রন্থই সুপরিচিত। প্রথমটির নাম তাণ্ড্য, এর অপর নাম পঞ্চবিংশ। দ্বিতীয়টির নাম ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ। উপনিষদও দুখানি—ছান্দোগ্য ও কেন।

ঋগ্বেদের ১।১০৭।২ ঋকে আছে যে দেবতারা প্রথমে অঙ্গিরাদের সামগান শোনেন। ২।২৩।১৭ ঋকে অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতিকে সামের গায়ক বলা হয়েছে। অঙ্গিরার ভ্রাতা অথর্ব ঋষির পুত্র দধীচি মধু বিদ্যা জানতেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের মতে মধু বিদ্যা হল পঞ্চভূতের আলোচনা। অনেকে বলেন যে 'মধুবাতা ঋতায়তে' এই সাম গানটিই মধুবিদ্যা। সে যাই হোক, অনুমান করা যেতে পারে যে অঙ্গিরা ঋষিই সর্বপ্রথম সাম গান রচনা করেন।

সায়নের মতে রথন্তর সামই সর্বপ্রথমে স্বর সংযোগে গান করতে হয়। অরণ্য গানের মধ্যে এই সামগানঃ অভি ত্বা শূর নো নুমঃ—এটিই সর্বপ্রথম রচনা বলে মনে করা হয় এবং এর রচয়িতা হলেন অঙ্গিরা ঋষি। এই সাম মধুবিদ্যা নামে পরিচিত সামগানেরই সমসাময়িক রচনা।

তৃতীয় অধ্যায়। ঐন্দ্র কাণ্ড ঃ ইন্দ্রস্তুতি ঃ প্রথম খণ্ড

অভি ত্বা শূর নোনুমোহদুগ্ধা ইব ধেনবঃ।
ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিন্দ্র তস্থুষঃ ॥ ১ ॥
ত্বামিদ্ধি হবামহে যাতৌ বাজস্য কারবঃ।
ত্বাং বৃত্রেষিন্দ্র সৎপতিং নরস্ত্বাং কাষ্ঠাস্বর্বতঃ ॥ ২ ॥

হে শূর, আমরা তোমার কাছে এসেছি
স্তুতি ভারে অবনত হয়ে
দোহন করা হয় নি এমন পয়স্বিনীদের মতো।
হে ইন্দ্র. স্থাবর ও জঙ্গমের ঈশ্বর তুমি, তুমি সর্বদর্শী ॥ ১ ॥
আমরা স্তোতারা তোমাকেই ডাকি
অন্ন বল লাভের আশায়।
হে ইন্দ্র, যে তুমি সৎকর্ম সাধক হও মেঘ বিদারণ করে
মেঘ পুঞ্জের জলরাশিতে অশ্বরশ্মিরূপে অবস্থিত থেকে,
সেই তোমাকেই ডাকে মানুষ ॥ ২ ॥
আমি যেমন করি সেই ভাবে তোমরাও কর প্রার্থনা
তোমাদের মঙ্গলের জন্য
শোভন সর্বসিদ্ধিকর ধনবিশিষ্ট ইন্দ্রের কাছে,
যিনি বহু ধন যুক্ত মহান দাতা,
সহস্র প্রকারে দান করেন স্তোতাকে ॥ ৩ ॥

তোমাদের জন্যই আমি স্তুতি করি মন্ত্র শব্দ দ্বারা
সেই দর্শনীয় জগৎ নিয়ামক সোমে বাসকারী
অন্নে হৃষ্ট ইন্দ্রকে,
গোষ্ঠে যেমন করে ধেনু ডাকে তার বৎসকে ॥ ৪ ॥
যিনি প্রচুর লাভে ধনশালী হৃষ্ট ব্যক্তির মতো
সেই ইন্দ্রকে আহ্বান করি অহিংসিত সোম যজ্ঞে
বৃহৎ সামগানে ক্ষিপ্রতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে
তোমাদেরই সব কিছু রক্ষার জন্য ॥ ৫ ॥
ক্ষিপ্রকারীই ধনসেবা করেন প্রজ্ঞায় যুক্ত হয়ে।
সূর্য যেমন সুগমনে বেষ্টন করেন সংবৎসরকে,
তেমনি আমি বেষ্টন করি বহুর দ্বারা আহূত ইন্দ্রকে
স্তুতিতে নত হয়ে তোমাদেরই জন্য ॥ ৬ ॥
হে ইন্দ্র, তুমি হৃষ্ট হও এই উদকযুক্ত রসাল সোম পান করে,
বন্ধু বলে মনে কর আমাদের,
সোম পানে হৃষ্ট হয়ে বৃদ্ধি হোক তোমার ধী
আমাদের রক্ষার জন্য ॥ ৭ ॥
তুমি এসো শ্রদ্ধানিবেদনকারী ধনকামীর কাছে
তুমি ভজনীয় এই কথা জেনে।
হে উত্তম দাতা ইন্দ্র, বার বার বর্ষণ কর ঊর্ধ্বে থেকে
ইচ্ছাপূরণের জন্য, মহাগতির জন্য ॥ ৮ ॥
তোমাদের কাউকেই অবহেলা করেন না বসিষ্ঠ,
হে প্রাণরূপী মরুৎগণ, আমাদের সোম যাগে এসো
সোম কামনা করে সবাই মিলিত হয়ে ॥ ৯ ॥
হে সখাগণ, অন্যের পূজা কোর না তোমরা,
হিংসা কোরো না কাউকে,
মুহুর্মুহু স্তব কর বর্ষণকারী ইন্দ্রকেই
একত্র মিলিত হয়ে স্তোত্র ও গানের দ্বারা ॥ ১০ ॥

এই সামগানে বসিষ্ঠের নাম দেখে মনে হবে যে সম্পূর্ণ গান বসিষ্ঠেরই রচনা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি ১, ৬ ও ৯ মন্ত্রের ঋষি, ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য ২ মন্ত্রের, প্রস্কণ্ব কাণ্ব ৩ মন্ত্রের, নোধা গৌতম ৪ মন্ত্রের, কলি প্রাগাথ ৫ মন্ত্রের, মেধাতিথি কাণ্ব ৭ মন্ত্রের, ভর্গ প্রাগাথ ৮ মন্ত্রের এবং প্রাগাথ ঘৌর কাণ্ব ১০ মন্ত্রের রচয়িতা। ছন্দ বৃহতী। এইখানে লক্ষণীয় হল এই যে একই ছন্দে রচিত এই দশটি মন্ত্রে ভাবের ধারাবাহিকতা কেমন সুন্দর ভাবে রক্ষিত হয়েছে।

উত্তরার্চিক থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে—
বিংশ অধ্যায়। দ্বিতীয় অংশ। ষষ্ঠ খন্ড। ২ সূক্ত।
প্র সো অগ্নে তবোতিভিঃ সুবীরাভিস্তরতি বাজকর্মভিঃ।
যস্য ত্বং সখ্য-মাবিথ ॥ ১ ॥
হে অগ্নি, যাকে তুমি কর সখা সে করে অতিক্রম
সকল বিঘ্ন তোমার দেওয়া বল ও অন্ন দিয়ে ॥ ১ ॥
হে সোমসিক্ত, হে বাসপ্রদ, হে কমনীয়,
প্রতি ঋতুতেই কর্মকারী হে দীপ্ত অগ্নি,
তোমার জন্য গৃহীত হচ্ছে সোম,
তুমি প্রিয় মহতী ঊষার
রাত্রিকালে প্রকাশিত হও সকল বস্তুতে ॥ ২ ॥
সেই অগ্নিকে গর্ভরূপে ধারণ করে ওষধিগণ,
মায়ের মতো জন্ম দান করে জলরাশি।
একই ভাবে তাঁকেই প্রসব করে দিন দিন
গর্ভবতী হয়ে বনের লতাগণ ॥ ৩ ॥
উজ্জ্বল রূপে দীপ্তিলাভ করেন অগ্নি
দ্যুলোকে বিপুল আকার ধারণ করে ইন্দ্রের জন্য ॥ ৪ ॥
ঋক্ সকল কামনা করে যিনি জাগরিত থাকেন,
সামগান যায় যিনি জাগরিত তাঁর কাছে।
যিনি জাগরিত তাঁকে বলে এই সাম,
তোমার সখ্যতায় আমি বাস করি নিয়ত ॥ ৫ ॥
অগ্নি জাগ্রত, তাঁকে কামনা করে ঋক্ সকল,
অগ্নি জাগ্রত, সাম গান যায় তাঁর কাছে।
অগ্নি জাগ্রত, তাঁকে বলে এই সাম,
তোমার সখ্যতায় আমি বাস করি নিয়ত ॥ ৬ ॥
নমস্কার পূর্ব হতে অবস্থিত সখীগণকে,
নমস্কার একত্র অবস্থিত রসবর্ষণকারীদের।
মনন দিয়ে কর্মে মিলিত করি শতপদী বাক্‌কে ॥ ৭ ॥
যিনি ভ্রমণশীল সহস্রগমন মার্গে মহাগতিতে,
যিনি রূপায়িত গায়ত্রী ত্রিষ্টুপ ও জগতী ছন্দে,
সেই শতপদী বাক্ দেবীকে মিলিত করি কর্মে ॥ ৮ ॥
যে বাসস্থান বিশ্বের সকল রূপে মিলিত,
তা নির্মাণ করেন দেব রশ্মিগণ

গায়ত্রী ত্রিষ্টুপ ও জগতী ছন্দে রূপায়িত করে ॥ ৯ ॥
হে অগ্নি, তুমি আবার আমাদের কাছে এসো
বল অন্ন ও আয়ু নিয়ে,
তুমি আবার আমাদের রক্ষা কর পাপ হতে ॥ ১০ ॥
হে অগ্নি, তুমি এসো ধনযুক্ত হয়ে,
সেচন কর ধনরাশি সর্বজন ভোগ্য অবিচ্ছিন্ন ধারায় ॥ ১১ ॥

যজুর্বেদ

যজুঃ শব্দের ব্যুৎপত্তি গত অর্থ যজ্ঞের মন্ত্র এবং যে বেদে যজ্ঞের মন্ত্র সংকলিত হয়েছে তা যজুর্বেদ। অধ্বর্যু নামে ঋত্বিকরা অনুচ্চ স্বরে যজুর্মন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং এতে চরণ বা অবসান সম্বন্ধে কোন নিয়ম নেই। তাই যজুর্বেদের মন্ত্র গদ্যেও আছে। সামবেদের মতো যজুর্বেদও একান্ত ভাবে যজ্ঞীয় সাহিত্য। যজ্ঞে গানের জন্য যেমন সামবেদ, তেমনি যজ্ঞের অনুষ্ঠানের জন্য যজুর্বেদ। এই গদ্য সরল ও প্রাণবন্ত, ছোট ছোট বাক্য কখনও প্রতীকী কখনও বা রূপকাশ্রয়ী। সংস্কৃত ভাষায় প্রাচীনতম গদ্যের এক আশ্চর্য নিদর্শন।

যজুর্বেদের দুটি ভাগ—কৃষ্ণ ও শুক্ল। ভাষ্যকার মহীধর বলেছেন যে বেদব্যাস তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ শিক্ষা দেন এবং বৈশম্পায়নের নিকটে যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি শিষ্যরা তা অধ্যয়ন করেন। কোন কারণে বৈশম্পায়ন ক্রুদ্ধ হয়ে যাজ্ঞবাল্ক্যকে এই বেদ ত্যাগ করতে বলেন। যাজ্ঞবল্ক্য যোগবলে সেই অধীত বিদ্যা বমন করলে অন্যান্য শিষ্যরা তিত্তিরী পক্ষী রূপে তা গ্রহন করেন। এই জন্য এই যজুর্বেদ তৈত্তিরীয় সংহিতা নামে অভিহিত এবং শিষ্যদের মলিন বুদ্ধির জন্য মন্ত্রগুলি কৃষ্ণ বর্ণ হয়। তারপর যাজ্ঞবল্ক্য সূর্যের আরাধনা করে শুক্ল বা বিশুদ্ধ যজুর্মন্ত্র লাভ করেন। বর্তমানে যজুর্বেদের এই দুই অংশ কৃষ্ণ ও শুক্ল যজুর্বেদ নামে পরিচিত। শুক্ল যজুর্বেদ বাজসনেয় সংহিতা নামেও প্রচলিত।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থের নাম তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। আরণ্যকের নামও তৈত্তিরীয়। এই আরণ্যকের অন্তর্গত তিনটি উপনিষদ আছে—তৈত্তিরীয়, কঠ ও শ্বেতাশ্বতর। শুক্ল যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থ শতপথ, আরণ্যকের নামও শতপথ। বৃহদারণ্যক উপনিষদ তারই অন্তর্গত। শুক্ল যজুর্বেদের শেষ অধ্যায় অর্থাৎ চত্বারিংশ অধ্যায় ঈশ উপনিষদ নামে অভিহিত। এই একটি মাত্র উপনিষদই মূল বেদের অংশ।

কৃষ্ণ যজুর্বেদ। প্রথম কাণ্ড। প্রথম প্রপাঠক। মন্ত্র ৬।

অবধূতং রক্ষোঽবধূতা অরাতয়োঽদিত্যাস্ত্বগসি প্রতি ত্বা পৃথিবী বেত্তু।

হে মন, তুমি যুক্ত হলে সতের সাথে,
কম্পিত হবে দুর্বুদ্ধি রূপে শত্রু,
চলে যাবে রিপুরূপ শত্রুরা।
তুমিই বাধা অনন্তের সাথে মিলনের,
তাই তোমাকে অনুগ্রহ করুক সৎ জ্ঞান ও কর্ম
হে আমার অসৎ বৃত্তি সমূহ,
আমার স্বর্গের প্রতিবন্ধক তোমরা,
তোমাকে অনুগ্রহ করুক অনন্তের অংশ শুদ্ধসত্ত্ব।
হে মনোবৃত্তি, সৎ বুদ্ধি দাও তুমি.
দৃঢ় হও পর্বতের মতো,
চলে যাক তোমার দ্যুলোকের বাধা।
তুমি ধিষণা, পর্বতের মতো দৃঢ় জানুক তোমাকে পরা প্রকৃতি।
হে হবি, ভগবানের উদ্দেশে নিযুক্ত করছি তোমাকে
সবিতা দেবের অনুকম্পায়,
অশ্বীদ্বয়ের বাহু যুগলের দ্বারা,
পূষা দেবতার হস্তদ্বয় দ্বারা।
হে মন, তুমি ধান্য স্বরূপ, প্রেরণ কর দেবগণ।
তোমাকে যুক্ত করছি প্রাণ অপান ও ব্যান বায়ু সংরক্ষণের জন্য,
আয়ুর বৃদ্ধির জন্য সংযত করছি তোমাকে
বহু সৎ সম্পাদনেরউদ্দেশে।
হে আমার অসৎ বৃত্তি সকল, তোমাদের দূর করে দিক
হিরণ্যপাণি সবিতা দেব আমাদের অন্তর থেকে। ৬।১১॥
হে মন, তুমি চঞ্চল,
স্থির হও তুমি চাঞ্চল্য পরিহার করে,
স্থির হও পরব্রহ্ম প্রাপ্তির জন্য।
ধৃষ্টিরসি ব্রহ্ম যচ্ছ। ৭।

শুক্ল যজুর্বেদ। ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।
ঋচং বাচং প্র পদ্যে মনো যজুঃ প্র পদ্যে সাম প্রাণং প্র পদ্যে
চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্র পদ্যে।
বাগোজঃ সহৌজো ময়ি প্রাণাপানৌ॥ ১॥

যন্মে ছিদ্রং চক্ষুষো হৃদয়স্য মনসো বাতিতৃণ্ণং বৃহস্পতির্মে
তদ্দধাতু।
শং নো ভবতু ভুবনস্য যস্পতিঃ। ২ ॥
ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ৩ ॥
কয়া নশ্চিত্র আ ভুবদূতী সদাবৃধ সখা।
কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা ॥ ৪ ॥
কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ।
দৃঢ়া চিদারুজে বসু ॥ ৫ ॥

শরণ গ্রহণ করছি ঋক্ রূপ বাক্যের।
প্রবেশ করছি যজু রূপ মনে,
আশ্রয় নিচ্ছি সাম রূপ প্রাণের,
আর অবলম্বন করছি চোখ ও কানের।
আমাতে একত্র হয়ে থাক বাক্য, বল, প্রাণ ও অপান ॥ ১।১ ॥
যে ব্যাকুলতা আমার চোখ, বুদ্ধি ও মনের,
তা দূর করুন দেবগুরু বৃহস্পতি,
ভরে দিন সেই ফাঁক ও শূন্য স্থান।
আমাদের সুখের হোন ভুবনের অধিপতি ॥ ২।১ ॥
যে সবিতা দেব প্রেরণ করেন আমাদের বুদ্ধি
সৎকর্মের অনুষ্ঠানে,
আমরা ধ্যান করি তাঁর বরণীয় জ্যোতি। ৩।১ ॥
বিচিত্র সদা বর্ধমান ইন্দ্র সহায় হয়েছিলেন
আমাদের কোন্ তপন ও যাগে? ॥ ৪।১ ॥
হে ইন্দ্র তোমাকে মত্ত করে সোম অন্নের কোন্ অংশ?
কিসে মত্ত হয়ে তুমি চূর্ণ কর স্বর্ণধন আমাদের জন্য? ॥ ৫।১॥
তুমি আমাদের সখা স্তোতা ও ঋত্বিক,
চালকও আমাদের।
আমাদের রক্ষার জন্যই তুমি ধারণ কর শত রূপ ॥ ৬ ॥
হে ইন্দ্র, কোন্ তর্পণে তুমি তৃপ্ত কর আমাদের?
কোন্ তৃপ্তিতে তুমি ধন এনে দাও স্তোতাদের? ॥ ৭ ॥
বিশ্বের রাজা তুমি ইন্দ্র,
সুখ ও শান্তি দাও আমাদের ও চতুষ্পদের ॥ ৮ ॥
মিত্র আমাদের সুখের হোন,

সুখের হোন বরুণ ও অর্যমা,
ইন্দ্র বৃহস্পতি ও উরুক্রম বিষ্ণু
শান্তি বিধান করুন আমাদের ॥ ৯ ॥
বায়ু বয়ে আনুক শান্তি,
সূর্য দিক শান্তির উত্তাপ,
গর্জনকারী পর্জন্য বর্ষণ করুক সুখ ও শান্তি ॥ ১০ ॥
আমাদের শান্তি দিন দিনের অভিমানী দেবতারা,
রাতের অভিমানী দেবতারাও দিন শান্তি।
আমাদের পালন করে শান্তি দিন ইন্দ্র ও অগ্নি,
ইন্দ্র ও বরুণ শান্তি দিন হবিতে তৃপ্ত হয়ে,
অন্নদানের জন্য শান্তি দিন ইন্দ্র ও পূষা;
ইন্দ্র ও সোম শান্তি দিন রোগ ও ভয় দূর করে ॥ ১১ ॥
জলদেবীরা আমাদের সুখ ও শান্তি দিন
স্নান ও পানে দীপ্তিময়ী হয়ে,
দূর করুন আমাদের রোগ ও ভয় ॥ ১২ ॥
হে পৃথিবী তুমি শান্তি দাও আমাদের,
দুঃখ রহিত জনগণের প্রতিষ্ঠাতা তুমি,
তুমি বিস্তীর্ণ সকল দিকে আশ্রয় দাও আমাদের ॥ ১৩ ॥
সকল সুখের কারণ জলদেবীরা,
আমরা যেন সমস্ত রসের আস্বাদ পাই,
যোগ্য হই রমণীয় ব্রহ্ম দর্শনের ॥ ১৪ ॥
মা যেমন শিশুকে করে স্তন দান,
তেমনি, ওগো জলদেবীরা,
তোমাদের শান্তি রস দাও আমাদের ॥ ১৫ ॥
তোমরা প্রীত হও যার নিবাসে,
সেই রসের লোভে আমরা বার বার যাই তোমাদের কাছে।
জলদেবীরা, সে রসের ভোক্তা কর আমাদের ॥ ১৬ ॥
যে শান্তি দ্যুলোক অন্তরিক্ষ ও পৃথিবীর,
তেমনি ওষধি বনস্পতি দেবতা ব্রহ্ম ও এই জগতের।
এমনকি শান্তিরও যে শান্তি,
এ সমস্ত শান্তি হোক আমাদের ॥ ১৭ ॥
আমাকে দৃঢ় কর মহাবীর,
সকল প্রাণী যেন বন্ধুর চোখে দেখে আমাকে,
আমিও যেন তাদের বন্ধুর চোখে দেখি,

আমরা সবাই যেন পরস্পরকে দেখি বন্ধুর চোখে ॥ ১৮ ॥
হে বীর, আমাকে দৃঢ় কর তুমি,
তোমার দর্শনে যেন বেঁচে থাকতে পারি চিরকাল ॥ ১৯ ॥
হে অগ্নি, সকল রস তুমি শোষণ কর,
আর প্রকাশ কর সকল পদার্থ,
আমি নমস্কার করি তোমার তেজকে।
তোমার জ্বালা আমাদের ছেড়ে জ্বালাক অপরকে,
আর শোধক ও শান্তি হোক আমাদের প্রতি ॥ ২০ ॥
হে ভগবান, তুমি বিদ্যুৎরূপী, নমস্কার তোমাকে।
তুমি গর্জনরূপী, তোমাকে নমস্কার।
তুমি স্বর্গে যেতে চাও বলে নমস্কার তোমাকে ॥ ২১ ॥
হে মহাবীর, দুশ্চরিত থেকে চেয়ো না অপকার করতে,
এ সব থেকে অভয় দাও আমাদের।
প্রজাদের সুখ দাও, নির্ভীক কর পশুদের ॥ ২২ ॥
জল ও ওষধি সুমিত্র হোক আমাদের মিত্রদের।
অমিত্র হোক তাদের, যারা আমাদের দ্বেষ করে,
আর আমরা করি বিদ্বেষ ॥ ২৩ ॥
পূর্বের আকাশে উঠছেন প্রিয় আদিত্য,
তিনি দেবতাদের প্রিয়, শুদ্ধ ও জগতের চক্ষু।
তাঁর প্রসাদে আমরা দেখব শত বৎসর।
শত বৎসর বাঁচব, শুনব, বলব, থাকব অদীন হয়ে।
শত বৎসরের পরেও বাঁচব বহুকাল ॥ ২৪ ॥

এই মন্ত্রগুল শান্তি স্তোত্র রূপে ব্যবহৃত হয়। এর তৃতীয় মন্ত্র গায়ত্রী নামে অভিহিত। এই মন্ত্র ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৬২ সূক্ত থেকে নেওয়া হয়েছে। বিশ্বামিত্র ঋষির রচিত এই সূক্তে আঠারোটি ঋক আছে, তার মধ্যে ১০ থেকে ১২ এই তিনটি ঋক সবিতা দেবতার উদ্দেশে রচিত। নিচে এই তিনটি ঋক ও তার অনুবাদ দেওয়া হল—।

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥
দেবস্য সবিতুর্বয়ং বাজয়ন্তঃ পুরন্ধ্যা।
ভগস্য রাতিমীমহে ॥
দেবং নরঃ সবিতারং বিপ্রা যজ্ঞৈঃ সুবৃক্তিঃ।
নমস্যন্তি ধিয়েষিতাঃ ॥ ঋগ্বেদ ৩।৬২।১০-১২ ॥

যিনি প্রেরণ করেন আমাদের ধীশক্তি,
আমরা ধ্যান করি সেই সবিতাদেবের বরণীয় তেজ ॥
স্তুতি করে আমরা যাচ্ঞা করছি অন্নাভিলাষী হয়ে,
সবিতাদেবের ও ভগদেবের ধন।
কর্মরত মেধাবী অধ্বর্যুরা পূজা করেন সবিতা দেবতার
বুদ্ধি দিয়ে প্রেরিত হয়ে যজ্ঞ ও সুন্দর স্তোত্র দিয়ে ॥

সায়ন গায়ত্রী মন্ত্রে সবিতা শব্দের সূর্য ও পরমেশ্বর এই দুই অর্থ করেছেন। সত্যব্রত সামশ্রমী এর অনুবাদ করেছেন—আমরা সবিতৃ দেবতার সে বরণীয় তেজ ধ্যান করি যার প্রভাবে আমরা স্বীয় কর্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হতে সমর্থ হই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ—সবিতৃদেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধি বৃত্তি প্রেরণ করেন। রবীন্দ্রনাথও অনুবাদ করেছেন কবিতায়—

যাঁ হতে বাহিরে ছড়ায়ে পড়িছে
পৃথিবী আকাশ তারা,
যাঁ হতে আমার অন্তরে আসে
বুদ্ধি চেতনা ধারা—
তাঁরি পূজনীয় অসীম শক্তি
ধ্যান করি আমি লইয়া ভক্তি।

শুক্ল যজুর্বেদের চত্বারিংশ অধ্যায়টি ঈশোপনিষৎ নামে বিখ্যাত। এই অধ্যায়ের প্রথম শব্দ 'ঈশা' থেকে উপনিষদের এই নাম হয়েছে। এই উপনিষদের সম্পূর্ণ অনুবাদ এই রকম।—

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্ ॥ ১ ॥

এই জগতে যা কিছু আছে গতিশীল দৃশ্যমান
তা ঈশ্বরেরই বাসের জন্য।
সবই ভোগ করবে ত্যাগ দিয়ে,
লোভ করবে না কারও ধনে ॥ ১ ॥
নিষ্কাম কর্ম করেই বাঁচতে চাইবে
শত বৎসর এই জগতে।
মানুষ যেন লিপ্ত না হয় অন্য কর্মে,
এ ছাড়া আর মুক্তির পথ নেই ॥ ২ ॥
যারা বোঝে না আত্মার স্বরূপ,
দেহ ত্যাগের পর তারা সবাই যায়

সূর্যহীন তমসাবৃত লোকে ॥ ৩ ॥
এক ও অচল ব্রহ্ম বেগবান মনের চেয়েও,
দেবতারাও পান না এঁকে।
স্থির থেকেও ইনি অতিক্রম করেন দ্রুতগামী সবাইকে,
মাতরিশ্বাই ধারণ করেন জগতের সমস্ত শক্তিকে ॥ ৪ ॥
চলেন তিনি, তিনি চলেন না।
তিনি দূরে, নিকটেও তিনি।
তিনি আছেন সবার অন্তরে,
সবার বাহিরেও আছেন তিনি ॥ ৫ ॥
নিজের আত্মায় দেখেন সর্ব ভূতকে,
আর সর্বভূতে দেখেন নিজেরই আত্মাকে,
তার জন্যেই তিনি চান না গোপন করতে নিজেকে ॥ ৬ ॥
যাঁর আত্মা হয়েছে সর্বভূত,
জ্ঞানী ও একদর্শী তিনি।
কোথায় তাঁর শোক বা মোহ? ॥ ৭ ॥
তিনি গেছেন সর্বত্র,
জ্যোতির্ময় অশরীরী শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ তিনি,
সর্বদর্শী সর্বজ্ঞ স্বয়ম্ভূ ও বিদ্যমান সবার উপরে।
তিনি বিধান করছেন নিত্যকাল ধরে
যার যা প্রাপ্য তাকে তাই দেবার ॥ ৮ ॥
যারা উপাসনা করে অবিদ্যার,
তারা প্রবেশ করে অন্ধকারে।
যারা বিদ্যাতেই রত,
তারা আছে অধিকতর অন্ধকারে ॥ ৯ ॥
বিদ্যা ও অবিদ্যার ফল পৃথক,
পণ্ডিতরা বলেছেন এই কথা।
আমরাও শুনেছি ধীর ব্যক্তির নিকটে ॥ ১০ ॥
যিনি একই সঙ্গে জানেন বিদ্যা ও অবিদ্যাকে,
মৃত্যুকে তিনি অতিক্রম করেন অবিদ্যায়,
আর বিদ্যা দিয়ে লাভ করেন অমৃতত্ব ॥ ১১ ॥
যারা উপাসনা করে প্রকৃতির,
তারা প্রবেশ করে দৃষ্টিহীন অন্ধকারে।
যারা নিরত প্রকৃতি থেকে জাত হিরণ্য গর্ভেরউপাসনায়,
তারা প্রবেশ করে অধিকতর অন্ধকারে ॥ ১২ ॥

পৃথক ফল হয় এই দুয়ের উপাসনায়,
পণ্ডিতরা বলেছেন এই কথা।
আমরাও শুনেছি ধীর ব্যক্তির নিকটে ॥ ১৩ ॥
যিনি উভয়কে জানেন এক যোগে,
মৃত্যুকে তিনি অতিক্রম করেন বিনাশের দ্বারা,
আর সম্ভূতি দ্বারা লাভ করেন অমৃত ॥ ১৪ ॥
হে জগতের পোষক সূর্য,
সত্যের মুখ আবৃত আছে তোমারই হিরণ্ময় পাত্রে.
তুমি তা অপসারণ কর, হে সত্যধর্মা,
আমার দৃষ্টির জন্য ॥ ১৫ ॥
তোমার রশ্মি সংহত কর হে পূষা,
একর্ষি যম সূর্য প্রজাপতিতনয়,
সংকুচিত কর তোমার তেজ।
আমি দেখেছি তোমার কল্যাণময় রূপ।
এই যে পুরুষ, আমিই তিনি ॥ ১৬ ॥
এরপর মিলে যাক আমার প্রাণবায়ু
অমৃত অনিলে। ভস্মসাৎ হোক এই শরীর।
ওঁ ক্রতু স্মরণ কর, স্মরণ কর কৃতকর্ম।
হে আমার সংকল্পাত্মক মন,
যা স্মরণ করবার তা স্মরণ কর,
স্মরণ কর নিজের কৃতকর্মও ॥ ১৭ ॥
হে অগ্নি, আমাদের সুপথে নিয়ে যাও
সম্পদ লাভের জন্য। হে দেবতা,
তুমি জানো আমাদের বিজ্ঞান ও কর্মের কথা।
বিযুক্ত কর আমাদের কুটিল পাপরাশি,
তোমাকে অনেক নমস্কার করছি আমরা ॥ ১৮ ॥

অথর্ব বেদ

অথর্ব বেদের প্রকৃত নাম অথর্বাঙ্গিরসঃ। অথর্বন ও আঙ্গিরস এই দুই নিয়ে অথর্ব বেদ। অথর্বন শব্দে বোঝায় সৎ উদ্দেশে আচরিত অনুষ্ঠান বা ভেষজ এবং আঙ্গিরসের অর্থ মন্দ উদ্দেশ্যমূলক আচার অনুষ্ঠান বা অভিচার ক্রিয়া। তবে সাধারণভাবে মনে করা হয় যে অথর্বা ঋষির নামেই অথর্ব বেদ। অথর্বা অঙ্গিরা ও ভৃগু এই তিনজন

এই বেদের প্রধান মন্ত্রদ্রষ্টা। অথর্ব বেদে পদ্য গদ্য ও গীতি এই তিন রকম মন্ত্রই আছে।

অথর্ব বেদের অপর নাম ব্রহ্মবেদ। গোপথ ব্রাহ্মণে আছে যে ব্রহ্মা নামের ঋত্বিককে অথর্ব বিদ্যায় পারদর্শী হতে হবে। এই জন্যই বোধহয় একে ব্রহ্মবেদ বলা হয়। এ ছাড়াও ব্রহ্ম শব্দের অর্থ অভিচার মন্ত্র এবং ব্রহ্ম শব্দে বিশ্বের মূল তত্ত্বও বোঝায়। অথর্ব বেদে এই উভয় বিষয় আছে বলেও ব্রহ্মবেদ নাম হয়ে থাকতে পারে।

অথর্ব বেদের বেশির ভাগ মন্ত্রেরই বিনিয়োগ গৃহ্য কর্মে। এই সব মন্ত্রে সাধারণ মানুষের সহজাত আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথাই সরল ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই বেদে শুধু মোক্ষলাভই উদ্দেশ্য নয়, ধর্ম অর্থ ও কামও উপেক্ষিত হয় নি। মানুষের কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি সমস্ত চিত্তবৃত্তিই মেনে নেওয়া হয়েছে। তাই এই বেদে শান্ত ও ঘোর উভয়বিধ কর্মসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই মন্ত রচিত ও সংকলিত হয়েছে। এক দিকে বিত্ত ও সমৃদ্ধি লাভ রোগমুক্তি প্রভৃতি শান্ত কর্ম, অন্য দিকে শত্রুনাশ বশীকরণ প্রভৃতি ঘোর কর্মের অনুষ্ঠান। এতে আয়ুর্বেদের নানা বিষয় আছে—জ্বর যক্ষ্মা কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগের প্রতিকার, সর্পাদি বিষ নিবারণের ওষধি ও মন্ত্র। আছে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বাণিজ্যে শ্রীলাভের মন্ত্র। সুপ্রসব ও পুত্রলাভের মন্ত্রও আছে। ঋষ্যশৃঙ্গ রাজা দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেছিলেন অথর্ব বেদের বিধান অনুসারে। এ সব ছাড়াও বাস্তু সংস্কার গৃহপ্রবেশ গর্ভাধান জাতকর্ম চূড়াকরণ উপনয়ন বিবাহ ও পিতৃমেধ প্রভৃতি সংস্কারের মন্ত্র আছে। এই বেদে আধ্যাত্মিক মন্ত্রও আছে। এই মন্ত্রগুলি আভ্যুদয়িক ও আভিচারিক মন্ত্রের সঙ্গে পাশাপাশি সংকলিত হয়েছে। সব দিক বিচার করে দেখা যায় যে এই বেদে সংসারী গৃহস্থের ভোগের সঙ্গে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর মোক্ষেরও সন্ধান আছে। ঐহিক সুখের উপায় এর মূল কথা হলেও পারলৌকিক পথের কথাও উপেক্ষিত হয় নি।

অথর্ব বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থের নাম গোপথ ব্রাহ্মণ। কোন আরণ্যক নেই। উপনিষদ আছে তিনখানি—প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য। নিচে এই বেদের কিছু নমুনা দেওয়া হল।—

চতুর্দশ কাণ্ড। প্রথম অনুবাক। প্রথম সূক্ত।

চৌষট্টি মন্ত্রের এই দীর্ঘ সূক্তের বিষয় বিবাহ। সূক্তের আরম্ভে সূর্যের কন্যা সূর্যার বিবাহের কথা বলা হয়েছে। এই বিবাহের বর্ণনা আছে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তে। তারপর পিতৃগৃহে কুমারীর বিবাহ, অষ্টাদশ মন্ত্রে আজ্য হোম। অনুচর দিয়ে বরের নিকটে শরাব

সম্পুট পাঠিয়ে দিতে হয়। ব্রাহ্মণ প্রেরণ, কুমারী রক্ষার জন্য পালক প্রেরণ, জল আনার জন্য গমন, জলে লোষ্ট্র নিক্ষেপ, অবগাহন, জলে ঘট পূর্ণ করে সেই ঘট এনে স্থাপন, সেই ঘটের জলে সব কাজ করা, আজ্য হোম প্রভৃতি বহু বিষয় বর্ণিত হয়েছে। কুমারীর স্নান, বস্ত্র পরিধান, অলঙ্কার ধারণ। তারপর কন্যাদান, বরের পাণি গ্রহণ, অগ্নির পরিক্রমা, সপ্তলেখা লেখন, তল্পে উপবেশন প্রভৃতি বিষয় এই মন্ত্রে বলা হয়েছে।

চতুর্দশ কাণ্ড। দ্বিতীয় অনুবাক। প্রথম সূক্ত।

এই সূক্তটি আরও দীর্ঘ। মন্ত্র সংখ্যা পঁচাত্তর। এতে উদ্বাহ বিধি বলা হয়েছে। বিবাহের পর বরের নিজ গৃহে বধূকে আনয়ন, বর বধূর যানে আরোহণ, অগ্রে কর্তার গমন, দক্ষিণ পদ আগে বাড়িয়ে গমন আরম্ভ, উভয়ের শুভ কামনা করে মন্ত্র জপ। বরের পিতৃ গৃহে এলে বর-বধূর যান থেকে অবতরণ ও মন্ত্র জপ। দক্ষিণ দিকে গোময় পিণ্ডের উপরে প্রস্তর স্থাপন, তার উপর তিনটি পলাশ পর্ণের মধ্যম পত্র গ্রহণ করে ঘৃত ও ঘৃতের উপর চারটি দূর্বার অগ্রভাগ স্থাপন করে বধূকে রাখতে হবে। তারপর পূর্ণপাত্র কুম্ভ-ফল ও খৈ-এর সাথে বর বধূর প্রবেশ। অগ্নি প্রজ্বলিত করে কন্যার হস্ত গ্রহণ করে বর বধূকে পরিণয় করবে ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োগ বিধি এই সূক্তে বর্ণিত হয়েছে। পরিশেষে স্বজনদের সঙ্গে মিষ্টান্ন ভোজন।

ষষ্ঠ কাণ্ড। নবম অনুবাক। চতুর্থ সূক্ত।

শোচয়ামসি তে হার্দিং শোচয়ামসি তে মনঃ।
বাতং ধূম ইব সধ্র্যঙ্ মামেবান্বেতু তে মনঃ॥ ২॥
মহ্যং ত্বা মিত্রাবরুণৌ মহ্যং দেবী সরস্বতী।
মহ্যং ত্বা মধ্যং ভূম্যা উভাবন্তৌ সমস্যতাম্॥ ৩॥

হে জায়া ও পতি, আমরা তপ্ত করছি তোমাদের হৃদয়
পরস্পর অনুরাগ উৎপন্ন করে,
সন্তপ্ত করছি তোমাদের মন।
ধূম যেমন বায়ুর পিছনে যায় অনুসরণ করে,
তেমনি আমার অনুধাবন করুক তোমার মন॥ ২॥
হে জায়া, মিত্র ও বরুণ তোমাকে যুক্ত করুক আমার উদ্দেশে,
আমার সাথে তোমাকে যুক্ত করুক সরস্বতী,
পৃথিবীর সকল প্রাণী যুক্ত করুক দুজনকে,
তোমাকে যুক্ত করুক পৃথিবীর ঊর্ধ্ব ও অধোদেশে॥ ৩॥

ষষ্ঠ কাণ্ড। পঞ্চম অনুবাক। প্রথম সূক্ত
অব জ্যামিব ধন্বনো মন্যুং তনোমি তে হৃদঃ।
যথা সংমনসৌ ভূত্বা সখায়াবিব সচাবহৈ ॥ ১॥

ধনুর দণ্ড থেকে যেমন খুলে নেওয়া হয় জ্যা,
তেমনি, হে পুরুষ, তোমার হৃদয় থেকে অপসারণ করছি ক্রোধ
যাতে আমরা এক মন হয়ে মিলতে পারি
সখার মতো পরস্পর অনুরাগে,
তাইতে তোমার ক্রোধ করছি অপনয়ন ॥ ১॥
ওগো ক্রুদ্ধ পুরুষ, তোমার ক্রোধ আমি করছি নিক্ষেপ
গুরুভার পাথরের নিচে,
আমরা যাতে মিলতে পারি বন্ধুর মতো,
সেই ভাবে অপনয়ন করছি তোমার ক্রোধ ॥ ২॥
তোমার ক্রোধ আমি পিষ্ট করছি
পায়ের আগা ও গোড়ালি দিয়ে,
যাতে তুমি উত্তর দিতে না পার অবশ হয়ে।
এমন অনুষ্ঠান করছি যাতে লাভ কর আমার চিত্ত ॥ ৩॥
সামনের এই কুশ ক্রোধ উপশম করে ইষ্ট ও অনিষ্ট জনের,
এই উপায় হল ক্রোধ নিবারণের
ক্রোধী শত্রুর ও ক্রোধাবিষ্ট আত্মীয়ের—
এই রকমের কথা বলে লোকে ॥ ৪॥
এই যে সামনে জলাশয়ে আছে বহুমূল বিশিষ্ট কুশ,
পৃথিবী জাত এই কুশকেই বলা হয় ক্রোধ নিবারণের উপায় ॥৫॥
হে ক্রোধাবিষ্ট পুরুষ, আমি সংযত করছি
তোমার হনুর হিংসা ও ক্রোধ ব্যঞ্জক ধমনি।
ক্রোধ বশে উৎপন্ন অন্য ধমনিও
সংযত করছি তোমার ক্রোধ উপশম করে ॥ ৬॥

এই মন্ত্রটি স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই ক্রোধ উপশমের জন্য ব্যবহৃত হয়।

প্রথম কাণ্ড। ষষ্ঠ অনুবাক। ষষ্ঠ সূক্ত।
ইয়ং বীরুন্মধুজাতা মধুনা ত্বা খনামসি।
মধোরধি প্রজাতাসি যা নো মধুমতস্কৃধি ॥ ১॥

হে সাধকের হৃদয়স্থ শুদ্ধ সত্ত্ব অমৃতের বিধায়ক,
তুমি উৎপন্ন হয়েছ অমৃত থেকে,

তোমাকে পারি হৃদয়ে সঞ্চয় করতে অমৃত লাভের জন্য।
সাধক হৃদয়ে বর্তমান তুমি অমৃতময় কর আমাদের ॥ ১ ॥
অমৃত আমাদের রসনার অগ্রভাগে,
জিহ্বার মূলেও বিদ্যমান থাকুক অমৃত।
হে অমৃত শুদ্ধ সত্ত্ব, তুমি থাকো আমার সকল কাজে,
থাকো আমার অন্তর জুড়ে ।॥ ২ ॥
অমৃতময় হোক আমার ইহ জীবন,
পর জীবনও হোক অমৃতময়।
যেন অমৃতময় হয় আমার কথা,
আমি যেন নিজে হতে পারি অমৃতময় ॥ ৩ ॥
আমি অমৃতময় হব অমৃত লাভে,
অমৃত ক্ষরণ থেকে হব মধুময়।
মধুময় গাছ যেমন প্রীতি দেয় মানুষকে,
তেমনি করেই, হে অমৃত সাগর ভগবান,
এই প্রার্থনাকারীকে কর উদার, কলুষ-কলঙ্ক শূন্য ॥ ৪ ॥
হে ভগবান, মানুষ ইক্ষু চায় সর্বব্যাপী মধুরত্বের জন্য,
আমি তোমাকে পাবার জন্য করছি সাগ্রহে প্রার্থনা।
পতিকে যেমন ভজনা করে পতিপরায়ণা পত্নী,
তুমিও তেমনি অনুরাগী হও আমার প্রতি,
দূরগামী হয়ো না আমাকে পরিত্যাগ করে ॥ ৫ ॥

শেষ কথা

অতি সংক্ষেপে চারটি বেদের কথা বললাম। দেখা গেল যে ঋগ্বেদই মূল গ্রন্থ। যা কিছু জানবার কথা, তা আছে এই গ্রন্থেই। যে দীর্ঘ সময় ধরে এই বিশাল গ্রন্থটি ধীরে ধীরে রচিত হয়েছিল, সেই সময়ের প্রায় সব কথাই এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক তথ্যের সঙ্গে মিলে মিশে আছে সমাজ ব্যবস্থার কথা, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার কথা। এরই সঙ্গে যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠান ও আধ্যাত্মিক চেতনার কথাও আছে। কাজেই ঋগ্বেদকে ধর্মগ্রন্থ বললে ভুল হবে। এক কথায় এর পরিচয় হবে না। এই মহা গ্রন্থে আর্য সংস্কৃতির একটি সুন্দর চিত্র কবিতায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

সামবেদ কোন ভিন্ন গ্রন্থ নয়। এ ঋগ্বেদেরই সঙ্গীত রূপ। নূতন কথা আছে অল্পই। যজুর্বেদের সম্বন্ধেও একই কথা বলা যেতে পারে। ঋগ্বেদে যে যাগ যজ্ঞের কথা আছে, সবিস্তারে সেই সব অনুষ্ঠানের কথাই গদ্যে ও পদ্যে সংকলিত হয়েছে ক্রিয়া কর্মের প্রয়োজনে। যজুর্বেদকে ধর্মগ্রন্থ বলা যেতে পারে। সামবেদ এর পরিপূরক গ্রন্থ।

অথর্ববেদের প্রকৃতি ভিন্ন ধরনের। সম্পূর্ণভাবে সামাজিক পারিবারিক ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নানা বিষয়ের উপরে মন্ত্রাদি সংকলিত হয়েছে। শুধু শান্তির জন্য নয়, অনিষ্ট সাধনের জন্যও মন্ত্র আছে। তারই সঙ্গে আছে সুন্দর জীবনের কথা, আধ্যাত্মিক উন্নতির ইঙ্গিত। সব দিক বিবেচনা করে অনেকেই বলেন যে অথর্ব বেদের উপযোগিতা আজও আছে। আজও আমাদের সমাজে যে বনৌষধি অর্থাৎ গাছ-গাছড়া শেকড়-বাকড় এবং তাবিজ-কবচ ঝাড়-ফুঁক, তুক-তাক প্রভৃতি সংস্কার ও কুসংস্কার চলে আসছে, তার মূল আছে অথর্ব বেদে। এই বেদের মন্ত্রাদি সঠিক প্রক্রিয়ায় ও যথাযথ ভাবে প্রযুক্ত হলে তা হয় তো সেকালের মতোই ফলপ্রসূ হতে পারে বলে অনেকের ধারণা। অথর্ব বেদ নিয়ে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও গবেষণা হলে আয়ুর্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে নবজীবনের সঞ্চার হতে পারে।

বেদ আমাদের বাতিল করে দেবার জিনিষ নয়। বেদ আমাদের আনন্দ দিতে পারে, শান্তি দিতে পারে, আর দিতে পারে মহত্তর জীবনের আস্বাদ। ধৃষ্টিরসি ব্রহ্ম যচ্ছ।—

হে মন, চঞ্চল তুমি স্থির হও তুমি চাঞ্চল্য পরিহার করে,
স্থির হও পরব্রহ্ম প্রাপ্তির জন্য।

সমাপ্ত